
অনিলিখা
ও
সেরা বাইশ
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অনিলিখা ও সেরা বাইশ

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দীপ
ANILIKHA O SERA BAIESH
by Abhijnan Roychowdhury
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

দিদি ও জামাইবাবু
দেবযানী ঘোষ ও সোমনাথ ঘোষকে

আমার ইচ্ছে ছিল এমন একটা গল্প সংকলনের, যেখানে আমার সব রঙের গল্প থাকবে। একদিকে যেমন কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি, ভয়, রহস্য, ডার্ক গল্প থাকবে, তেমনই আবার একই সঙ্গে হাসির, মানবিক বা প্রেমের গল্পও থাকবে। সেই গল্পগুলোই সংকলনে থাকবে, যা এইসব ধারার অত্যন্ত সফল প্রতিনিধি ও পাঠকের কাছে গল্পকথনের বিভিন্ন ন্যারেটিভ স্টাইলকেও তুলে ধরবে।

সে চিন্তা থেকেই এই গল্প সংকলন। কোন লেখকের পক্ষেই তার লেখা সেরা বাইশ বলা খুব শক্ত, তবে আমার অত্যন্ত প্রিয় বেশ কিছু গল্প আছে এই সংকলনে। এর প্রত্যেকটা গল্পই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

সঙ্গে আছে অনিলিখার একটা কল্পবিজ্ঞান ও ইতিহাস নির্ভর এক রহস্য উপন্যাস, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের বর্ডারের এক ছোট গ্রামের পটভূমিকায়। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে গত ছাব্বিশ বছর ধরে অনিলিখার যে কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের আলোচনার কেন্দ্রে জায়গা করে নিয়েছে। বহু পাঠক অনিলিখার উপন্যাসের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে। এই বই-এ সেজন্য নামকরণের সময় ' অনিলিখা' কে উল্লেখ না করে পারি নি। একই সঙ্গে এখানে আছে আরেকজন পাঠকপ্রিয় চরিত্র, মিস্টার পাই এর কিছু গল্প।

এখানে সামান্য কিছু গল্প আছে, যা শুধুই বড়দের জন্য। বিভিন্ন ধারার গল্পের কথা ভেবেই এখানে রাখতে হয়েছে।

দীপ প্রকাশনার কর্মকর্তা দীপ্তাংশু মণ্ডল ও দীপ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে এই বই পাঠকদের সামনে নিয়ে আসার জন্য।

আশা রাখি এ বই তোমাদের সবার ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন।

নমস্কারান্তে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
৯ই ডিসেম্বর, ২০২১,
কেনিলওয়ারথ, ইংল্যান্ড

সুচিপত্র

গেম ওভার

সেই ছেলেটা যে কোনওদিনই ছিল না

পারফেক্ট

স্বপ্নের শেষ নেই

বেশ কয়েক সপ্তাহ কলকাতার বাইরে ছিল অনিলিখাদি। শুনেছিলাম দিল্লি ও ব্যাঙ্গালোরে অফিসের নানান কাজে যাচ্ছে। কবে ফিরবে সেটা জানতাম না।

আজ অনিলিখাদিকে আমরা কেউ তাই দেখব আশা করিনি। দরজার সামনে সেই পরিচিত চটির শব্দ আর চেনা গলা শোনা মাত্র, আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলাম। আজ পোশাক নীল লং স্কার্ট, সাদা টপ। কানে স্কার্টের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নীলপাথরের ঝোলা দুল। খোলা চুল।

আমাদের শনিবারের আসরের ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ যেন মুহূর্তে বদলে গেল।

আমরা নানান প্রশ্ন করে উঠলাম।

—কবে ফিরলে? কোথায় কোথায় ঘুরলে? টিপু সুলতান প্যালেস দেখলে? লালবাগ কেমন? ওয়েদার কেমন ছিল? দিল্লিতে ক'দিন ছিলে —ইত্যাদি ইত্যাদি।

—দাঁড়া, বসতে দে আগে। এবারে এক এক করে প্রশ্ন কর—বলে এক কোণে পড়ে থাকা হাতলভাঙা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। এক এক করে আমাদের প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে ব্যাগ থেকে একটা কালো নোটবুক বার করল। অবশ্য তার উপরে কোনও সাল লেখা নেই। এরকম নোটবুক আমরা আগে কোনও দিন অনিলিখাদির হাতে কখনও দেখিনি।



ওটা দেখা মাত্র আমরা বাকি সব প্রশ্ন ভুলে গিয়ে বলে উঠলাম— কী আছে ওই নোটবুকে?

অনিলিখাদি বলে উঠল— বলছি। এটা খুঁজে বার করতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। আজ সকালের একটা খবর দেখে প্রথমেই এই নোটবুকটার কথা মনে পড়ল। সে সময় কয়েক বছর রীতিমতো নিয়ম করে নোটবুক লিখতাম। বিশেষ করে কোথাও বেড়াতে গেলে। রোজ কী হচ্ছে, তা লিখে রাখতাম। পরে পড়লে ভালো লাগত।

—আজ সকালে আবার কিসের খবর? সেরকম কোনও খবর দেখিনি তো!— আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমরা অবশ্য জানি যে খবরগুলো আমরা সচরাচর

হুমড়ি দিয়ে পড়ি, সেগুলো কোনওটাই অনিলিখাদিকে বিশেষ আকর্ষণ করে না।

অনিলিখাদি বলে, তোরা পারিসও বটে, সারাদিন ধরে ওয়ান ডে দেখলি, তারপর আবার সে খবর বার বার করে বিভিন্ন কাগজে পড়ছিস। যেন তাতে অন্যরকম কিছু লেখা থাকবে।

যাই হোক আমাদের নীরব দেখে অনিলিখাদি বলে উঠল— না, না, এ সব খবর তোদের চোখে পড়বে না। এখানকার খবরের কাগজে সেভাবে বেরোয়ও নি। সকালে বিবিসি নিউজে দেখলাম। উইলিয়াম ডেমেন্ট মারা গেছেন।

—কে-কোন ডেমেন্ট? কোন দেশের প্রেসিডেন্ট? — প্রতীক বলে উঠল।

—না, না, উনি ছিলেন ঘুমের জগতের প্রেসিডেন্ট। স্ট্যানফোর্ডের প্রফেসার, বিজ্ঞানী। পুরো জীবনটাই ঘুম নিয়ে রিসার্চ করে কাটিয়েছেন। শেষে কাল রাতে ঘুমের মধ্যেই চলে গেছেন।

—ও বুঝেছি। ওনার নাম থেকেই ডেমেনশিয়া কথাটা এসেছে— তন্ময় বিজ্ঞের মতো ভাব করে চোখের চশমাটা খুলে পরিষ্কার করতে করতে বলে উঠল।

—না, না। গুড গেস। কিন্তু ডেমেনশিয়া কথাটা ল্যাটিন শব্দ ডেমেন্স থেকে এসেছে। ডেমেন্স বলতে বোঝায় মনের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারানো। সেটা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চলে আসছে।

আমরা সবাই কটমট করে তন্ময়ের দিকে তাকালাম। সব বিষয়ে খুব কম জেনে বেশি জ্ঞান ফলানোর অভ্যেসটা ওর আর গেল না।

—তা হঠাৎ করে ওঁর কথা? তোমার ডায়েরির মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু আছে?— সহেলী ফের অনিলিখাদিকে বলে উঠল।

—হ্যাঁ, পুরোটা বলছি। তার আগে একটু জল দে তো। বেশ খানিক্ষণ লাগবে এ লেখা পড়তে।

একটু পরে এক গ্লাস লেবুজল শেষ করে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল —উনি স্ট্যানফোর্ডে ঘুমের উপরে একটা ক্লিনিকও তৈরি করেন। সেই ১৯৫০ সাল থেকে সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন ঘুমের উপরে। স্বপ্নের উপরে। আমার সঙ্গে ওখানেই দেখা। ভালো আলাপ ছিল। উনি তখন স্বপ্ন নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। সেটা অবশ্য আমার সাব্জেক্ট ছিল না। নেহাত আমি মাঝেমধ্যে ওঁর ক্লিনিক-এ যেতাম বলে কথা হত।

বলতেন আমরা জীবনের তিনভাগের এক ভাগ ঘুমিয়ে কাটাই। সে তুলনায় ঘুম নিয়ে ভাবি কম। রিসার্চ হয় কম। তোমার মতো ভালো মেয়ে কখনোই ঘুম নিয়ে রিসার্চের কথা ভাববে না। অথচ দেখো, রোবট ছাড়া আমাদের দিব্বি চলে যাবে, কিন্তু ঘুম ছাড়া আমাদের কারও চলবে না।

ওঁর ক্লিনিকেই ইইজি-র মাধ্যমে বিভিন্ন টেস্ট সাবজেক্টের ব্রেন অ্যাক্টিভিটি মাপা হত। মাথার খুলিতে ইলেক্ট্রোড লাগিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেন। যখনই যেতাম, দেখতাম ওঁকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। কখনও কখনও মিডিয়ার লোকেদের ভিড়। আসলে এটা ঠিক যে উনি 'ঘুম'এর বিষয়টাকে সবার সামনে নিয়ে এসেছিলেন। সবার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সে বিষয়ে আরও কিছু বলার আগে তোদের কিছু প্রশ্ন করে নিই। দেখি তোদের জেনারেল নলেজ ক'রকম? উত্তর দিতে না পারলে গল্প বলব কিনা ভেবে দেখব।

সাগ্নিক তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল— না। না, অনিলিখাদি। আমরা শুধু গল্প শুনতে চাই। ওসব শর্ত মানতে পারব না।

—ঠিক আছে। চেষ্টা অন্তত কর।— বলে অনিলিখাদি বলে উঠল—স্বপ্ন বলতেই প্রথম কার নাম মনে পড়ে?

—সিগমন্ড ফ্রয়েড।— সহেলী বলে উঠল।

—বাহ। পারফেক্ট। এই তো ঠিক বলেছিস। সিগমন্ড ফ্রয়েড এর লেখা 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' ১৮৯৯ সালে বেরোয়। তাতে ফ্রয়েড বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে কীভাবে সেই ব্যক্তির ইচ্ছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়, সেসব নানান বিষয় নিয়ে লেখেন। কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে এই প্রশ্ন কিন্তু এ সময়ে এসে হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এ প্রশ্ন মানুষের বহুকালের।

আড়াই হাজার বছর আগে লেখা জেনেসিস-এ জোসেফ মিশরের ফ্যারাও-এর স্বপ্নে দেখা স্বাস্থ্যবান এবং শীর্ণ গরু পর্যায়ক্রমে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে পরপর কয়েক বছর ভালো ফসল এবং তারপরে দুর্ভিক্ষ শুরু হবে।

তারও পাঁচশো বছর আগে শুধু স্বপ্নের উপরে একটা বই লেখা হয়েছিল চীনে। 'জো গং জোমুং'— ঠিক উচ্চারণ করলাম কিনা জানি না— সেখানে ভালো খারাপ—অদ্ভুত—এরকম নানান ধরনের স্বপ্ন ও স্বপ্নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অর্থ ডিকশনারির আকারে বেরিয়েছিল। সে তুলনায় সিগমন্ড ফ্রয়েড এর লেখা 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' অনেক অনেক পরে লেখা। তবে সেটা আবার করে সেই বড় প্রশ্নটাকেই আবার করে সামনে নিয়ে আসে। স্বপ্নের অর্থ কী? কেন দেখি? এর উৎস কী? এসব নিয়ে সবার কৌতূহল বেড়ে যায়।

আসলে স্বপ্ন তিন হাজার বছর আগেও আমাদের কাছে রহস্য ছিল। এখনও আছে। এখনও নানান রিসার্চ হচ্ছে এর উপরে।

এবারে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে আসি। র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট বা REM— কী বলতে পারবি?

প্রতীক উত্তেজিত হয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল— জানি। কিছুদিন আগেই ওই বিষয়ে পড়েছিলাম। এটা ঘুমের একটা অংশ, এ সময় সামান্য সচেতনতা থাকে। স্বপ্ন আমরা ঠিক এই সময়ে দেখি।

—এই যে বললি তোরা কিছু পারবি না! দেখ। কীরকম চটপট ঠিক উত্তর বলে ফেলছিস। বিজ্ঞানীরা এখন বলেন 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট'-এর সময় বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সামান্য যোগাযোগ থাকে। সেই সময়ে চাইলে ওই ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও সম্ভব। এমনকী তাদের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে কিছু প্রশ্নও রাখা যায়। এ সময় মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ বাড়ে। সিনেমা দেখার মতো চোখের মণি নড়াচড়া করে চোখের পাতার আড়ালে। জেগে থাকা ও ঘুমের এই সময়ে ব্রেন ওয়েভে খুব বেশি তারতম্য হয় না। কিন্তু এই র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (REM) ঘুমের পুরো সময়ের মোটে কুড়ি শতাংশ সময় জুড়ে হয়। বাকি আশি শতাংশ 'নন-র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (NREM) ঘুম'। যেটুকু রিসার্চ হয়েছে REM ঘুমের উপরে, সে তুলনায় খুব কম রিসার্চ হয়েছে NREM ঘুমের উপরে। এই NREM-এর সময় মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষ স্লো ইলেকট্রিক ওয়েভ তৈরি করে। এক সেকেন্ডে একটা সাইকেল কম্পাঙ্কে।

শোওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে এই ব্রেন ওয়েভ মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা স্নায়ুকোষকে স্পর্শ করে। প্রথম দিকে এই ব্রেন ওয়েভ শক্তিশালী হয়, আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব নিয়ে এখন অনেক রিসার্চ হচ্ছে। এগুলো বললাম কারণ আজকের গল্পের পিছনে এসবের কিছুটা ভূমিকা আছে।

—তুমি তো আজ পুরো ক্লাস নিতে শুরু করলে এদের। —বিশ্বজিৎদা ঢুকতে ঢুকতে বলে ওঠে।

হেসে ওঠে অনিলিখাদি। —কী ব্যাপার আজ এত দেরি করে!

—বাহরিনের একটা ফরমুলা ওয়ান রেসিং দেখাচ্ছিল। দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তা আজ হঠাৎ করে এসব? শেষে প্রফেসার-এর চাকরি নিলে নাকি কোথাও?

—আজ আমার একটা গল্প বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগে ভাবলাম কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিই। কারণ আজকের গল্পের অনেকটা জুড়ে ঘুম আর স্বপ্ন।

এসব কথায় দেরি হচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম— তারপরে? পরের প্রশ্ন?

—ঠিক আছে। পরের প্রশ্ন। ঘুম না হলে কী হয় জানিস?

—সে তো খুব সোজা। ঘুম না হলে কোনও কিছুই ঠিক ভাবে করা যায় না। কোনও কিছু মনে রাখার জন্য ঘুম খুব জরুরি— রাতুল বলে উঠল।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। না ঘুমোনোর জন্যই তো কত অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ঘুম ব্রেনকে একটু থেমে থাকার সময় দেয়, যাতে আবার করে তা ঘুম থেকে ওঠার পরে পূর্ণ দক্ষতায় কাজ শুরু করতে পারে। এজন্য দিনের পর দিন ঘুমোতে না দিলে অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয়।

মাছির উপরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যদি তাদের ঘুম কমিয়ে দেওয়া হয় জিন-মিউটেশনের মাধ্যমে, তাহলে তারা প্রায় কিছুই মনে রাখতে পারে না। একটা সাধারণ মাছি যেখানে আট থেকে চোদ্দো ঘণ্টা দিনে ঘুমোয়, সেখানে এভাবে পরিবর্তিত মাছি ঘুমোয় মোটে দুই থেকে তিন ঘণ্টা। কিন্তু তার পরে তারা প্রায় কিছুই মনে রাখতে পারে না। ঘুমের সঙ্গে মেমারি বা স্মৃতি শক্তি সরাসরি কানেক্টেড। ঘুমের সময় যেসব জিনিস অদরকারি সেরকম অনেক কিছু বাদ দিয়ে ফিল্ম এডিটিং-এর মতো যেটুকু মনে রাখা দরকার, ঠিক সেটুকুই স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত হয়। সেজন্য তুই সাত দিন আগে সকালে কী খেয়েছিস সেটা মনে করতে পারিস না! কিন্তু কবে অঙ্কে ফেল করেছিলি সেটা ঠিক মানে রাখিস। —শেষ কথাটা বলার সময় অনিলিখাদি আড়চোখে বিশ্বজিৎদার দিকে তাকাল। কারণটা আমারা সবাই জানি।

ফের বলে উঠল— অনেক সময় স্বপ্ন আবার আবিষ্কারেও সাহায্য করেছে। জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেড্রিক অগাস্ট স্বপ্নে বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার দেখতে পান। উনি বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে ছ'টা কার্বনের পরমাণু ছ'টা হাইড্রোজেনের পরমাণুর সঙ্গে কেমিক্যাল বন্ডিং-এর নিয়ম মেনে একসঙ্গে থাকতে পারে। ফায়ার প্লেসের ধারে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে উনি দেখেন দুটো সাপ একে অপরের ল্যাজ কামড়ে ধরেছে। তার জন্যেই উনি বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার নাকি বার করতে পেরেছিলেন।

যেসব কিছু মনে রাখে সে কোনোকিছুই বিশ্লেষণ করতে পারে না, নতুন কিছু ভাবতে পারে না। ঘুমের মধ্যে আমরা তাই অনেক তথ্য ছেঁটে ফেলি, যার তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।

মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসে কোনও তথ্য বেশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত হয় না। বেশিক্ষণের জন্য তথ্য রাখা হয় প্রি-ফ্রন্টাল করটেক্সে। আর সে কাজটা ঘুমের মধ্যেই হয়।

এবারে পরের প্রশ্ন। মরভান সিন্ড্রোম কী?

আমরা কেউ এর উত্তর জানতাম না। আমাদের নীরব দেখে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল—

মরভান সিন্ড্রোম একধরনের একটা অসুখ। এক বিরল মস্তিষ্কের অসুখ যারজন্য যাদের এটা হয় তারা মাসের পর মাস ঘুমোতে পারে না, ঠিক ? মাছিদের মতোই। শেষে তাদের এর জন্যই মৃত্যু হয়।

যেটা রাতুল বলল, সেটা ঠিক। অতীতে বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট শুধু ঘুমের অভাব থেকে হয়েছে। থ্রি মাইল আইল্যান্ড-এ ১৯৭৯-এ পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে যে দুর্ঘটনা হয়েছিল বা তেলের ট্যাঙ্কার 'এক্সন ভ্যাল্ডেজ' জাহাজের ধাক্কার জন্য যে বিপর্যয় হয়েছিল, সে সবই ঘুমের অভাব থেকে।

তা যা বলছিলাম। তোরা পরীক্ষায় পাশ। এবার আমার সেই ঘটনায় চলে আসি।

বিশ্বজিৎদা পাশ থেকে বলে উঠল— ঘটনা না গল্পে।

অনিলিখাদি মুচকি হেসে বিশ্বজিৎদার বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে বলে উঠল —গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ওই প্রফেসার ডেমেন্টের ল্যাবে। গ্যাব্রিয়েল এর পুরো নাম গ্যাব্রিয়েল এগারট। এগারট পদবিটা শুনেই বুঝেছিলাম যে গ্যাব্রিয়েল ইহুদি।

ও তখন প্রফেসারের আন্ডারে রিসার্চ করছিল স্বপ্নের উপরে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে। প্রফেসারের খুব প্রিয় ছাত্র।

কীভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ বোঝা যেতে পারে সে বিষয়ে! ইন্টারেস্টিং বিষয়। সে বিষয়ে ও একটা স্বপ্নের ক্যাটালগ বা ডেটাব্যাঙ্কও তৈরি করার চেষ্টা করছিল। হাজার হাজার টেস্ট সাবজেক্টের স্বপ্ন বিচার করে সব ধরনের স্বপ্নের উপরে নির্ভর করে ও এই ডেটাব্যাঙ্ক তৈরি করছিল। ওর উদ্দেশ্য ছিল 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট'-এর সময়ে সে ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পুরনো অপরাধ খুঁজে বার করা। সেই সময়ে কোনও প্রশ্ন করে চোখের পাতার নীচে মণির নড়াচড়া দেখে আর ব্রেন ম্যাপিং করে তার উত্তর খুঁজে বার করা ও অপরাধ সম্বন্ধে আন্দাজ করা। অতীতে সে ব্যক্তি কী করেছে তার উপরে নির্ভর করে একটা লোকের দেখা স্বপ্নে তার ছাপ থেকে যায়। এর থেকেই ওর ধারণা হয় যে স্বপ্নের মধ্যে থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে অপরাধীকে! অপরাধী চাইলেও সেটা লুকোতে পারবে না।

যুদ্ধে যে সৈনিক লড়েছে, তার স্বপ্ন সবথেকে ভয়ানক হয়। এর একদম বিপরীত প্রান্তে আবার অন্ধের স্বপ্ন। সে অন্যের সাহায্যের উপরেই বেঁচে থাকে। তাই তার স্বপ্নে হিংসা সবথেকে কম থাকে। আবার যে দশকে কোনও দেশে যুদ্ধ হয়েছে, সে সময়ে সেখানকার অধিবাসীদের স্বপ্নেও তার প্রভাব পড়েছে। সে সময়ে লোকেরা স্বপ্নে বেশি হিংসা বা ভায়োলেন্স বেশি দেখে।

আমি ওখানে তিনমাস মতো ছিলাম। তার মধ্যে বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

গ্যাব্রিয়েল-এর কাছ থেকেই জেনেছিলাম যে আমরা পূর্ণিমার দিন গড়ে অন্যদিনের তুলনায় কুড়ি মিনিট কম ঘুমোই। এমনকী জানলা বন্ধ করে শুলেও তার কোনও পরিবর্তন হবে না। সেই সব দিনে মেলাটোনিন হরমোনও কমে যায়, যার ঘুমের পিছনে বড় ভূমিকা থাকে।

গ্যাব্রিয়েল বলেছিল এর পিছনে একটা কারণ থাকতে পারে। আগে পূর্ণিমার রাতে আলোর জন্য অন্য প্রাণীর হামলার সম্ভাবনা বেশি থাকত। সেজন্য অনেক বেশি সতর্ক থাকা দরকার বলেই এরকম বিবর্তন হয়েছে, যাতে অন্য প্রাণীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ওখান থেকে চলে আসার পরে ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না। পরে শুনেছিলাম কেম্ব্রিজের নোকিয়া বেল ল্যাবস-এ ও এই ব্যাপারে রিসার্চ করতে চলে আসে।

এতটা বলার পরে অনিলিখা থামল। একটু থেমে ফের বলে ওঠে—

এবারে আমি আমার ডায়েরি থেকে পড়ে শোনাই। এটা কয়েকবছর আগের কথা। ইচ্ছে করেই কিছু জিনিস বলিনি তোদের আগে। লিখে রাখার একটা সুবিধে হল, এতদিন পরেও সেই দিনে ঠিক কী হয়েছিল সেটা বলতে গিয়ে কোনও ভুল হয় না। সে দিনটা এখনও যেন চোখে ভাসে।

বিশ্বজিৎদা পাশ থেকে ফুটনোট যোগ করল—আগে থেকে গল্প লেখা থাকলে, এমনিতেও বলা অনেক সুবিধে। ফাঁকফোকর কম থাকে।

অনিলিখাদি কথাটা যেন শোনেনি এমন ভান করে একটু গলা খাঁকরে ডায়েরি হাতে নিয়ে নিল। কিছু পাতা ওলটানোর পরে একটা পাতায় এসে থামল।

পাশ থেকে তন্ময় উঁকি মারছিল ডায়েরির পাতায়। অনিলিখাদি বলে উঠল —দাঁড়া, আমি পড়ছি। চুপ করে বস। শুধু ছটফটানি।

১২ জুন, ফ্রান্সের স্যামোনি

এখন রাত ন'টা। খানিক আগেই গির্জার ঘড়ি মৃদু গম্ভীর স্বরে রাত ন'টাকে স্বাগত জানিয়েছে। হোটেলে ফিরে এসেছি ঘণ্টাখানেক। এসে ডায়েরি লিখতে বসেছি।

আজ সারাদিন বেশ ছোটাছুটি গেছে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে বাসে করে বেরিয়েছিলাম সকাল ছ'টায়। এখানে সকাল ন'টা নাগাদ এসে পৌঁছেছি।

স্যামোনি বিখ্যাত স্কি রিসোর্ট। ফ্রান্সের মধ্যে। কিন্তু সুইজারল্যান্ড ও ইতালির খুব কাছে।

এসেই হোটেলে ব্যাগ রেখে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছে পাইনের জঙ্গলে ঢাকা সবুজ পাহাড়। তার কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা আল্পস। শহরের যে কোনও জায়গা থেকেই দেখা যায় ফ্রেঞ্চ আল্পস।

মনে হয় বাড়িগুলোর খুব কাছেই যেন সে পর্বতশ্রেণি দাঁড়িয়ে আছে। দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা মেঘের মধ্যে তারা লুকোচুরি খেলছে।

যারা আল্পসের মঁল্লা শৃঙ্গে উঠতে চায়, তাদের এখানেই আসতে হয়। মঁল্লাকে হোয়াইট মাউন্টেন বলা হয় কারণ সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে আল্পসের এই শৃঙ্গ। যারা মঁল্লা শৃঙ্গে উঠতে চায়, তারা এখান থেকেই যায়। এটাই ইউরোপের সবোচ্চ শৃঙ্গ।

তাই আজ হাঁটতে গিয়েই টের পেলাম রাস্তায় যাদের দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রায় সবাই টুরিস্ট। তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রকৃতির নতুন নতুন রূপের চমকে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চোখে তাদের সেই মোহিত বিহ্বল দৃষ্টি। মানুষজন যেন বারবার এই অপার্থিব সৌন্দর্যে তাদের পথ ভুলে যাচ্ছে।

শহরের মাঝখান দিয়ে বেশ খরস্রোতা এক নদী বয়ে যাচ্ছে। তার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় নদীর অবিরাম ঝিরঝিরানি বাতাসে ভেসে আসছিল। মনে হল এ শহরের হাওয়ায় নানারকম লতাপাতার মিলিত সুবাসে সারাক্ষণ যেন এক মৃদু আতরের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর উপর দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট কাঠের ব্রিজ আছে। চড়াই উতরাই ভেঙে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তার পাশে লম্বা ঝাকড়া গাছের দল একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘছেড়া মিঠে রোদ্দুর এসে পড়েছে পাশের ঘাসজমি আর উপত্যকায়।

শহর জুড়ে নানান রঙের নানান স্টাইলের বাড়ি। তবে হলুদ আর কমলা রঙের বাড়ি বেশি। কিছু বাড়ি বেশ পুরনো। বেশিরভাগই কাঠের বাড়ি। কিছু দোতলা বাড়ির চারধারে দিয়ে গোল বারান্দা। অ্যালপাইন আরকিটেকচার। এরকম জেনেভায় দেখিনি। সবুজ খড়খড়ি দেওয়া জানলা। বেশিরভাগ বাড়িতে ছোট ছোট ব্যালকনি আছে। সেসব ব্যালকনি ফুলের টব দিয়ে সাজানো। কিছু বাড়ির দেওয়ালে ফুল-লতা পাতা আঁকা। ফ্রান্স, ইতালি আর সুইজারল্যান্ডের বর্ডারে এই শহর বলে তিনটে দেশেরই কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে।

শহরের কেন্দ্রে বড় খোলা চত্বর। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রেস্টুরেন্ট, পাব, ক্যাফে, ক্যাসিনোও আরও নানান পসরা সাজিয়ে বসা ছোট ছোট দোকান। এখানে শুধু পায়ে হাঁটার রাস্তা। রাস্তা জুড়ে টেবিল চেয়ার পাতা। সেখানে সব টুরিস্ট বসে খাচ্ছে।

একটা বিশাল ব্যারোক স্টাইলের চার্চ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে কেন্দ্রে।

এককথায় ছবির মতো শহর। শহর বলছি কিন্তু সে তুলনায় খুবই ছোট শহর। দেড় ঘণ্টা হাঁটার পরেই বুঝলাম শহরের সব প্রান্ত ঘুরে এসেছি।

আকাশ ঘন নীল। উষ্ণতা খুব উপভোগ্য হলেও উজ্জ্বল চড়া রোদ। আমার আবার রোদ চশমার আড়ালে চোখ ঢাকতে ভালো লাগে না। সে রোদে ছাতার তলায় বসে আমিও আমার

লাঞ্চ সারলাম। আজ বিশেষ তাড়া ছিল না। আগামীকাল সকালে কেবল কার আর মঁল্লা পিকে যাওয়ার প্ল্যান।

কেন্দ্র থেকে কিছু দূরে 'গার্ডে স্যামোনি- মঁল্লা' স্টেশন। এখান থেকে ট্রেনে করে হিমবাহ দেখতে যাওয়া যায়। শুনেছি সে হিমবাহ গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য বছরে বছরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল এখানে যেন টুরিস্ট ছাড়া স্থানীয় কেউ নেই।

বাইরে বসে লাঞ্চ করছি, আর আল্পসের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ও রোদ মেঘের খেলা দেখছি, হঠাৎ এর মধ্যে পরিচিত গলায় 'অনিলিখা' ডাক শুনে চমকে উঠলাম।

মুখ তুলে দেখি রাইকার। রাইকার-এর সঙ্গে চারদিন আগেও দেখা হয়েছিল। জুরিখে। ওখানে একটা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারের কাজ করে। বেশ বড়লোক। জার্মান।

বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা। কথাবার্তায় বেশ অহমিকা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে সব ব্যাপারে খুব ডিসিপ্লিনড। এক কথায় টিপিকাল জার্মান। পাব থেকে একটা বড় বেলজিয়ান বিয়ার 'লিফি'র মাগ নিয়ে এসে বসল। তারপরে কথা বলতে শুরু করে দিল। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আমি খাই না জানিয়ে দিলাম।

লক্ষ্য করলাম ওর চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। ক্লান্তির বা না ঘুমোনোর লক্ষণ। দু দিন আগে জুরিখে যখন দেখা হয়েছিল, তখন এরকম দেখিনি। পরে কথা বলে বুঝলাম কেন এ চেহারা হয়েছে ওর।

শুনলাম ও নিজে জুরিখে থাকলেও ওর বাবা মা এখানেই থাকেন। এখানেইও বড় হয়েছে। এখানে শহরের বাইরে আল্পসের ঢালে বেশ কয়েকটা গ্রাম আছে। সেখানেই বেশিরভাগ স্থানীয় লোক থাকে। সেরকমই একটা গ্রামে ওর বড় হয়ে ওঠা। স্থানীয় লোকেদের প্রায় সবার অবস্থাই বেশ ভালো। বেশিরভাগ লোকাল হোটেল ও লজ তাদের। কিন্তু গত এক মাস ধরে এখানে এক অদ্ভুত জিনিস শুরু হয়েছে। তার জন্যেই ও এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে।

কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে ও বলে উঠল—এখানকার খবর শুনেছ নিশ্চয়ই।

বললাম যে আমি আজ সকালেই এসেছি। তেমন কারও সঙ্গে কথা হয়নি।

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল—প্রায় একমাস যাবৎ এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ লোক, সন্ধে অবধি একদম স্বাভাবিক, হঠাৎ করে পরদিন সকাল থেকে তার মধ্যে পাগলামো দেখা যাচ্ছে। যেন অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছে। হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে বা শুয়ে বসে আছে। কিন্তু কথার মধ্যে কোনও লজিক নেই, কোনও বাস্তবতা নেই।

বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। কারও কারও চোখ-মুখ হঠাৎ করে হিংস্র হয়ে উঠছে। বলছে কাউকে বাঁচতে দেবে না। চেনা পরিজনদের চিনতে পারছে না। যেন অন্য কোনও জগতে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রায় সত্তর জন লোকের এরকম হয়েছে। প্রায় সবাইকে মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তাররা দেখছে। কিন্তু এখনও এর পিছনের কারণ খুঁজে পায়নি। সবার হাবভাব, সিম্পটম মোটামুটি একই রকম।

একটা শেষ করে আরকেটা বড় বিয়ার ম্যাগ নিয়ে এসে চুমুক দিতে দিতে ও বলে উঠল—পারলে একবার আমাদের বাড়িতে এসো। ভালো লাগবে। আমরা এখানে আছি প্রায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে। এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে অনেকে আরও বেশি বছর ধরে আছে। আগে জায়গাটা দুর্গম ছিল। কিন্তু আমরাই অনেক ইনভেস্ট করে রাস্তা ঠিক করে নিয়েছি। সরকারি সাহায্য ও নিজেদের ফান্ড ব্যবহার করে স্যামোনিকে বিশ্বের সেরা স্কি রিসোর্ট হিসেবে গড়ে তুলেছি। এখন স্যামোনির শহরাঞ্চল সম্পূর্ণ টুরিস্ট প্লেস হয়ে উঠলেও শহরের বাইরের এসব গ্রাম, গ্রামাঞ্চল কিন্তু এখনও সেই চল্লিশ বছর আগের সময়কে ধরে রাখতে পেরেছে।

আমাদের বাড়ি ও খামারবাড়ি দেখলেই বুঝবে। মনে হবে যেন আল্পস বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এখানে যে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভয় হচ্ছে বাবা—মার না কিছু হয়। ছোট এলাকা। আমরা প্রায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে বহুবছর ধরে চিনি। সে জন্য এ ক'দিন ডাক্তারখানা আর হাসপাতাল ছুটোছুটি করে সত্যি ক্লান্ত হয়ে গেছি। ঠিক করে ঘুমও হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যদি আর জেগে না উঠি।

আমি ওকে দেখে বুঝলাম আরও বেশ কয়েক বিয়ারের মাগ শেষ না করে ও উঠবে না। আমার আরেকটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে।

নেক্সট কয়েক দিন যেখানে যেখানে যাব, তার টিকিট আগে থেকে কাটতে হবে। সে সব ভেবে ওকে বিদায় জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তা না হলে আর আগামী ক'দিন এখান থেকে স্থানীয় বিভিন্ন আকর্ষণে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টিকিট কাটার সুযোগ পাব না।

ইচ্ছে আছে, যদি সময় হয় অবশ্যই একবার রাইকার-এর গ্রামে যাব। এটা কী ধরনের অসুখ সেটাও বুঝতে হবে হাসপাতালে গিয়ে।

১৩ জুন, রাত আটটা

আজ সকালে গিয়েছিলাম মঁল্লা দেখতে।

স্যামোনি থেকে দুটো গন্ডোলা নিয়ে যায় 'এগুই দু মিদি' শৃঙ্গে। সেই গন্ডোলা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে লিফট করে আরও উপরে উঠলাম। সেটা একদম পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দিল।

যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা বড় চাতাল। উপর থেকে মঁব্লা ও তার চারদিকের পাহাড় দেখা যায়। পায়ের অনেক নীচে হালকা ছোট ছোট মেঘের টুকরো ঘোরাফেরা করছে, যেন বরফের মুকুটপরা পাহাড়গুলোকে ঘিরে তারা উৎসবে মেতেছে।

আশেপাশে যেদিকেই তাকাই, শুধু বরফ।

তার মধ্যে অনেক স্কি করছে। আমি হিমালয়ে ট্রেক করতে অনেকবার গেছি, কিন্তু এরকম কোনও জায়গায় যেতে হলে প্রায় তিন-চার দিনের দুর্গম পথ ট্রেক করতে হয়। এখানে যেন প্রযুক্তির কল্যাণে খুব সহজেই সেখানে চলে আসা সম্ভব হয়েছে।

দূরে অনেক নীচে ছবির মতো পাইনের বনের আড়ালে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। সাদা ক্যানভাসের মধ্যে কোনও শিল্পী যেন তুলি আর সবুজ রঙ দিয়ে কিছু ছবি এঁকেছেন। মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। ভেসে বেড়ানো মেঘের ছায়া যেন নীচে দূরের বন-প্রান্তরের উপরে সমানে বুনে চলেছে নতুন নতুন ছায়ার সোয়েটার।

একটা জায়গায় বেশ লম্বা লাইন। পরে বুঝলাম লাইন করে ঝুলন্ত ব্যালকনির মতো একটা জায়গায় যাওয়া যায় যেখানে পায়ের নীচে কাচের মেঝে। দু-একজন যাদের উচ্চতার প্রতি ভীতি আছে, তারা ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই ভয় পাচ্ছিল। পায়ের নীচে প্রায় হাজার মিটার গভীর গিরিখাত। মনে হয় কাচ যে কোনও সময় সরে গেলেই সোজা এক কিলোমিটার নীচে পতন।

ঠিক করলাম একদিন এখানে স্কি করতে আসব। সব স্কি-এর যন্ত্রপাতি এখানেই ভাড়া করা যায়। আগে কলোরাডোর অ্যাসপেনে করেছি। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এ জায়গা স্কি-এর জন্য আদর্শ। কিন্তু আজ আর সময় পেলাম না।

ফিরে আসতে আসতে চারটে হয়ে গেল। আগে ভেবেছিলাম কিছু দূরে একটা আইস কেভ আছে। ওটা দেখতে যাব। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘন কালো মেঘ ঘিরে ধরছে। বৃষ্টি আসতে পারে। ঠিক করলাম আজ আর ওই আইস কেভ দেখতে যাব না। কাছাকাছি কোথাও যাওয়া ভালো।

স্থানীয় লাইব্রেরী গেলাম।

লাইব্রেরী যে কোনও জায়গার চরিত্র তুলে ধরে, বিশেষ করে সে চরিত্র যেটা চট করে সামনে আসে না। সে জন্য কোথাও গেলেই আমি স্থানীয় লাইব্রেরীতে যাই। এখানকার

লাইব্রেরীটা প্রায় তিনশো বছর পুরনো। পাহাড়ের একদম ধারে কাঠের বিল্ডিং। যে কেউ যেতে পারে। অবশ্য বই এলান করতে গেলে লাইব্রেরীর কার্ড থাকতে হবে।

অনেক বই আছে। তবে অবাক লাগল যে জার্মান ভাষার বই এর সংখ্যা বেশি। ফ্রেঞ্চ না ইতালিয়ান হলে অবাক হতাম না। মনে হয় এখানে রাইকারের মতো জার্মান এলাকেদের সংখ্যা বেশি। তবে সঙ্গে কিছু ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি বইও আছে।

আমি স্যামোনির ইতিহাস জানার জন্য একটা বই নিয়ে অনেকক্ষণ পড়ছিলাম। আমাকে ওই বইটা পড়তে দেখে দেখি এক বৃদ্ধ আমার দিকে এগিয়ে এলেন অন্য একটা বই হাতে নিয়ে। মাথার পিছনের দিকে শুধু পাকা চুল। বয়স আশির কাছাকাছি হবে। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। আমাকে একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললেন— টুরিস্ট? এখানকার ইতিহাস জানার চেষ্টা করছ?

সায় দিতে খুশি হয়ে বলে উঠলেন— খুব ভালো। আমিও এটাই মনে করি যে কোনও জায়গায় গিয়ে সেখানকার ইতিহাস কিছুটা না জানলে ঘোরার অর্ধেক আনন্দ থাকে না। তবে এই বইটা আরও ভালো। এটা পড়ো। বাইরে কিছু বই-এর দোকানে এটা হয়তো কিনতে পারবে।

কথা বলে জানলাম বৃদ্ধ এখানে প্রায় পঞ্চাশ বছর আছেন। এখানকার সবকিছুই প্রায় জানেন। নাম ডেভিড। ভারতে বেশ কয়েকবার বেড়াতে গেছেন। আমাকে ওঁর বাড়িতেও আসতে বললেন। জানি না অবশ্য এর মধ্যে যাওয়া হবে কিনা।

পাঁচটা নাগাদ লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঘন কালো মেঘ যেন হঠাৎ করে এগিয়ে এল তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো। মুহূর্তে অন্ধকারে বাক্সবন্দি করে নিল এই শহরটাকে।

তার পরপরই বলা-কওয়া নেই প্রবল ধুলোর ঝড় এল। একটা শীতল বাতাস যেন পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল শহরের রাস্তায়।

সেটা মিনিট খানেক চলার পরে মুশলধারে বৃষ্টি এল। ছুটে পাশের এক রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম। শুধু আমি নই, আশেপাশের সবাই বৃষ্টির জন্য এখানে আশ্রয় নিয়েছে বলে বেশ ভিড়। কিছু না কিনে শুধু শুধু ভিড় বাড়ানো ঠিক হবে না ভেবে একটা চিকেন বার্গারের অর্ডার দিয়ে টেবিলে বসলাম।

শুনেছি এই শহরে মাঝেমধ্যেই হানা দেয় খামখেয়ালি বৃষ্টি। কিন্তু এতটা আশা করিনি।

টেবিলে রাখা স্থানীয় কাগজ হাতে নিয়ে দেখব, ঠিক এমন সময় পাশ থেকে কানে কিছু কথা ভেসে এল। তারা জার্মানে কথা বললেও বুঝতে পারলাম যে গতকাল রাইকার যে বিষয়ে

কথা বলছিল, সেটা নিয়েই এরা কথা বলছে। বেশ কয়েকজন লোক গতকালও মারা গেছে। একটা আতঙ্ক সবার মধ্যে টের পেলাম।

কেন এ নিয়ে আলোচনা তা হাতের ইংরেজি কাগজটাতে চোখ বোলাতেই বুঝলাম। সেটার প্রথম পাতার হেডলাইন 'Mysterious disease spreads in Chamonix'।

পুরোটা পড়লাম। শুরু হয়েছে এক মাস আগে। ঠিক যেরকম রাইকার বলেছিল। যাদের হচ্ছে তাদের সবার এই হঠাৎ করে পাগলামো শুরু হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে। বলা যায় ঘুমের মধ্যেই। যেন হঠাৎ করে তারা তাদের সচেতনতা হারিয়ে ফেলছে। এরকম শুরু হওয়ার দু-তিন দিনের মধ্যে মারা যাচ্ছে।

একটা জিনিস রাইকার বলেনি। তা হল যাদের এটা হচ্ছে, তাদের প্রায় সবার বয়স আশির বেশি। সেক্ষেত্রে যা হয় আর কি, প্রথমে এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা করা হয়নি। নিশ্চয়ই অন্য কোনও অসুবিধে ছিল, এরকমই ভাবা হয়েছে। কিন্তু দেখতে দেখতে এ চার সপ্তাহে বাহান্নজন মারা গেছে। ইতিমধ্যে আক্রান্ত আরও প্রায় কুড়িজন যারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। তাদের আয়ু বড়জোর আর এক কী দু দিন। কী করে হচ্ছে কেউ জানে না। এর পিছনে নতুন কোনও নতুন ভাইরাস কিনা সেটা দেখা হচ্ছে।

খানিকবাদে বৃষ্টি যখন থামল, তখন সন্ধে সাতটা। রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরিয়ে এলাম। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ভিজে রাস্তা। মনে হল যেন জোনাকিরা শুয়ে আছে রাস্তায়। একইরকমভাবে ভিজে যাওয়া গাছের পাতা জ্যোৎস্নায় চকচক করে উঠছে।

রাস্তার হলদেটে ল্যাম্প শেডের আলো জ্বলে উঠেছে। সে হলুদ আলোয় আর বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তায় স্যামোনি তখন ফের মায়াপুরী হয়ে উঠেছে।

১৪ জুন, রাত ন'টা

খানিক আগে হাসপাতাল থেকে ফিরলাম। আমার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে বসে লিখছি। এখন দ্রুত নিভতে থাকা বিকেলের আলো চারদিকে যেন কমলা রঙের আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। এ শহর যেন এখন হঠাৎ করে অবসর নিয়েছে। দূরে মাঝেমধ্যে দু-একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

সকাল থেকে লিখি।

সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়ই মনে হল ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার। সংখ্যা যদিও খুব বেশি নয়, কিন্তু এরকম একটা অসুখ কী করে শুরু হল জানা দরকার। কে বলতে পারে এটাই হয়তো পরে মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে নানান দেশে যদি না এখনই সতর্ক হওয়া হয়।

স্যামোনি স্কি রিসোর্ট। নানান দেশের লোক এখানে আসে। যদি এটা তাদের মাধ্যমে অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে যায়! আমি নিজে যদিও ডাক্তার নই, কিন্তু কিছু রোগীকে যদি সচক্ষে দেখা যায়। অবশ্য ওরা যদি কাছে যেতে দেয়।

আমার কাছে রাইকার-এর নাম ছিল। ওকে ফোন করলাম। ওর মাধ্যমে দেখতে যাওয়া সহজ হবে। বেশ খানিকক্ষণ রিং হয়ে গেল। কেউ ফোন ধরল না। আমি বাধ্য হয়ে একটা মেসেজ করলাম। কিন্তু ফিরতি কোনও মেসেজ পেলাম না। সকাল সাতটা। হয়তো বেশি ভোরে ফোন করছি, তাই আর করলাম না।

আজ আইস কেভ যাওয়ার প্ল্যান ছিল। পায়ে হাঁটা পথে এখানকার স্টেশন। সেখান থেকে প্রতি ঘণ্টায় একটা ট্রেন ওই বরফের গুহায় যায়। দু-কামরার লাল ছোট ট্রেন। এখনও সেই একই রকম আছে। এখানে সবকিছু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। গতকাল ঝড়ের জন্য ট্রেনলাইনে গাছ পড়ে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঝড় কাটতেই সব আবার স্বাভাবিক। ১৯০৮ সালে এ লাইন তৈরি হয়। সিঙ্গল ট্র্যাক ট্রেনলাইন চলে গেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে। এরকম একটা হিমবাহ দেখতে যাওয়ার জন্য ট্রেন লাইন তৈরি বিশ্বে এই প্রথম।

ট্রেনে করে যেতে আধঘণ্টার মতো সময় লাগল। ভারী সুন্দর সে পথ। পাশ দিয়ে কার্পেটের মতো মসৃণ সবুজ উপত্যকা। দু-ধারে পাহাড়। সেখানে ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে ছবির মতো কিছু কাঠের বাড়ি। রোদ্দুরে পাইনের বন ঝলমল করছে। তাদের পিছন দিকে আরও দূরে আরও উঁচু পাহাড়ের সারি। পাইনগাছে ঢাকা জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে বরফের মুকুট উঁকি মারছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে বরফে ঢাকা পাহাড় যেন ট্রেনের সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। চারদিক শুধু বরফ আর বরফ। যেখানে এসে পড়লাম সেখানে চারদিকে শুধুই বরফের রাজত্ব। সবুজ প্রায় হারিয়ে গেছে।

'মার দে গ্লাস' হিমবাহ। সূর্যের আলোয় চারধারের বরফ যেন হীরের দ্যুতিতে চকচক করে উঠছে। যেখানে ট্রেন থামল, সেখান থেকে প্রায় চারশো ধাপ নীচে নামার পরে বরফের সে গুহায় পৌঁছলাম। মনে হয় পুরো লোকাটাই একসময় হিমবাহ এলাকা ছিল। সে হিমবাহ গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর দৌরাত্মে দূরে সরে গেছে। দূরে পিছুহাঁটা হিমবাহে যেন সেই মন খারাপের সুর।

নামার পথে কিছু জায়গায় হিমবাহ দশ বছর আগেও কোথায় ছিল সে চিহ্ন করা আছে।

গুহার মধ্যে বরফের মূর্তির মাধ্যমে আগেকার গুহামানবের জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবছর আবার নতুন করে এসব বরফের মূর্তি তৈরি হয়। সারা বিশ্বে এরকম আর বেশি

নেই।

দেখে আবার অত ধাপ পেরিয়ে ট্রেন স্টেশনের কাছে আসতে হয়। শারীরিকভাবে খুব ফিট না হলে এখানে আসা সম্ভব নয়। নেহাতই পথে আমেরিকার এক ইতিহাসের মহিলা প্রফেসারকে পেয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গী হিসেবে। তাই কথা বলতে বলতে অত ধাপ উঠতে কষ্ট হয়নি। ফেরার ট্রেন সময় মতোই এল।

স্যামোনিতে ফিরতে ফিরতে প্রায় চারটে। এতক্ষণ ফোনের নেটওয়ার্ক ছিল না। দেখি মেসেজ এসেছে রাইকারের কাছ থেকে। ওর বাবাকে আজ সকালে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। একই অসুখের শিকার।

ফোন করলাম। শহরের বাইরে হাসপাতাল। অ্যাড্রেস নিয়ে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম। হাসপাতলের রিসেপশনে রাইকারকে পেয়ে গেলাম। শুনলাম সকালে বাবার ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে রাইকার বাবার ঘরে গিয়ে দেখে উনি খাটের হেডবোরডে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বলে যাচ্ছেন। এমনকী সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাইকারকে যেন দেখতে পাচ্ছিলেন না। রাইকারের বুঝতে দেরি হয়নি কী হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকে।

ডাক্তারের কথা অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। সব ওই অসুখের সিম্পটম।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাবার শরীর কীরকম ছিল?

—দারুণ। উনি তো এখন ও নিয়মিত গলফ খেলেন। এখনও সকাল বিকেল রোজ হাঁটতে যান। আসলে উনি একটা সময় আর্মিতে ছিলেন বলে এত ফিট। কী যে হল!

—কিন্তু এখানে এখন কী ট্রিটমেন্ট করছে?

—নানান ধরনের টেস্ট করছে। ব্রেন স্ক্যান। ইইজি সবকিছু। মাঝেমধ্যে বাবা আবার একটু ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছেন। তখন ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। কী হচ্ছে সেটাও বোঝার চেষ্টা করছে। ট্রিটমেন্টটা এক্সপেরিমেন্টাল। এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি কেউ। একটাই পরিণতি। মৃত্যু।— গলা বুজে এল রাইকারের।

—তোমার মা কেমন আছেন?

—মা ঠিক আছেন। সেটাই আমিও ভাবছিলাম। কোনও ভাইরাস থেকে হলে আমাদের সবারই হতে পারে। কী যে হচ্ছে কে জানে! বয়স হয়েছে। চলে একদিন যেতেই হবে, কিন্তু তা বলে এরকম হঠাৎ করে!—রাইকারের গলা যেন কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে এল। বুঝলাম বেশ ভেঙে পড়েছে। স্বাভাবিক।

খানিকবাদে ভিজিটিং আওয়ারে দেখা করতে গেলাম। উনি আমাদের যেন লক্ষ্যই করলেন না। দেখলাম খাটের উপরে বসে আছেন। চোখ একবার খুলে ফের বন্ধ করে দিলেন। কী সব

কথা নিজের মনে বলে যাচ্ছেন। বিড়বিড় করে। মাঝেমধ্যে একটা দুটো কথা জোরে বলে উঠছেন। মনে হল একবার যেন 'হাইল' কথাটা বলে উঠলেন। যেন অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছেন। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছেন।

খানিকক্ষণ থেকে বেরিয়ে এলাম।

১৫ জুন, রাত দশটা

অনেক রাত হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে এখনও আবছা আলো আছে। কিছুক্ষণ আগেও বিদায়ী সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়েছিল পাইন আর বার্চের গাছের মাথায়। এখন ডুবে গেছে, তবু যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়নি।

পাশের প্রান্তরের উপর দিয়ে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসছে ঘন কুয়াশা।

তার মধ্যে দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে আছে দূর পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা বাড়ির আলো।

হোটেলের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে লিখছি। যদিও এত সৌন্দর্যের মধ্যে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত আজ শ্বেতশুভ্র ফ্রেঞ্চ আল্পস। মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলার আলোছায়ায় আল্পস যেন সত্যি রূপকথা হয়ে উঠেছে।

১৭৪১ সালে দুই ইংরেজ পর্যটক প্রথম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই ছেট গ্রাম আবিষ্কার করেন। তারপরে আস্তে আস্তে স্কি রিসোর্ট হিসেবে এটা গড়ে ওঠে। এখন বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় স্কি রিসোর্টগুলোর মধ্যে এটা একটা।

আজকের দিনটা বেশ ইভেন্টফুল। সকাল থেকে অনেক ছোটাছুটি চলেছে।

স্যামোনিতে বেশ কিছু মিউজিয়াম আর গ্যালারি ছড়িয়ে আছে।

সকালে একটা ক্রিস্টাল মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে নানান ধরনের ক্রিস্টাল রাখা আছে। সব এখানকার পাহাড় থেকে উদ্ধার হয়েছে। এখানে কমলা রঙের এক বিশেষ ধরনের ক্রিস্টাল পাওয়া যায়। তা ছাড়াও আরও নানানরকমের ক্রিস্টাল।

সেখানে খানিকক্ষণ থেকে চলে গেলাম প্যারা গ্লাইডিং করতে। 'এগুই দু মিদি' থেকে। আগেও করেছি কয়েক বার। কিন্তু এখানে আল্পসে করার অনুভূতিই আলাদা। অনেকটা দূরত্ব জুড়ে অনেক উঁচু থেকে প্যারা গ্লাইডিং। যেখান থেকে লাফ দিলাম সেখানে বেশ খানিকটা পথ জুড়ে পায়ের কিছুটা নীচে প্রথমে বরফের সাদা চাদর। তারপরে সেটা পেরিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে যখন নীচের উপত্যকা দেখলাম সে এক অন্যরকমের রোমাঞ্চ। জুন। তাই দুপাশের পাহাড়ের ধারের দিকে কিছু জায়গায় বরফ আর নেই।

নীচে দূরে স্যামোনি। উপরে পাহাড়ের উপর থেকে যখন নীচে ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় নেমে আসছিলাম, তখন পায়ের নীচে স্যামোনির আশেপাশে সবুজের রাজ্য আর তাকে ঘিরে ফ্রেঞ্চ

আল্পসের সেই অনির্বচনীয় উপস্থিতি যেন আরও বেশি করে টের পাচ্ছিলাম।

মাঝেমধ্যে বেশ ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খাব না তো!

প্রত্যেকটা বাঁক যেন পাহাড়কে অন্য অন্য ভাবে আমার সামনে নিয়ে আসছিল। প্রত্যেকটা দৃশ্যপট যেন আলাদা। প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট বাদে নীচে পাইনে ঘেরা এক খোলা জায়গায় এসে নামলাম।

কিছু দূরে একটা ক্যাফে ছিল। ওখানে গিয়ে কফি খেতে বসেছি, হঠাৎ অন্য টেবিলে বসে থাকা একজনকে খুব চেনা লাগল। গ্যাব্রিয়েল। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে আমার স্ট্যানফোর্ডে আলাপ হয়েছিল। উঠে গিয়ে কথা বললাম। প্রথমে চিনতে পারল না। সেটা অবশ্য কিছুই অস্বাভাবিক নয়। প্রায় সাত বছর বাদে দেখা। প্রফেসার উইলিয়াম ডেমেন্ট -এর কথা বলতেই ওর সব মনে পড়ে গেল। শুনলাম এখানে এক ঘুমের ক্লিনিক করেছে। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করে।

ঘুম, স্বপ্ন এসব নিয়ে রিসার্চ বহু বছর আগেও করত। এখন কী কাজ করছে জিজ্ঞেস করতে ও বলে উঠল মনের গভীরে পুরনো স্মৃতির ভিড়ে হিংসার ছাপ, অতীতের অপরাধের ফিঙ্গার প্রিন্ট থেকে যায়। কোনও অপরাধীতার অপরাধ জ্ঞানত বাধ্য না হলে বলে না। এড়িয়ে যায়। এখনও এজন্য অনেকক্ষেত্রে অপরাধী ধরা পড়ে না। কিন্তু স্বপ্নে সেই ছাপ থেকে যায়।

সেই বিষয়েই আমার রিসার্চ। আমার বিশাল ড্রিম ব্যাংক আছে, যার থেকে আমি বুঝতে পারি যে কেউ কী নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। সেটা কীভাবে তার অতীতের সঙ্গে কানেক্টেড। এই পদ্ধতি সাকসেসফুল হলে পুলিশ অপরাধীদের কাছ থেকে অনেক সহজেই অপরাধের স্বীকারোক্তি পেয়ে যাবে। স্বপ্ন এর মধ্যে এমন অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে যে তার থেকে আসলে কী হয়েছিল তা উদ্ধার করা এমনিতে শক্ত। কিন্তু আমি সে সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পেরেছি। কাজটা অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছি।

—কিন্তু যদি সে না ঘুমোয়?

—সে আর না ঘুমিয়ে ক'দিন থাকবে! একসময় তাকে তো ঘুমোতেই হবে। তখনই না হয় এভাবে অপরাধীকে শনাক্ত করা যাবে। আর যদি কোনও হার্ডকোর ক্রিমিন্যাল থাকে, যে ঠিক করে নিয়েছে যে কোনও ভাবে ঘুমোবে না, তার ক্ষেত্রে তো কাজটা আরও সোজা। পুলিশ অপরাধীদের ঘুমোতে না দিয়ে প্রশ্ন করে করে ঠিক স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবে।

—কিন্তু এত জায়গা থাকতে এখানে এলে কেন?

—আমার খুব স্কি করার শখ। স্যামোনির মতো স্কি রিসোর্টে বসে কাজ করার ফান্ডিং যখন পেয়ে গেলাম, তখন আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি। তা ছাড়া সারা বিশ্বের লোক এখানে বসেই পেয়ে যাই। এটাও একটা বড় সুবিধে।

—তা কিছু যদি মনে না করো, এখনওকি এটা স্ট্যানফোর্ড-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে করছ! নাকি অন্য কোথাও?

—না, না। 'তেভা' বলে একটা ইজরায়েলের এক ফারমা সংস্থা এ রিসার্চ ফান্ড করছে। তা তুমি কী আগামীকাল আছো? চলে এসো আমার ক্লিনিকে। দেখতে পাবে, কীভাবে আমরা কাজ করি।

—সে তো দারুণ সুযোগ। অবশ্যই যাব।

আরও কিছু কথা বলার পরে আমরা উঠে পড়লাম।

গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে গাড়ি ছিল। ও আমাকে হোটেল পৌঁছে দিল। পথে প্রফেসার ডেমেন্টের সম্বন্ধে ও এ ক' বছর কী কী রিসার্চ করেছে, এসব বিষয় নিয়ে গল্প করতে করতে এলাম। শুনলাম এখানে ও মোটে তিনমাস আগে এসেছে।

১৬ জুন, রাত ন'টা

হোটেলের বারান্দায় এসে বসেছি। সামনে আল্পসের দিকে তাকালে যেন আর লিখতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে শুধু বিভোর হয়ে দেখি।

দূরে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বেয়ে যেন চাঁদের আলোর স্রোত বরফের গা বেয়ে নদীর মতো নেমেছে। সে আলো যেন মাঝেমধ্যে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে কোনও রাজার বরফের পোশাকে পড়ে। এটুকু না লিখলে এ সন্ধ্যাকে ধরে রাখা যাবে না। তাই লিখলাম। এবারে আসল প্রসঙ্গে আসি।

এখানে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আজও পাঁচজন মারা গেছে। যারা মারা গেছে তাদের সবার বয়স আশির উপরে। একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। টুরিস্টদের মধ্যেও খানিকটা ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আছি বলে বুঝতে পারছি, এখন যেন এখানে একটু কম টুরিস্ট আসছে। অনেকেরই ধারণা এটা নতুন কোনও ভাইরাস যা ব্রেন ফাংশান আস্তে আস্তে থামিয়ে দিচ্ছে। যতক্ষণ এই ভাইরাসের রহস্য সমাধান না হচ্ছে, ভয় আরও বাড়ছে। এমনকী রেস্টুরেন্ট, পাবেও এলাকে দূরত্ব রাখতে শুরু করেছে। কী থেকে কী হয় কে জানে!

আজ সকালে স্কি জোরিং করতে গেলাম। ঘোড়ার সঙ্গে লাগানো দড়ি ধরে বরফের উপর দিয়ে স্কি করা। অনেকবার স্কি করেছি আগে কলোরাডোতে। কিন্তু এরকম করার সুযোগ

হয়নি। ঘোড়া চালাচ্ছিলেন এক মহিলা। ঘোড়াটার পায়ে একটা বিশেষ ধরনের জুতো পরানো ছিল, যাতে তা বরফের উপরে স্লিপ না করে। আমার কাজ ছিল দড়ি টেনে ধরে বরফের উপরে স্কি করতে করতে ব্যালান্স রাখা। ঘোড়াটা শুরুতে আস্তেআস্তে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন চল্লিশ মাইলের থেকেও জোরে ওই বরফ ঢাকা জায়গায় দিয়ে ঘোড়া ছুটতে শুরু করল, তখন বুঝলাম কেন এর আকর্ষণ। বেশ কয়েকবার ছিটকে পড়লাম। তার পরে উঠে আবার করলাম। একটা বেশ উড়ে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা হয়।

দেড় ঘণ্টা ও বেশ কয়েকবার ছিটকেপড়ার পরে বুঝলাম বিষয়টা কিছুটা আয়ত্তে এসেছে। একই সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটা ঘোড়া করলেও আমার যে পরিশ্রম কিছু কম হয়নি তা এই ঠান্ডাতে ঘামে ভিজে যাওয়া জামা থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

আসলে এরকম নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়েই একটা জীবন। তাকে কখনও থামতে দেওয়া উচিত নয়।

ফিরে এসে একটার সময় গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকে গেলাম। বেশ আধুনিক ব্যবস্থা। যেখান থেকেই ফান্ড পেয়ে থাকুক না কেন তারা বেশ ভালোই খরচ করছে। শহরের বাইরের দিকে যেখানে স্থানীয় লোকেদের বসবাস, সেখানেই এই ক্লিনিক। রিসেপশনে এক কমবয়সি মহিলা ছিলেন, তাকে আমার পরিচয় দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। দেখলাম এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দম্পতি বসে আছেন।

আধঘণ্টা বাদে গ্যাব্রিয়েল বেরিয়ে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। দেখলাম একই সঙ্গে ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ভিতরে ডেকে নিল। শুনলাম ওদের উপরে আজ পরীক্ষা হবে।

আমাকে দেখে বলে উঠল—ভালো সময়ে এসেছ। এদের উপরে পরীক্ষা করতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে এদের ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত।

—কিন্তু এরা কী স্বেচ্ছায় আসছেন?

—হ্যাঁ। মানে কী বলতে চাইছ?

—না, আমি বলতে চাইছি তুমি যে অপরাধী মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য এদের নিয়ে আসছ, এদের স্বপ্ন থেকে এদের অতীতের কোনও অপরাধের ফুটপ্রিন্ট আছে বোঝার চেষ্টা করছ, তা এঁরা জানেন? সেক্ষেত্রে তো কেউ আসতে চাইবে না।

গ্যাব্রিয়েল আমার দিকে একবার তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে বলে উঠল— চলো, আমার চেম্বারে যাই। তারপরে তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাব। ওখানে নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।

খানিকবাদে ওর চেম্বারে এলাম। তিন দিকে কাচে ঘেরা। আমার হাতে একটা অরেঞ্জ জুসের ক্যান ধরিয়ে আর নিজে একটা ডায়েট কোক নিয়ে বলে উঠল— না, এখানে কাউকে সেটা

বলা হয় না। বুঝতেই পারছ সেটা জানলে কেউই আসবে না। তবে আমার উদ্দেশ্য শুধু এই টেকনিক বা এই অনুসন্ধান পদ্ধতিকে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও উন্নত করা। ইতিমধ্যেই বড় সাকসেস এসেছে। মনে হয় ঠিক দিকেই এগোচ্ছি।

—তার মানে এদের মধ্যে তুমি অতীতে করা কোনও অপরাধ খুঁজে পেয়েছ?

—হ্যাঁ, পেয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই পেয়েছি। সে বিচারের ভার অবশ্য আমার নেই। আমি কাউকে সেটা জানাবও না।

—কী ধরনের অপরাধ পেয়েছ?

—না, সেটাই তো বললাম, বলতে পারব না। সেটা আমার আগ্রহের বিষয়ও নয়। আমার আগ্রহ শুধু এটা জানা যে এই পদ্ধতিতে কোনও খামতি আছে কিনা।

—কিন্তু কী ভাবে?

—দেখো সেটা আমার পেটেন্টেড প্রসেস। তবে তুমি তো এ ব্যাপারে কিছুটা জানো। আমার পেশেন্ট যখন ঘুমোয়, বিশেষ করে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট-এর সময় আমার কাজ হল এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এরা তখন ঘুমিয়ে থাকলেও অনেকটা সচেতনতা থাকে। এদের প্রশ্ন করে করে এমন কিছু জায়গায় নিয়ে আসা হয় যেখানে এরা অতীতে কোনো অপরাধ করেছে। ঠিক সেই সময়ে আমি আরও প্রশ্ন করে করে আসল সত্যটা বার করার চেষ্টা করি।

—কিন্তু ঘুমের মধ্যে এদের সঙ্গে যোগাযোগ বা ইন্টারাক্ট করো কীভাবে?

—সেটাই তো আমার আবিষ্কার। সে বিষয়ে ডিটেলে কিছু বলতে পারব না। তবে ধরে নাও আমি সেটা পারি। সবথেকে শক্ত কাজ হল মনের গভীর থেকে ওই অপরাধ-এর সন্ধান পাওয়া। সেটা পাওয়ার জন্যে আমাকে আমার ড্রিমব্যাঙ্কেরও সাহায্য নিতে হয়। অন্য অপরাধীরা যারা এরকম কাজ করেছে,তাদের স্বপ্ন কীরকম হয় সেটা জানা আছে। তার সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া গেলে বাকিটা বার করা খুব শক্ত হয় না। আমার কাছে স্বপ্নের সেই সাংকেতিক ভাষা, প্রশ্ন ও উত্তর থেকে পুরো ব্যাপারটা বার করার পদ্ধতি জানা আছে। সেটাই আসল। এটুকু বলতে পারি যা আমি আবিষ্কার করেছি তা আগামী দিনে অপরাধ বিজ্ঞানের সবকিছু পালটে দিতে পারে। কোনও অপরাধী কখনোই নিজের অপরাধ নিজের মুখে সহজে স্বীকার করে না। এজন্য অনেকে প্রমাণের অভাবে শাস্তি পায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনও পালানোর উপায় নেই। তার অবচেতন মন, স্মৃতি থেকে অপরাধ খুঁজে নিয়ে তার অপরাধ প্রমাণ করছি। এমনকী তা কোর্টেও প্রমাণ করা যাবে।

ফের আমার শুরুর প্রশ্নটাই আবার করে উঠলাম। সেটা গ্যাব্রিয়েল পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। —কিন্তু এরা এখানে আসে কেন? ওদের এতে কী আগ্রহ?

—এখানে একজন অত্যন্ত বিখ্যাত লোকাল ডাক্তার আছেন। নাম ডেভিড। এখানকার প্রায় সবাই ওঁর বহুদিনের পেশেন্ট। এখানকার সবাই ওঁকে খুব বিশ্বাস করেন। উনি বলায় ওরা এখানে আসে। বুঝতেই পারছ বয়স হলে কিছু না কিছু মানসিক সমস্যা থাকে। অনেকেরই ঘুমের সমস্যা থাকে। ঘুম আসে না ইত্যাদি। কেউ বা খুব একাকীত্বে ভোগে। উনি ওদের বলেন যে এই ট্রিটমেন্ট ওদের সাহায্য করবে। সত্যি তাই। করেও। সেটা আমি ওঁকেও বুঝিয়েছি।

আমিও এদের ঘুম—স্বপ্নের নেচার দেখে ঘুম আরও ভালো কীভাবে হয়, কী কী করতে হবে সে ব্যাপারে খুব স্পেসিফিক কিছু জানাই। বুঝতেই পারছ লোকটার স্বপ্ন-অতীত আমার কাছে একটা খোলা খাতার মতো। তাই কী দেখেছি না বলে কী করা উচিত সেটা বলা সম্ভব। কিছু কিছু স্মৃতি মধুরও হয়, তাই না! সে সব কথা যখন বলি, তখন এদের ভালো লাগে। তা ছাড়া আমার এই ফেসিলিটিতে স্পা ট্রিটমেন্ট, স্টিম, সনা— সব রোগীদের জন্য ফ্রি। তাই এরা এই সময়টা ভালো উপভোগও করে। তা যাই হোক, আমার অন্য পরীক্ষার কথাটা সামনে আনি না।

একটু থেমে মুচকি হেসে ফের বলে উঠল— আমি জানি তুমি বলবে না। তুমি নিজেও জানো বিজ্ঞানে অগ্রগতি করতে গেলে কীরকম পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

আরও কিছু কথা বলার পরে গ্যাব্রিয়েল আমাকে পুরো ক্লিনিকটা ঘুরে দেখাল। খুব আধুনিক নানান যন্ত্রপাতি। যেসব রুমে রোগী অর্থাৎ টেস্ট সাবজেক্টকে ঘুমন্ত অবস্থায় এসব পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়, সেটা দেখাল। অজস্র যন্ত্র। কোনওটাতে 'পজিট্রন এমিসন টোমোগ্রাফি' বা পেট স্ক্যানের মাধ্যমে ব্রেন অ্যাক্টিভিটি দেখা হয়, কোনওটাতে ইলেক্ট্রো-এন-সেফ্যালোগ্রাফি-র মাধ্যমে ব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রিকাল অ্যাক্টিভিটি দেখা হয়। এরকম নানান যন্ত্র। মনে হয় যেন কোনও অত্যাধুনিক ল্যাবের মধ্যে ঢুকে গেছি।

আড়াই ঘণ্টার মতো ছিলাম ওখানে।

বেরিয়ে এসে কিছু প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল। কারা গ্যাব্রিয়েল-এর রিসার্চে এত খরচ করছে? গ্যাব্রিয়েল-এর রিসার্চ কী শুধুই অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে নাকি এর আড়ালে অন্য কিছু আছে?

আমি গ্যাব্রিয়েলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না। একটু জানলে ভালো হত।

কে জানতে পারে? স্ট্যানফোরর্ডে ওর সমসাময়িক কয়েকজনকে চিনি। তারা কিছু বলতে পারবে ওর ব্যাপারে!

কেন জানি না মনে হচ্ছিল এখানকার এই মহামারীর সঙ্গে গ্যাব্রিয়েল-এর কোথায় যেন যোগাযোগ আছে। কয়েকটা জিনিস জানা দরকার।

১। যারা মারা গেছে তারা গ্যাব্রিয়েল-এর ক্লিনিক এ সাম্প্রতিককালে এসেছিল কিনা। কিন্তু সেটা জানতে হলে আমাকে ওই ক্লিনিকের রেজিস্টার চেক করতে হবে। সেটা পুলিশের সাহায্য ছাড়া হবে না।

২। তাদের সবাই কী মারা গেছে? সেক্ষেত্রে সেটা তো খুব সহজেই লোকে রিলেট করতে পারত। হয়ত সে রকম নয়।

৩। এটা কী গ্যাব্রিয়েল-এর ট্রিটমেন্টের সাইড এফেক্ট নাকি ইচ্ছাকৃত? সেক্ষেত্রে ও কেন করছে? ওর মতো একজন বিজ্ঞানী এতজনকে কেন অহেতুক মারবে? জানার জন্য গ্যাব্রিয়েল ও এখানকার লোকেদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাদের সম্বন্ধে জানা দরকার।

ক্লিনিকের পরে লাইব্রেরিতে গেলাম। তখন অবশ্য চারটে।

স্যামোনির মধ্যে ১৬ টা ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। তার মধ্যে 'এল প্রাজ'— এ আর 'এলজ মুলসে' -তে বয়স্কদের মধ্যে এই অসুস্থতার লক্ষণ বেশি দেখা যাচ্ছে। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে যেটা খুঁজছিলাম, সেটা পেয়ে গেলাম। এই দুটো জায়গাতেই জনপদ গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। একটা বড় অংশ এসেছিল বার্লিন থেকে। এই অংশে সেই জন্য জার্মান প্রভাব এখনও বেশি। এরা যারা এসেছিল তারা প্রত্যেকে বেশ অর্থবান। সেজন্য তারা আসার পরেই এখানকার লোকাল ইকোনমি আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। পাঁচটায় লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়।

একটা ধারণা মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে। কিন্তু সেটা এখানে বসে আমার পক্ষে একা শলভ করা সম্ভব নয়।

এখন সারা গায়ে ব্যথা। বুঝতে পারছি স্কি জোরিং-এ এই বরফের উপরে বারবার আছাড় খাওয়ার ব্যথা বেশ কয়েকদিন থাকবে। আজ এখানেই ডায়েরি লেখা শেষ করে কিছু প্যারাসিটামল খেয়ে নিই। তা না হলে কাল আর বেরোতে পারব না।

১৭ জুন, রাত ন'টা

আজ সকাল থেকে এত কিছু ঘটে গেল যে এখনই লিখে রাখি।

সকালে ভাবছিলাম পুলিশের কাছে যাব। একবার গিয়েওছিলাম। কমলা রঙের একটা ছোট দোতলা বিল্ডিং। ঠিক পুলিশ স্টেশন বলে মনে হয় না। কিন্তু ঢোকার আগে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম কীভাবে বলব! এখনও হাতে তেমন কোনও প্রমাণ নেই। যদি বলি এসব মৃত্যুর সঙ্গে গ্যাব্রিয়েল-এর যোগাযোগ থাকতে পারে, তার জন্য গ্যাব্রিয়েল-এর উপরে লক্ষ রাখা দরকার, ওরা কী আমার কথা বিশ্বাস করবে! এখনও অবধি তেমন কোনও প্রমাণ পাইনি

যার জন্য গ্যাব্রিয়েলকে কোনওরকম ভাবে সন্দেহ করা যায়। একই সঙ্গে আমিও চাই না গ্যাব্রিয়েল অহেতুক কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়ুক।

তাছাড়া কাজ চালানোর মতো যেটুকু ফ্রেঞ্চ জানি, তাতে এদের এসব জটিলতা বোঝানো বেশ শক্ত কাজ। কী বুঝতে কী বুঝবে কে জানে! শেষে আমার ঘুমের কোনও সমস্যা আছে, এরকম কিছু না ভাবে!

হয়তো আমারই ভুল। এই অসুখের সঙ্গে হয়তো গ্যাব্রিয়েল-এর স্বপ্নের রিসার্চের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কিছুর জন্য হচ্ছে।

যাই হোক শেষে পুলিশ স্টেশনে ঢুকলাম না। আরভে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পাহাড়ি নদী। বেশ স্রোত আছে এ সময়। দু-ধার দিয়ে নানান রঙের টিউলিপ, ম্যাগনোলিয়া, ক্রোকাস, সূর্যমুখী ও গাঁদা ফুল ফুটে আছে। মনে হচ্ছে যেন এক ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে আরভে নদী তার পথ খুঁজে নিয়ে দূরে বরফে ঢাকা আল্পসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজ মাথার উপরে ঝলমলে নীল আকাশ। নানান শেপের সাদা মেঘ ভাসছে।

একটা ছোট দোকান থেকে সেদিনকার খবরের কাগজ কিনে খবরে চোখ বোলাচ্ছিলাম।

বড় করে ওই অসুখের খবর হেডলাইনে। ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টও এই বিষয়ে গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। একটা মেডিকেল টিম ইতিমধ্যে এখানে চলে এসেছে। গতকাল আরও সাত জন মারা গেছে এখানে।

আমি গতকাল অনেক রাতে ফিলিপ-এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ফিলিপ স্ট্যানফোর্ডে বেশ কয়েক বছর গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে রিসার্চ করেছে। ওকে বন্ধু হিসেবে ভালো করে চেনে। ফিলিপ এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। তাই ওর তখন বিকেল। ওর কাছ থেকে যা খবর পেয়েছি,তাতে গ্যাব্রিয়েল সম্বন্ধে তাতে সন্দেহ আরও বেড়েছে।

গ্যাব্রিয়েল এমনিতে খুব শান্ত, চুপচাপ থাকত। কারও সঙ্গে মিশত না। গোড়া ইহুদি। খাওয়ার সময় মাথায় 'কিপাহ' পরত। রোজ চারবার করে নাকি প্রার্থনা করত। নিয়মমতো ইহুদিদের পবিত্রতম দিন 'ইওম কিপ্পুর'-এ সিনাগগে সারাদিন প্রার্থনায় কাটাতো। ওর পরিবারের সম্বন্ধে ফিলিপ তেমন কিছু জানে না। তবে অনেক ইহুদিদের মতোই গ্যাব্রিয়েল নাৎসি জার্মানদের পছন্দ করত না।

ওদের পরিবার অর্থাৎ ওর বাবা খুব কম বয়সে আমেরিকাতে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। গ্যাব্রিয়েল আমেরিকায় বড় হয়েছে। কিন্তু ওর ধর্ম, পরিচয় কখনও হারায়নি। সেটা আঁকড়ে থেকেছে।

একটা কথা মাথায় ঘুরছে। এরকম কী হতে পারে যে স্যামোনিতে যারা এসেছিল জার্মানি থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধে পরে, তাদের মধ্যে একদল নাৎসি ছিল। তারা এখানে পালিয়ে এসেছিল যুদ্ধের অপরাধের শাস্তির থেকে রেহাই পেতে। সেখানে তাদের মধ্যে কিছু নাৎসি থেকে থাকতেই পারে।

গতকাল এখানকার লাইব্রেরিতে এমন কিছু তথ্য পেয়েছি, যাতে সেটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত সেরকম একটা পরিবারের সন্ধান পেয়েছি।

হিটলারের ইনার সারকেলের অর্থাৎ খুব কাছের লোক ছিলেন হারমান গোরিং। গোরিং 'গেস্টাপো' বা সিক্রেট পুলিশ তৈরি করেছিলেন। ইনটারনাল অ্যাফেয়ার্স-এর মন্ত্রী ছিলেন। গোরিং যুদ্ধ শেষের পরে সায়ানাইড খেয়ে সুইসাইড করে। তার মেয়ে এখানে চলে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। তার কথা লাইব্রেরির বইতে দেখেছি। নিশ্চয়ই এরকম আরও বেশ কিছু নাৎসি এসেছিল।

আমি জানি এরকম অনেক নাৎসি হান্টার এখনও আছে যাদের অনেকক্ষেত্রে ইজরায়েলি সরকার ফান্ড করে। টাকা দেয়। তাদের কাজ নাৎসিদের খুঁজে বার করা, যারা সেই সময় ইহুদিদের উপর অত্যাচার করেছিল। অনেক এস এস গার্ড যারা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করেছিল, তারা এখনও তাদের পরিচয় গোপন করে বিভিন্ন দেশে লুকিয়ে আছে। কোনওরকম শাস্তি পায়নি। সে কারণেই কী গ্যাব্রিয়েল এখানে এসেছে! বদলা নিতে? ও টার্গেট করছে তাদের, যারা একসময় নাৎসি ছিল। কিন্তু এত নামকরা এক বিজ্ঞানী এত বছর বাদে কী এসব মনে রাখবে! নাকি এসবই আমার কল্পনা।

এসব ভাবছি। ঠিক এর মধ্যে 'অনিলিখা' ডাক শুনে চমকে উঠলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি পাশের বেঞ্চে কখন জানি ডেভিড এসে বসেছেন। ডেভিড মানে যার সঙ্গে গতকাল লাইব্রেরীতে দেখা হয়েছিল।

আমি একটু অবাক হলাম। কারণ কাল আমার নাম ওঁকে শুধু সহজ করে অনি বলেছিলাম আমার পুরো নামটা বলা শক্ত হতে পারে ভেবে। উনি কী করে পুরো নামটা জানলেন?

উনি হেসে বলে উঠলেন—হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ। দ্য ফেমাস লেডি ইস হিয়ার, ইন দিস লিটল হ্যাঁমলেট।

পরিষ্কার ইংরাজিতে তারপরে উনি যা বললেন—তা হল আমাকে দেখেই তার চেনা চেনা লেগেছিল। তার পরে লাইব্রেরীর ভিজিটার রেজিস্ট্রেশনে আমার পুরো নাম খুঁজে পান। ইন্টারনেট সার্চ করে আমার অজস্র রিসার্চপেপার-এর উল্লেখ, আমার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেক ডিটেলস পেয়েছেন, যার কিছু অবশ্য উনি আগেই জানতেন।

হেসে ফের বলে উঠলেন—খুব বাজে সময় এখানে বেড়াতে এসেছো। এখন কী হচ্ছে এখানে তাই ভাবছ তো? হঠাৎ করে এতজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মারা যাচ্ছে। এই কাগজে এবিষয়ে আমার একটা লেখা আছে। পড়ে দেখো।

বলে আমার হাতে ধরা কাগজের নীচের দিকে একটা প্রতিবেদনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

—এটা পড়েছো? ওখানে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছে। অবশ্যই সেটা একটা অন্যতম সম্ভাবনা। নাও হতে পারে। এখানে একটা মেডিকেল টিম এসেছে, তারা সেই সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখছে।

আমি অবাক দৃষ্টিতে ওই আর্টিকেল-এ দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে উঠলাম— আপনিই ডক্টর ডেভিড কোহেন? গতকাল যখন দেখা হয়েছিল তখন আপনার পরিচয় জানতাম না। আপনিও তো কম বিখ্যাত নন। আপনার মতো একজন বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট এখানে আছেন জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি আপনার কথাই গতকাল গ্যাব্রিয়েল বলেছিল।

—গ্যাব্রিয়েলকে তুমি চেনো! কী বলেছিল?

কীভাবে গ্যাব্রিয়েলকে আগে থেকে চিনি, সেটা বলে জানালাম যে গ্যাব্রিয়েল বলেছিল যে ডেভিডের সাহায্য ছাড়া ওর ক্লিনিকে ও রোগী পেত না।

উনি হেসে বলে উঠলেন—এ আর কিছুই নয়। গ্যাব্রিয়েল তো এখানে নতুন এসেছে। আমার সঙ্গে এসে ও তাই যোগাযোগ করেছিল। আমার নিজের ওর কাছ থেকে ওই চিকিৎসা পদ্ধতি শুনে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। এবারে রোগীদের আমি না রেকমেন্ড না করলে কে আর এরকম এক্সপেরিমেন্টাল ট্রিটমেন্ট-এ নিজে থেকে আগ্রহী হবে।

এদের অনেকের নানান ধরনের বয়সজনিত মানসিক অসুস্থতা থাকে। কারও ঘুম আসে না তো কেউ ডিমেন্সিয়াতে ভোগে। ওর এই রোগীর ঘুম ও স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে তাদের চিকিৎসা বা ঘুম বাড়ানোর উপায় বাতলে দেওয়া আমার বেশ ভালো লেগেছিল। যারা গিয়েছে তাদের বেশ কয়েকজন ওর সম্বন্ধে বেশ ভালো ফিডব্যাক দিয়েছে। তাই রেকমেন্ড করি। তা ও কী করে এসব করে সেটা ভালো বুঝি না অবশ্য।

তার মানে বুঝলাম, ডেভিডকে পুরোটা বলেনি গ্যাব্রিয়েল। আসলে যে ও এর মাধ্যমে তাদের পুরনো অপরাধ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে, সেটা সম্পূর্ণ গোপন করে গেছে।

আমি এবার কাগজের প্রতিবেদনটার ব্যাপারে এলাম। বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি বলে উঠলাম —আপনি যেটা লিখেছেন সেটা তো রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। এখানেই যে এরকম এত বড় মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ সেন্টার তা জানতাম না।

উনি সায় দিলেন। বলে উঠলেন—হ্যাঁ, সেটা অনেকেই জানে না। খুব বড়।

কী লেখা ছিল সেটা একটু সহজ করে এখানে লিখে রাখি। গ্রিসের সমুদ্রের নীচের সীবেড থেকে একটা ব্যাকটিরিয়াল ইকোসিস্টেম উদ্ধার করা হয়েছে। এটা মাটির লেভেল থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার গভীরে। তাই আগে এরকম জায়গায় ড্রিল করা অসম্ভব ছিল। দু-মাস আগে একটা টিম সমুদ্রের তলার এই লেয়ার থেকে কিছু ব্যাকটিরিয়া নিয়ে আসে। তারা পরীক্ষা করে দেখে যে এসব ব্যাকটিরিয়া প্রায় ১০১ মিলিয়ন বছর ধরে বেঁচে রয়েছে। এটা একটা মিরাকেল। এই এতটা দীর্ঘ সময় তারা সী বেডে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ক্রেটেসিয়াস টাইমের এসব ব্যাকটিরিয়ায় মধ্যে চার-চারটে প্রজাতি পাওয়া গেছে, যারা এখন বিশ্বে আর কোথাও নেই।

এধরনের প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া বাকি পৃথিবী থেকে বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের নিয়ে এখন এখানে রিসার্চ হচ্ছে। ডক্টর ডেভিড এর ধারণা যে সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া ওই মাইক্রোব কোনও না কোনওভাবে মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ সেন্টার থেকে লিক করে এখানে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। সে বিষয়ে ইমিডিয়েটলি খতিয়ে দেখা দরকার। সেটা নিয়েই এই লেখা।

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু ব্যাকটিরিয়া কি এরকম ঘটনার পিছনে দায়ী থাকতে পারে?

উনি বলে উঠলেন— কেন নয়! অটিজম, সেটাও তো হয় পাকস্থলীতে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়া না থাকার জন্য হয়। সেজন্য আমেরিকাতে এত বেশি অটিজম হয়, আর ভারতে কম হয়। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি যেখানে কোনও ব্যাকটিরিয়া থাকা বা না থাকার জন্য ব্রেন ফাংশান প্রভাবিত হয়েছে। হয়তো এই ব্যাকটিরিয়া বয়স্কদের জন্য বেশি ডেঞ্জারাস। কোনও ভাবে তাদের ব্রেনকে প্রভাবিত করছে। দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা এসে কী বলেন! আসলে বুঝতেই পারছ এখানে আমরা চার চারটে প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার কথা বলছি যারা সারা বিশ্ব থেকে ১০১ মিলিয়ন বছর আগে বিলুপ্ত। অথচ এখন তারা এই—এই শহরের ল্যাবে আছে। সেজন্য কোনওভাবে সেখান থেকে সংক্রমণ হওয়াটা খুব লাইকলি।

বললাম না কিছু। অসম্ভব নয়, বিশেষ করে এটা শুধু সমাপতন নাও হতে পারে। এখানেই যখন এ বিষয়ে রিসার্চ শুরু হয়েছে। এখানকার ল্যাবেই যখন একমাত্র আছে সে ব্যাকটিরিয়া!

আরও কিছু কথার পরে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা, আপনাকে একটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আপনার কী মনে হয় এখানে যারা থাকে, তাদের মধ্যে কিছু নাৎসি আছে!

—হতে পারে, সেটা অসম্ভব নয়। তবে সে তো ইউরোপের অনেক শহরেই থাকতে পারে লুকিয়ে। আমি এখানে আছি সত্তর বছর ধরে। সেরকম কেউ আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও সব মারা গেছে। এতদিন কী আর কেউ বেঁচে থাকবে? কবেকার কথা। তাছাড়া আমরা তো ওদের দুষ্কর্মের কথা ভুলেই গেছি প্রায়। কিন্তু হঠাৎ করে এ প্রশ্ন?

—না, এরকম তো হতে পারে যে তারাই মারা যাচ্ছে। কেউ তাদের মারার চেষ্টা করছে।

—এত বছর বাদে হঠাৎ করে কেন করবে? তাদের মারার ইচ্ছে থাকলে তো আগেই মারা যেত। না না, এটা নেহাতই ওয়াইল্ড গেস। কষ্টকল্পনা।

—হয়তো যে বা যারা মারছে, তারা আগে এদের উপস্থিতি জানত না। এখনই জানতে পেরেছে।

উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে বলে উঠলেন— হ্যাঁ, তা হতেই পারে। যাদের সে সময়ের কথা মনে আছে, তাদের ওদের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকাটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ নাৎসিদের কথা মনে এল কেন?

—আসলে লাইব্রেরির একটা বইতে দেখেছিলাম যে বেশ কিছু জার্মান এসেছিল এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে।

—সে আসতেই পারে। তার মানে তারা যে নাৎসি ছিল, তা নয়। তা ছাড়া কোনওরকম অপরাধ করে থাকলে তারা কী আর এত দিন এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারত? আমি সেরকম কিছু শুনিনি কখনও।

আরও খানিকক্ষণ কথা হল। এখানে কী কী অবশ্যই ঘুরে দেখা উচিত, সেসব ব্যাপারে কিছু খবর পেলাম।

খানিক বাদে আমি উঠে পড়লাম। কিছু কাজ করতে হবে। এখানে যারা মারা গেছেন, তাদের পরিবারের সঙ্গে যদি কথা বলা যায়। বেশিরভাগই কাছাকাছি থাকেন।

১৮ জুন, রাত ন'টা

আমার ধারণা যে খুব ভুল নয়, ঠিক দিকেই যে এগোচ্ছি, তার প্রমাণ পেলাম।

তবে এখানে আমার পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রথমেই রাইকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওর বাবা এখনও খুব অসুস্থ। চিকিৎসায় কিছুই উন্নতি হয়নি। মৃত্যু শয্যায়। যেকোনও সময় খারাপ খবর আসতে পারে। মন তাই খুব খারাপ। বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকের ব্যাপারে। ওর সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে কিছুদিন আগে গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকে ওর বাবা ও মা দুজনেই গিয়েছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে খানিকটা অবাক হয়েই বলে উঠল—কিন্তু হঠাৎ করে এ প্রশ্ন? তার সঙ্গে অসুস্থতার কী কিছু সম্পর্ক আছে?

ওকে বললাম যে নারকোলেপ্সী বলে একরকম ব্রেন ডিসঅর্ডার আছে যেখানে ঘুম আর জেগে থাকা মিলেমিশে যায়। এর জন্য সেই রোগীর মনে একধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

যদি কোনও ভাবে ব্রেনকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যায় যাতে কেউ ঘুমের র‍্যাপিড অ্যাই মুভমেন্টের অবস্থা থেকে বেরোতে না পারে, তাহলে সে তার স্বপ্নের মধ্যেই হারিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমার সেরকম কিছু হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ হচ্ছে। তবে তার জন্য অন্য যারা অসুস্থ হয়েছে, তাদের সবার কথা জানতে হবে।

ও শুনে বেশ কিছু প্রশ্ন করে উঠল। এক এক করে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। শুনতে শুনতে ও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। পারলে তখনই গিয়ে গ্যাব্রিয়েলের বাড়ি গিয়ে হামলা করে। আমি ওকে নিরস্ত করে বললাম যে এটা শুধু একটা ধারণা। ভুল হতে পারে।

এটা সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখতে হবে। অন্য যারা মারা গেছে তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের সবার আগে যোগাযোগ করতে হবে। জানতে হবে তারাও গ্যাব্রিয়েল-এর ক্লিনিকে যাওয়ার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা।

ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে ফোন করল। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ও চিনত। তারা ওর গ্রামেই থাকত। তাদের আত্মীয়দের ফোন নাম্বার পেতে বিশেষ সময় লাগল না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আর রাইকার মিলে এরকম দুজন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম। অনুমান ঠিক। তারাও গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকে গিয়েছিল। তবে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে। আবার এমন কয়েকজনের খবরও পেলাম যারা গ্যাব্রিয়েল এর ক্লিনিকে গেছে, কিন্তু কিছু হয়নি। সেটার জন্য এটা কখনও বলা যায় না যে গ্যাব্রিয়েল এর রিসার্চ-এর পিছনে আছে। বিশেষ করে যখন তাদের ক্লিনিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু হয়নি। তাছাড়া পছন্দ না করা এক জিনিস, আর হত্যা করা আরেক জিনিস।

রাইকার-এর পরিবারের নাৎসি যোগাযোগের ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার। তাছাড়া কেউ স্বীকার করবে না।

এসব করতে করতে হোটেল ফিরলাম রাত সাড়ে আটটায়। আজ আর রাতে খাওয়ার ইচ্ছে নেই। তাই ডায়েরি নিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিলাম। আপাতত আমার ফেরা পিছোতে হবে। সেটা সহজ হবে না যদিও, বেশ কিছু কাজ ছিল। কিন্তু এটার সমাধান না করে ফেরা সম্ভব নয়।

২১ জুন, রাত এগারোটা

খানিক আগেই বাইরের নৈঃশব্দ্যতাকে থমকে দিয়ে গির্জার ঘড়ি এগারোবার বেজেছে।

আমিও ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও প্রায় জোর করেই ডায়েরি নিয়ে বসেছি।

এ তিনদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। এজন্য গত দুদিন আর ডায়েরি লেখারও সময় হয়নি। প্ল্যান মতো ঘুরতে যেতেও পারিনি।

আজ গ্যাব্রিয়েলকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আমার কথামতো ওরা গত কয়েকদিন ধরে গ্যাব্রিয়েলের উপরে নজর রেখেছিল। ওকে বুঝতে দেয়নি। আমাকে ওরা শুধু মাঝেমধ্যে কিছু কিছু খবর দিচ্ছিল। আমিও ওদের কিছু বিষয়ে গাইড করছিলাম, কী করতে হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছিলাম।

আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখেছিলেন এ বিষয়ে তদন্তের দায়িত্বে থাকা ফ্রেঞ্চ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অলিভিয়ে ব্লাঁশে। উনি আমার নাম শুনেছিলেন আগেই। সরাসরি এই তদন্তে যুক্ত ছিলেন বলেই এত তাড়াতাড়ি সবকিছু হল।

আমি ওদের বলেছিলাম গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকে কারা কারা এসেছে গত তিন মাসে এসেছে, সে সব তথ্য বার করতে। তারা এখন সবাই কেমন আছে সেটা জানতে।

দেখা গেল যারা ক্লিনিকে এসেছে, তাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বেশিরভাগের উপরে সেরকম কোনও প্রভাব পড়েনি। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, যারাই মারা গেছে বা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের সবাই কোনও না কোনও দিন গ্যাব্রিয়েলের ওই ক্লিনিকে ওর এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে গ্যাব্রিয়েলের ওই ক্লিনিকের সঙ্গে এই অসুস্থতার নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে।

কিন্তু দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন সবার হয়নি কেন? কারও কারও শুধু হয়েছে। যদি গ্যাব্রিয়েল কিছু ওষুধ দিয়ে যাবে, তাহলে সবারই হওয়ার কথা ছিল। নাকি এটা সবার হয় না।

দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন আছে।

এই মৃত্যুটা ক্লিনিক থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। কারও ক্ষেত্রে হয়েছে দশ দিন বাদে, কারও ক্ষেত্রে প্রায় এক মাস বাদে। মাঝে কোনওরকম অসুস্থতা বা সিম্পটমও দেখা যায়নি। তারপরে রাতারাতি অসুস্থতা ও দু-এক দিনের মধ্যে মৃত্যু। সেজন্য অবশ্য এই যোগাযোগটাও শুরুতে কেউ বুঝতে পারেনি।

এটা যে ও কীভাবে করছিল কে জানে!

পুরো ব্যাপারটা সামনে এল পেশেন্ট ফাইল দেখার পরে।

আমি পুলিশকে বলেছিলাম ক্লিনিক থেকে পেশেন্ট ফাইল উদ্ধার করতে। নিশ্চয়ই পরীক্ষার পর রোগীর স্বপ্নের উপরে কোনও ডিটেল্ড রিপোর্ট থাকত।

কিন্তু সেটা প্রথমে পাওয়া যায়নি।

একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রোগীদের দেওয়া হত যেখানে তাদের ঘুম ভালো করার জন্য কী কী করতে হবে, টেনশন কমানোর জন্য কী করতে হবে— এরকম অনেক কিছু লেখা থাকত। কিন্তু এর বাইরে আমি আরেকটা রিপোর্ট খুঁজছিলাম।

আমার ধারণা ছিল এরকম নিশ্চয়ই কোনও রিপোর্ট আছে যেখানে স্বপ্নে ঠিক কী কী পাওয়া গেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

সেটাই তো গ্যাব্রিয়েলের গবেষণা, যেখানে স্বপ্ন থেকে পুরনো কোনও অপরাধের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রিপোর্টটা পাওয়া যাচ্ছিল না।

কিন্তু মন বলছিল সেরকম কিছু অবশ্যই আছে। ওর ক্লিনিকে ও ঠিক কী কী করে সেটা বোঝার জন্য আমার পরামর্শে ঘরের কিছু জায়গায় দ্বিতীয় দিনে সি সি টিভি ক্যামেরা লাগানো হয়। তাতে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা টেস্ট সাবজেক্টের উপর পরীক্ষার পরে কিছু তথ্য গ্যাব্রিয়েল ওর পারসোনাল ল্যাপটপে লিখে রাখে। অনেক সময় কাটায় সে রিপোর্টে। সেটা শুধু ওর ল্যাপটপে থাকে। ক্লিনিকের অন্য কোনও কম্পিউটারে সে তথ্য থাকে না। তার কোনও প্রিন্ট আউট নেওয়া হয় না।

এরকম এক রোগীর ক্ষেত্রে নোট নেওয়ার সময়ে আমার কথামতো পুলিশ হঠাৎকরে ওর ক্লিনিকে ঢোকে। প্রায় হাতে নাতে ওকে ধরা হয়। প্রথমে রাজি না হলেও বাধ্য হয়েও সেই রিপোর্ট শেয়ার করতে বাধ্য হয়। পরে একটা এনক্রিপটেড ফাইল ওই পারসোনাল ল্যাপটপ থেকে পাওয়া যায়, যেখানে সবার তথ্য ছিল।

সেখানে কে অতীতে কী কী অপরাধ করেছে, সেরকম অনেক কিছুই ডিটেলসে লেখা আছে।

সেটা দেখার পরেই ওকে অ্যারেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ যারাই মারা গেছে, দেখা গেছে তাদেরকেওর ওই রিপোর্টে নাৎসি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের পুরনো অপরাধের উল্লেখ সেখানে আছে।

এমনকী সে রিপোর্টে তারা কী কী ধরনের স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার ভিত্তিতে কীভাবে ও ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সে বিষয়েও লেখা ছিল। ঠিক যেন ও নিজের কাছে সৎ থাকতে চেয়েছে, নিজের বিচার যে কোনওভাবে ভুল নয়, সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছে।

সেখানে ড্রিম ব্যাংকের অন্য অপরাধীদের স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে স্বপ্নে সাংকেতিক ভাষায় সে অপরাধ ধরা পড়েছে তা বোঝানো হয়েছে। সেটা লিখতে গেলে অনেক লেখা হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ করছি না।

কিন্তু সে পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের উপরে কে কী ধরনের অপরাধমূলক কাজ করেছিল, তা বোঝা গেছে।

অনেকে আউসউইৎজ বা ট্রেব্লিঙ্কা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এস এস গার্ড হিসেবে কাজ করেছিল। কেউ বা গেস্টাপো বা নাৎসিদের সিকরেট পুলিশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেউ বা ক্যাম্পের পাঁচিলের উপর থেকে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বন্দিদের গুলি করে মারত। কেউ বা গ্যাস চেম্বারে বিষাক্ত 'জাইক্লোন বি' গ্যাসের ক্যাপ্সুল ফেলার পরে ইহুদিদের মৃত্যুর আগের সেই আর্ত চিৎকার শুনে পৈশাচিক আনন্দ পেত। কারও কাজ ছিল শুধুই ক্যাম্পের বন্দিদের উপরে কারণে-অকারণে অত্যাচার করা, অপমান করা যাতে তারা তাদের নিজেদের মানুষ ভাবতে লজ্জা পায়। কেউ আবার অজস্র ইহুদি নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এ সবই স্বপ্ন থেকে বোঝা গেছে।

আমার অনুমান মতো এই নাৎসিদের প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও পরে মারা গেছে গ্যাব্রিয়েলের চিকিৎসায়। রাইকারের বাবার রিপোর্টে উল্লিখিত যে রাইকারের বাবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে কাজ করত। কাজ ছিল ক্যাম্পের বন্দিদের ওই গ্যাস চেম্বার অবধি নিয়ে আসা।

রাইকার নিজেও বাবার এই পূর্ব অপরাধ সম্বন্ধে জানত না।

অর্থাৎ স্বপ্নের মাধ্যমে গ্যাব্রিয়েল নাৎসিদের চিহ্নিত করত। তারপরে হয়তো তাদের জন্য এমন কিছু করত যাতে তারা স্বপ্নের মধ্যে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। কীভাবে করত সেটা অবশ্য বোঝা এখনও যায়নি।

তবে সেটা সহজে সামনেও আসবে না যদি না ও বলে। সেটাই ওর পেটেন্টেড প্রসেস।

আজ পুলিশের জেরার সময় গ্যাব্রিয়েল স্বীকার করে নিয়েছে ওর অপরাধ। একই সঙ্গে বলেছে যে এদের পঞ্চাশ বছর আগে নুরেমবারগ ট্র্যায়ালে শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আইনকানুনের ফাঁক দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে এরা বহাল তবিয়তে সারাজীবন কাটিয়েছে। এমনকী এরা বন্দি ইহুদিদের থেকে কেড়ে নেওয়া ধনসম্পত্তি দিয়েও সারাজীবন বৈভবের মধ্যে আনন্দে কাটিয়েছে। সেদিক থেকে ও যে এতজনকে শাস্তি দিতে পেয়েছে তাতে ও আনন্দিত। ওর এর জন্য কোনও অপরাধবোধ নেই।

কিন্তু কীভাবে ঠিক এটা করত সে ব্যাপারে এখনও কিছু বলেনি। অবশ্য এটা জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ওর সব যন্ত্র, নোটস দেখলেই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা আশা করি এই পদ্ধতি বুঝতে পারবে।

গ্যাব্রিয়েলের বাবা পোল্যান্ডের ট্রেবলিঙ্কা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ছিল। ওর ঠাকুরদা ও ঠাকুমা দুজনেই সেখানেই মারা যায়। বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ক্যাম্প থেকে ছাড়া পায়। আমেরিকায় চলে আসে।

তাই এই গভীর ঘৃণা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়তো এই লোকগুলোর জন্য এটাই ছিল উপযুক্ত শাস্তি।

এতটা বলে অনিলিখাদি ডায়েরিটা নামিয়ে রাখল।

আমরা বলে উঠলাম— তারপরে? গ্যাব্রিয়েলের কী হল? কীভাবে এদের এরকম অবস্থা করছিল, সেটা বোঝা গেল!

অনিলিখাদি এবারে থেমে বলে উঠল— বলছি। বিশেষ কারণে এর পরে আমি আর ডায়েরি লিখিনি। কখনও ওই ডায়েরি কারও হাতে গিয়ে পড়লে আমার মুশকিল হতে পারত। তবে বাকিটা বলছি।

—মানে? এর পরে আর না লেখার মতো কী বাকি থাকে? তুমি তো বলেই দিলে।— প্রতীক বলে উঠল।

—না, না। এখনও সব শেষ হয়নি। সে কথায় আসছি। আগেই তোদের মরভান সিনড্রোমের কথা বলেছি। এরা অনিদ্রা রোগে ভোগে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শুধু জেগে থাকে। মাসখানেক পরে মৃত্যু হয়। সারাদিন কাজের পরে দুর্বল হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক কোষের সিনাপ্সেসগুলো আবার কিছুটা সতেজ হয়। না ঘুমোতে পারলে সেই সিনাপ্সেসগুলো দুর্বল হতে হতে মানুষ তার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শেষে মৃত্যু হয়। প্রশ্ন ছিল, সেরকম কিছু কী করেছে গ্যাব্রিয়েল?

নাকি এদের অবস্থা 'নারকোলেপ্সি'র রোগীদের মতো হয়! নিদ্রা আর জাগরণ মিশে যায়। গ্যাব্রিয়েল কী কোনওভাবে এই র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট অবস্থাটাকে প্রলম্বিত করে দিচ্ছিল যাতে সে রোগী না ঘুমোতে পারে, না জেগে থাকতে পারে। সেজন্য তাদের দেখে মনে হত যেন তারা যেন স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আসলে তারা বাস্তবে আর ফিরে আসতে পারছে না।

কিন্তু প্রশ্ন এ দুই ক্ষেত্রেই এটা সঙ্গে সঙ্গে হওয়ার কথা। অর্থাৎ ক্লিনিক থেকে ফেরার পরের সেই রাতে, যার জন্য পরের দিন ভোরবেলায় রোগীর মধ্যে এ পাগলামি দেখা যেত। কিন্তু

সেরকম তো কোনও ক্ষেত্রেই হয়নি। একই সঙ্গে কোনও ওষুধও দেয়নি গ্যাব্রিয়েল। এত দিন বাদে কীভাবে হঠাৎ করে এটা হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে কোনও ক্ষেত্রেই গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে এর পরে আর সেই রোগীর দেখা হয়নি। তাহলে?

—এগুলো তো তোমার ধারণা। তারপরে? তুমি কী করলে?—তন্ময় অধৈর্য হয়ে বলে উঠল।

—বলছি। আমি নিজে গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিক সম্বন্ধে আরেকটু জানতে চাইছিলাম। এসব ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো তথ্য দিতে পারে ওর ক্লিনিকের সেই রিসেপশনিস্ট মহিলা। সেলিন। ফ্রেঞ্চ মহিলা। কিন্তু ইংরেজি সামান্য বলতে পারে। সেলিন এর বয়স বেশি নয়। বছর কুড়ির কাছাকাছি। ছটফটে বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু তাকে তো পুলিশ অনেক প্রশ্ন করেছে। সে কী আমাকে এত সহজে সবকিছু বলবে! তার জন্য ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা দরকার।

তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার একটা সুযোগ এল ঠিক পরের দিন। টেনিস কোর্টে। দেখি সেলিন এক মাঝবয়সি মহিলার সঙ্গে টেনিস খেলছে। সেলিন যেরকম ভালো খেলে, সে তুলনায় অন্য মহিলা প্রায় খেলতেই পারছেন না। তোরা তো জানিস আমি নিয়মিত টেনিস খেলেছি বহু বছর। এখানেও বেঙ্গল টেনিস অ্যাকাডেমিতে খেলেছি। একটু অপেক্ষা করলাম। প্রায় হঠাৎ করেই এখানে এসেছি, এরকমভাবে অবশ্য সাজাতে হয়েছিল। আমাকে সেলিন গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে দেখেছে। আমাকে ওর বন্ধু হিসেবে জানে। এ সবের পিছনে আমার ভূমিকা নিয়ে কিছুই জানে না।

কিছুক্ষণ বাদে সেলিনের সঙ্গে খেলার সুযোগ এল। তারপরে যে কোনও খেলায় যা হয় আর কি, আগে কোনও বন্ধুত্ব না থাকলেও এক ঘণ্টা বাদে সে দূরত্ব চলে গেল।

খেলার পরে ওখানকার ওই ক্লাব লাগোয়া এক ক্যাফেতে ওর সঙ্গে বসলাম। জানতাম ও অন্য চাকরির সন্ধানে থাকবে। সে বিষয়ে কথা বলতে বলতে কিছু জিনিস জানলাম। তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আগে জানা ছিল না।

রোগীদের সম্বন্ধে এই ডিটেল্ড রিপোর্ট আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না! সেলিন সেটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারল না। ও নিজেও ওটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভালো করে জানত না। শুধু বলল ডেভিডের পক্ষে জানা সম্ভব হতে পারে। কারণ এরা প্রত্যেকেই ডেভিডের পেশেন্ট ছিল।

রোগীরা গ্যাব্রিয়েলের ক্লিনিকে আসত যেমন ডেভিডের পরামর্শ অনুযায়ী, ঠিক তেমনই ক্লিনিকের পরীক্ষার পরে তাদের আবার ডেভিডকে দেখানোটাই স্বাভাবিক। ঠিকই তো!

তাহলে কী ডেভিড এতে ইনভলভড? ডেভিডই কী কিছু করছে এসবের আড়ালে থেকে?

জিজ্ঞেস করলাম ওর কাছে ক্লিনিকের পরে সব পেশেন্টকে দেওয়া সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আছে কিনা! পুলিশ দেখলেও সব ক'টার কপি এখনও ওর ক্লিনিকেই আছে। ও বলল আমি দেখতে চাইলে ও দেখাতে পারে। যদিও তার জন্য পুলিশের পারমিশন লাগবে কারণ এসব রোগীর পারসোনাল রেকর্ড। ডেটা প্রাইভ্যাসির ব্যাপার আছে।

বলা বাহুল্য ফ্রেঞ্চ পুলিশের অলিভিয়ের কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে পারমিশন পেতে আমার অসুবিধে হয়নি। সে সূত্রে পুরো পেশেন্ট রেজিস্টারও দেখলাম যেখানে কে কবে এসেছে সে সব লেখা আছে। অলিভিয়ের কাছ থেকে ডিটেল্ড রিপোর্টের এনক্রিপ্টেড ফাউলটাও দেখার সুযোগ পেলাম।

এর পরে যেটা হয়েছিল, সেটাকে বলা যায় খুটিয়ে এই তথ্যগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা। আগে আমি নিজে দেখিনি। দেখতে গিয়ে একটা আকর্ষণীয় জিনিস চোখে পড়ল।

৩৩১ জন ওই ক্লিনিকের এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। তার মধ্যে গ্যাব্রিয়েলের ডিটেল্ড রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৮ জনকে নাৎসি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

তার মধ্যে ৮৭ জন এখনই অসুস্থ বা ইতিমধ্যে মৃত। একজনই বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। কে তিনি?

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার খবর পেতে অবশ্য মুশকিল হল না। সেই ভদ্রলোক হলেন হ্যাঁন্স মুলার। উনি এখনও দিব্বি সুস্থ আছেন। বাড়িতেই আছেন।

ভদ্রলোকের সম্বন্ধে খোঁজ শুরু করলাম। তার অতীত, বর্তমান সবকিছু নিয়ে। আর তখনই বুঝতে পারলাম যে এখনও সবকিছু শেষ হয়নি। তাহলে উনি হয়তো বেঁচে থাকতে পারতেন না।

পুলিশ এমনিতেও গ্যাব্রিয়েলের ফোন রেকর্ড সব ট্র্যাক করেছিল। এমনকী কোথায় কোথায় যেত, কারণ সঙ্গে দেখা হত, সেসব ডিটেলস। অবাক হলাম যে গ্যাব্রিয়েলের কল লিস্টে ডেভিড-এর নাম্বার পাওয়া গেল না। অর্থাৎ ওদের মধ্যে ফোনে কখনও কথা হত না। অন্য কোথাও রোজ দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। দুজনে কখনও দেখা করেনি নিজেদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে।

আরও চার দিন বাদে আমার ফেরার দিন। ওখান থেকে জেনেভা হয়ে স্পেনের মাদ্রিদ যেতে হবে। হাতে সময় খুব কম। কিন্তু একেই বলে ভাগ্য। যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেটা ঠিক ফেরার আগের দিনেই হল।

সেদিন ছিল বুধবার। ডেভিড এর চেম্বারে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটায়। খুব ব্যস্ত ডাক্তার। এসময় ভিড় একটু ফাঁকা হয়ে এসেছে। আমি রিসেপশনে গিয়ে আমার নাম জানালাম। বললাম

আমার তাড়াহুড়ো নেই। আমি অপেক্ষা করছি। যদিও জানতাম উনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নেবেন।

ঠিক তাই হল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক পড়ল। সোজা ওর চেম্বারে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি জানলার দিকে মুখ করে চেয়ার ঘুরিয়ে বসে আছেন।

আমি ঢুকতেই চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসতে বললেন। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন— এতদিনে আসার সময় পেলে? তা কী কফি চলবে?

আমি সম্মতি জানাতে উনি চেম্বার থেকে বেরিয়ে কাউকে কফির কথা বললেন। খানিকবাদে আবার ফিরে এলেন।

বলে উঠলাম—

আমি 'ডেভিড অ্যান্ড হল ড্রিম স্কেল'-এর কথা পড়েছিলাম যা দিয়ে কারও স্বপ্ন তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত, কতটা রিলেটেড তা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু আপনি যে সেই বিখ্যাত ডেভিড, সেটা জানতাম না। আপনিও যে স্বপ্ন নিয়ে এত রিসার্চ করেছেন জানতাম না।

উনি মৃদু হাসলেন। বলে উঠলেন— বাহ, তোমার সব বিষয়ে বেশ পড়াশোনা আছে তো! হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার কাজের উপরে ভিত্তি করে এটা করা হয়েছিল।

—আজ তো আপনার কাজ শেষ।

—না, না, কাজ আর শেষ কোথায়। এখনও আরও ছ'জন দেখা বাকি। বেরোতে বেরোতে সাতটা হয়ে যাবে।

—না, মানে অন্য কাজটার কথা বলছিলাম। আজ হ্যান্স — এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না!

চমকে উঠলেন ডেভিড। চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। মুখের উপরে যেন একটা কালো ছায়া এসে পরক্ষণে সরে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পাশে গ্লাসে রাখা জল খেলেন।

তারপরে হেসে বলে উঠলেন—তুমি সত্যি খুব ইন্টেলিজেন্ট অনিলিখা। তুমি কতটুকু জানো, বলো তো? কীভাবে বুঝলে?

—আপনার রিসার্চ পেপার, আগ্রহ সবকিছুই আমি স্টাডি করেছি। ওটাই আমার বড় ভুল ছিল। বুঝতে পারিনি যে এখানে শুধু একজন বিখ্যাত স্বপ্নের বিজ্ঞানী নেই। গ্যাব্রিয়েলের থেকেও এই বিষয়ে এগিয়ে থাকা এক বিজ্ঞানী আছেন যিনি স্বপ্ন-ঘুম এসব নিয়ে বহু বছর ধরে রিসার্চ করছেন। বিশেষ কিছু প্রোটিনের সাহায্যে 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট'কে প্রলম্বিত

করার আপনার লেখা একটা রিসার্চ পেপার আমার চোখে পড়ে। তারপরে খোঁজ নিয়ে বুঝি আপনিই গ্যাব্রিয়েলকে এখানে ডেকে নিয়েছিলেন। যদিও নিজেদের মধ্যে সবরকমভাবে দূরত্ব রাখতেন। ঠিক কিনা!

মিনিট দুয়েক চুপ করে রইলেন ডেভিড। যেন কী বলবেন নিজেও জানেন না।

আমি আবার বলে উঠলাম— চিরস্থায়ী স্বপ্নের আবিষ্কার আপনার হাতে হলেও একটা জায়গায় আপনার গ্যাব্রিয়েলকে দরকার ছিল। সেটা হল স্বপ্নের মাধ্যমে অতীতের অপরাধ খুঁজে বার করা, যার উপায় গ্যাব্রিয়েল আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু একটা কথা বলুন তো! আপনি এতদিন বুঝতে পারেননি যে এই আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই বহু বছর ধরে বসতি গড়েছে একদল নাৎসি যুদ্ধ অপরাধী, যারা তাদের পরিচয় গোপন করে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কীভাবে আপনার প্রথম সন্দেহ হল?

—একটা আর্ট কালেকশনে কিনতে গিয়ে। আমার ঠাকুরদা ছিলেন খুব বড় আর্ট কালেক্টার। তাঁকে ১৯৩৭ সালে বার্লিনের রাস্তায় গুলি করে মেরেছিল ওইসব পাগলের দল। তারপর ওঁর কালেকশনের সব ছবি চলে যায় হিটলারের ডানহাত গোরিং-এর কাছে। ওটা এখানে এক অকশনে দেখেছিলাম দেড় বছর আগে। সেই দুটো ছবি থেকেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়। এসেছিল একটাই পরিবারের থেকে যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এখানে এসেছিল। অন্যরা কেউ এটা বুঝতে পারত না। কিন্তু আমার কাছে ঠাকুরদার কালেকশনে কী কী ছবি ছিল সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য ছিল। এদুটো ছবি ছিল সালভাদোর ডালি-র প্রথম দিকে আঁকা দুটো ছবি। ওটা আমারও আগ্রহের বিষয়। গোরিং-এর বংশধর ছাড়া ওটা কারও কাছে থাকা সম্ভব ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে গোরিং-এর মেয়ে ও তার সঙ্গে আরও কিছু উগ্র নাৎসি সে সময় এখানে চলে এসেছিল। এরা প্রত্যেকে খুব সিরিয়াস কিছু ক্রাইম করেছিল সে সময়কার যুদ্ধবন্দিদের ও ইহুদিদের উপরে। কিন্তু এরা সারাজীবন কোনও শাস্তি না পেয়ে মহা আনন্দে বছরের পর বছর কাটিয়েছে।

—কিন্তু আপনি চাননি কোনও নিরপরাধ জার্মান শুধু সন্দেহের বশে মারা যাক। আপনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন, তাই তো? সে জন্য আপনার গ্যাব্রিয়েলকে প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ গ্যাব্রিয়েলের পক্ষে স্বপ্নের মাধ্যমে কারও অতীতের অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল। একই সঙ্গে আপনার পক্ষে অন্য কোনও উপায়ে এতজন ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোককে পরপর মারা সম্ভব ছিল না। একই সঙ্গে আপনার কোনও অপরাধ প্রমাণ করাও নেক্সট টু ইম্পসিবল।

ডেভিড হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে একটু থামতে বললেন। এক মহিলা ইতিমধ্যে চেম্বারের কাচের দরজা খুলে আমার কফি রেখে গেল।

সে মহিলা চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম।

তারপরে আমি কফিতে চুমুক দিয়ে বলে উঠলাম—আমার ধারণা অনুযায়ী ঠিক কীভাবে হয়েছিল, সেটা আমি বলি। আপনি আগেই একটা লিস্ট করেছিলেন। বয়স, কোথা থেকে কবে এসেছে, তার স্বভাব, কী ধরনের কাজে দক্ষতা, কীধরনের বিষয়ে ইন্টারেস্ট— এসব বিচার করে। আপনার সঙ্গে এখানকার সবার ভালো আলাপ। তাই এদের সবাইকে আপনার রেগুলার পেশেন্ট করে তোলা আপনার পক্ষে শক্ত হয়নি। দরকার ছিল নিশ্চিত হওয়ার। আপনি তাই গ্যাব্রিয়েলকে এখানে ডাকেন ক্লিনিক খুলতে।

আপনার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য এদেরকে গ্যাব্রিয়েলের কাছে রেকমেন্ড করা আপনার পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল। গ্যাব্রিয়েলের মাধ্যমে আপনি জেনে নিতেন এদের মধ্যে কে কে ইহুদি হত্যা বা বড় ধরনের কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আপনিই আবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তারা আপনার কাছে পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলে তাদের ওষুধের মধ্যে এমন কিছু ড্রাগ দিতেন যাতে এই অসুস্থতা শুরু হয়। আমার বিশ্বাস সেরকম কোনও ড্রাগ আপনি আবিষ্কার করেছেন। ঠিক কিনা!

—কিন্তু আমার সঙ্গে তো গ্যাব্রিয়েলের কথাও হত না, দেখাও হত না। আমি কীভাবে জানব ও সেই রোগীর স্বপ্নের মধ্যে ঠিক কী দেখতে পেয়েছে। সেটা তো আমার জানার কথা নয় কোনও ভাবে।— উনি মুচকি হেসে বলে উঠলেন।

আমিও হেসে উত্তর দিলাম— সেটা আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। এজন্যই পুলিশও আপনাকে ধরতে পারেনি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে একটা উপায় আছে। এরকম যদি হয় যে সেটা রোগীই আপনাকে জানাত! কিন্তু নিজের অজান্তে।

সেক্ষেত্রে দেখতে হবে কী থাকত ওদের দেওয়া রিপোর্টে! এমন কী আছে সে রিপোর্টে যা দেখে আপনি তাদের অতীতের অপরাধ বুঝতে পারছেন আর সেভাবে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কাউকে কাউকে বিশেষ কোনও ওষুধ দিচ্ছেন। সেজন্য রোগীদের দেওয়া সংক্ষিপ্ত রিপোর্টগুলো আমি এক এক করে দেখি। দেখি স্বপ্নে এমন কিছু কথা দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাকি রিপোর্টের সঙ্গে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। তার মধ্যে স্বপ্নে দেখা অপরাধের বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকত না। থাকত অন্য কিছু বর্ণনা ও এমন কিছু অবজেক্টের উল্লেখ যা নাকি তারা ঘুমের মধ্যে দেখেছে।

সেখানে এক এক জনের রিপোর্টে এক এক রকম বস্তুর কথা হালকা করে উল্লেখ করা আছে। কেউ স্বপ্নে বাড়ি দেখেছে, কেউ বেলুন, কেউ বা গ্লাস, কেউ ওয়াইনের বোতল, কেউ বৃত্ত, কেউ গোলক, কেউ ফুটবল, কেউ বা ডলারের ছবি, ত্রিভুজ বা কেউ স্কোয়ার দেখে। কেউ বা দেখেছে স্টপ সাইন।

মুখ আরক্ত হয়ে উঠল ডেভিডের।

বলে উঠলেন— হ্যাঁ, তাতে কী প্রমাণ হয়?

হেসে উঠে বললাম— কোনওটা দুই মাত্রার, কোনওটা তিনমাত্রার বস্তু। আর সেটা পড়েই আপনি বুঝে নিতেন সে রোগী অতীতে নাৎসি ছিল কি ছিল না! নাৎসি হলে সেক্ষেত্রে গ্যাব্রিয়েল দুমাত্রার বস্তুর কথা উল্লেখ করত স্বপ্নের ওই অংশে। বৃত্ত, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র বা স্টপ সাইন— এই জাতীয় কিছু। আপনারা বোধহয় ওর এখানে আসার আগেই এরকম কিছু প্রোটোকল ও সাংকেতিক ভাষা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিলেন। এটাও তার একটা অংশ।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডেভিড। তারপরে ফের বলে উঠলেন

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমাকে তুমি ছেড়ে দিলে কেন অনিলিখা? তুমি তো চাইলেই আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতে।

—আজ হ্যান্স এসেছিল। মনে হয় আপনি তাকে সে ড্রাগ দিয়েছেন, তাই তো?

—ও বুঝলাম। একেবারে প্রমাণসহ হাতেনাতে ধরা। তাই তো? ওই ড্রাগ এখন টেস্ট করলেই আমাকে ধরতে পারবে।

—হয়তো তাই করতাম। যদি না হ্যান্সের কথা জানতাম। হ্যান্স ছিল আপনাদের মেন টার্গেট। তাই তো?

থতমত খেয়ে গেলেন ডেভিড। বলে উঠলেন— কী করে বুঝলে?

—ওই একজনেরই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট অন্যরকম ছিল।

—মানে? কীরকম?

—একমাত্র ওর ক্ষেত্রেই বলা হয়েছিল যে ও স্বপ্নে দুটো স্কোয়ার বা দুটো বৃত্ত দেখে। অর্থাৎ ওর ক্ষেত্রে অপরাধ আরও গুরুতর।

—এক্সেলেন্ট। কিন্তু তুমি তবু আন্দাজ করতে পারবে না, সে কে? কোনওভাবে আন্দাজ করতে চাও।

—আসল নাম তো হ্যান্স নয়, তাই না? আসল নাম আমার মনে হয় জোসেফ মেঙ্গেল, যাকে সারা বিশ্ব খুঁজে বেরিয়েছে অপরাধী হিসেবে। কিন্তু লোকটা সবার চোখে ধুলো দিয়ে

পালিয়ে বেরিয়েছে।

ডেভিড অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে বলে উঠলেন —তুমি কী করে জানলে? এটা তো ইজরায়েলী ইন্টেলিজেন্স সংস্থা 'মোসসাদ' ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়।

—ওই যে দুটো স্কোয়ার বা দুটো বৃত্তের কথা লিখলাম, তার থেকেই। জোসেফ মেঙ্গেল জমজদের নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করত। বলতে গেলে জমজ সন্তান ছিল ওর পরীক্ষার আর অত্যাচারের একটা বড় অংশ। সে জন্যই হয়তো 'দুটো' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। কারণ সবাই জানে বহু বছর আগে মেঙ্গেল জলে ডুবে মারা গেছে। কিন্তু চেহারার বর্ণনা কিছুটা মিলে যাওয়ায় আর হ্যান্স— এখানেও দীর্ঘদিন সার্জারিতে যুক্ত থাকায় মনে হয়েছিল। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল মুখ দেখেও চেনা যায় না।

ডেভিডের চোখ চকচক করে উঠল— অসাধারণ অনিলিখা। কী করে যে আন্দাজ করলে! ঠিক বলেছ। মুখে ও প্লাস্টিক সার্জারি করে কিছু পরিবর্তন করেছে। আসলে ওকে ধরার জন্যই 'মোসসাদ' কথাটা ছড়িয়েছিল। যাতে ও নির্ভয়ে সামনে চলে আসে। কিন্তু তবু এত বছর ধরা পড়েনি। সত্যি এরকম বাজে লোক বিশ্বের ইতিহাসে কমই হয়। ক্যাম্পে কত ইহুদিকে যে মেরেছে কে জানে! সব বয়সের। কখনও বিষ ইঞ্জেক্ট করে, কখনও বা সার্জারির মাধ্যমে। ও নাৎসিদের উন্নত জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত। সেজন্য ইহুদিদের উপরে নানা ধরনের মেডিকাল এক্সপেরিমেন্ট করত। কত লোক যে তাতে মারা গেছে, কত বাচ্চা যে মারা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে লোকটাই ছিল আমার প্রাইম টার্গেট। কিন্তু সে লোকটাই আমার কাছে আসছিল না। যাক, আজ এসেছে। এখন আমার কাজ প্রায় শেষ।

একটু থেমে ডেভিড বলে উঠলেন—তোমাকে একটা ছবি দেখাই।

বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কালো ছবি বার করলেন। সাদা কালো ছবি। এক মহিলা একটা বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এক এস এস গারডের উদ্ধত বন্দুককে পিছন করে। নিজের প্রাণ দিয়ে বাচ্চাকে বাঁচানোর মরিয়া প্রয়াস। এটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আইকনিক ছবি। আগেও দেখেছি। নিজের বাচ্চাকে বাঁচাচ্ছেন তার জীবনের বিনিময়ে।

ডেভিডের চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় ফের বলে উঠলেন— আসলে অনিলিখা এ ছবি আমার বা আমার মার নয়। কিন্তু আবার আমারও। আমরা ছিলাম অত্যন্ত অভিজাত ইহুদি পরিবার। সেখান থেকে আমাদের স্থান হয় ট্রেব্লিঙ্কা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। একজন এস এস গার্ডকে বিয়ের দামি হিরের আংটি উপহার দিয়ে আমি যাতে পালিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা

করে মা। বাবা আগেই মারা গিয়েছিল গ্যাস চেম্বারে। মাকেও দেখিনি আর। পরে জেনেছিলাম ওই গ্যাস চেম্বারেই মাও মারা গিয়েছিল। ওই নরপিশাচদের হাতে। তার আগে নানান ধরনের শারীরিক অত্যাচারের ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিল মা।

এই ছবির মধ্যে তাই আমি আমার মাকে আজও দেখতে পাই। মনে হয় ওরাই সেই লোকগুলো যাদের হাতে সেদিন বন্দুক ছিল, যাদের হাতে আমাদের রক্ত লেগেছিল, তাদের শেষ না করলে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একটু থেমে ডেভিড বলে উঠলেন— আমার একটা অনুরোধ অনিলিখা। তুমি এখন এ বিষয়ে কিছু জানিও না। আমি তিন দিন বাদে ধরা দেব। কিন্তু ওই লোকটাকে শেষ করার পরে। ওকে তিনদিন বাদে সেই ওষুধটা দিয়েছি। এবিষয়ে কাউকে কিছু জানিও না এই ক'দিন। আমাকে এটুকু সময় দিতে পারবে অনিলিখা! আমি তোমার কাছে শুধু কিছুটা সময় ভিক্ষা করছি। তুমি আমার সম্বন্ধে রিসার্চ করেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমার কথার কী দাম। জীবনে কোনওদিন সামান্যতম অপরাধ করিনি। কিন্তু এত শুধু আমার বদলা নয়, এ আমাদের সবার।

তুমি ঠিকই ধরেছ আমি ওই আবিষ্কারটাই করতে পেরেছিলাম যার অন্য কোনও ভালো দিক ছিল না। ওই ড্রাগ শুধু নিদ্রা আর জাগরণের মধ্যের দূরত্বটা মুছে ফেলা। মরভান রোগকে ঠিক উলটে দিলে যা হয়। সেখানে মানুষ ঘুমোতে পারে না আর এক্ষেত্রে মানুষ জেগে উঠতে পারে না। সে স্বপ্নটাকেই এতটাই বাস্তব মনে করে যে সে সেই জগতের মধ্যে হারিয়ে যায় আস্তে আস্তে গভীর ঘুমের মধ্যে। কখনও বাস্তবে ফিরে আসে না।

আমি ফ্রুট ফ্লাই এর উপরে প্রথমে সফল হই, তারপরে আস্তে আস্তে দেখি মানুষের ক্ষেত্রেও একই ট্রিটমেন্ট সম্ভব বিশেষ কিছু প্রোটিনের সাহায্য নিয়ে।

একটু থেমে থাকলেন ডেভিড। বলে উঠলেন— আমি জানি তুমি হয়তো আমার অনুরোধ রাখবে না। কারণ সেটা তোমার দিক থেকে অনৈতিক, অপরাধ।

আমি বলে উঠলাম— ডেভিড, আমার যদি আপনাকে ধরানোর কোনওরকম ইচ্ছে থাকত, তাহলে কী আমি এতদিন অপেক্ষা করতাম। আমি কাল ফিরে যাচ্ছি। গ্যাব্রিয়েলের বিরুদ্ধেও কোনও প্রমাণ নেই। আশা করি ও খুব তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাবে। তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে আপনি সেই যে বলেছিলেন না সেই মিলিয়ন বছর পুরনো ব্যাকটিরিয়া, সেটা তো থাকতেই পারে এ সবের পিছনে। কী তাই না!

ডেভিডের চোখ ছলছল করে উঠল।

আমার হাতের উপরে ওঁর হাত রেখে বলে উঠলেন— গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। গড ব্লেস ইউ। তুমি আমাকে আমার শেষ কিছু ইচ্ছা পূর্ণ করার সময় দিয়েছ।

ফের বলে উঠলেন— আচ্ছা। তুমি তো এত বুদ্ধিমতী। তা তুমি এত কিছু জানার পরেও কীভাবে আমার চেম্বারে ঢুকে কফি খেলে বল তো? যদি ওর মধ্যেও ওই ক্যাপসুল থাকত?

আমি হেসে বলে উঠলাম—ডেভিড, আপনি যাতে একজন নিরীহ মানুষও যাতে না মারা যায়, তার জন্য এত কিছু করেছেন। আপনার সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছেন হার্ড এভিডেন্সের। আমি জানতাম আপনি আমারও কোনও ক্ষতি করবেন না। আপনি সেরকম মানুষ নন।

পরের দিন এয়ারপোর্টে আমাকে ছাড়তে এসেছিলেন ডেভিড। হ্যাঁন্সের মৃত্যুর খবরটা মাদ্রিদে গিয়ে পেয়েছিলাম। একইরকম ভাবে মৃত্যু। তবে তখনও কেউ জানতে পারেনি যে এই হ্যাঁন্সি ছিল কুখ্যাত ওয়ার ক্রিমিন্যাল অপরাধী জোসেফ মেঙ্গেল।

বলে অনিলিখাদি একটু থেমে বলে উঠল—গত পরশু একটা ইমেইল পেয়েছিলাম ডেভিডের সলিসিটারের কাছ থেকে। ডেভিড এক সপ্তাহ আগে মারা গেছেন। আমাকে দিয়ে গেছেন গোরিং-এর বংশধরের কাছ থেকে উদ্ধার করা সালভাদোর ডালির বিখ্যাত দুটো পেন্টিং, যার দাম বেশ কয়েক কোটি ডলার।

—মানে? তুমি এখন কোটিপতি। ছবিটা পাবে কীভাবে?— বিশ্বজিৎদা লাফিয়ে উঠল।

—ধুর! অত মূল্যবান একটা জিনিস কী আর আমি নিজের কাছে রাখব। ওটা ঠিক করেছি ল্যুভর মিউজিয়ামকে দিয়ে দেব। আমার টাকা দিয়ে আর কী হবে! এরকম ছবি নিজের কাছে রাখলে কারও দেখার সুযোগ হবে না।

ও একটা জিনিস বলা হয়নি। আমি একটা ভুল করেছিলাম। হ্যাঁন্সের মৃত্যুর পরেও ডেভিডের কাজ শেষ হয়নি। সেজন্য উনি 'প্রায়' কথাটা বলেছিলেন।

—মানে?

ফিরে আসার দু-সপ্তাহ বাদে খবর পেয়েছিলাম মাইক্রোবায়োলজির বিখ্যাত প্রফেসার রজার শিন্স-এর মৃত্যু হয়েছে ঠিক একইভাবে। উনিও একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্যামোনিতে আসার পর। স্যামোনিতে উনি এক বিশেষ প্রজাতির মাইক্রোব এর উপরে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। হয়তো ওই মাইক্রোব থেকেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছিল সংবাদপত্র। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সব মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল সেই ব্যাকটিরিয়া। সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া সেসব ব্যাকটিরিয়া তাই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

—মানে, এটা তো বুঝলাম না, কী করে হল!—প্রতীক বলে উঠল।

অনিলিখাদি বলে উঠল— খবরটা পেয়ে তখনই বুঝতে পারলাম যে ডেভিড শুধু শুধু ওই অন্য গল্পটাকে নিয়ে আসেনি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল আরেক নাৎসি 'রজার শিন্স'কে স্যামোনিতে নিয়ে আসা ও একই ভাবে মারার।

রজার শিন্স-এর একটা পরিচয় তার মৃত্যুর একবছর বাদে সামনে আসে। রজার শিন্স ছিল ওই কুখ্যাত ডাক্তার জোসেফ মেঙ্গেল-এর সহকারী। আসল নাম ছিল অবশ্য অন্য।

এতক্ষণে অনিলিখাদি থামল। উঠে গিয়ে কাচের জাগ থেকে খানিকটা জল গ্লাসে ঢেলে বলে উঠল—উফ, তোদের এসব বলতে গিয়ে এতক্ষণ বকবক করে আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

আমরা হতবাক হয়ে বসেছিলাম।

বিশ্বজিৎদা এতক্ষণে মুখ খুলল। বলে উঠল—সবই তো বুঝলাম। গল্পটাও ভালো। কিন্তু গল্পের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোনও এভিডেন্স আছে। যেমন ধরো, ওই দুটো ছবি। সেটা না হয় এখনও হাতে পাওনি বুঝলাম। কিন্তু ওই ক্যাপসুল। সেই ক্যাপসুল অন্তত একটা চেয়ে আনতে পারতে ডেভিডের কাছ থেকে উপহার হিসেবে। প্রমাণ হিসেবে।

অনিলিখাদিকে চুপ করে থাকতে দেখে বিশ্বজিৎদা বেশ একটা তৃপ্তির হাসি হাসল।

আমাদের মধ্যে এখন তন্ময় আজকাল বিশ্বজিৎদার সাপোর্টার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিশ্বজিৎদা একটা টি ২০ ম্যাচ দেখাতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে।

তন্ময়ও বেশ উৎসাহের চোটে বিশ্বজিৎদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল— ঠিকই তো। তোমার অন্তত সেরকম একটা স্পেশাল ক্যাপসুল নিয়ে আসা উচিত ছিল। সেটা দেখালেই সব বিশ্বাস করতাম।— ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে উঠল তন্ময়।

অনিলিখাদি সেসব কথায় কোনও পাত্তা না দিয়ে ব্যাগ খুলে ছোট একটা দেড় ইঞ্চি ব্যাসের গোল কাঠের বাক্স বার করল। এরকম বাক্স আগে কখনও দেখিনি। তারপর সেটা খুলে ধরল। আমরা স্পষ্ট দেখলাম তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে একটা লাল ক্যাপসুল।

তার পরক্ষণেই যেটা হল, সেটা আমরা কেউ প্রত্যাশা করিনি। অনিলিখাদি ক্যাপসুলটা বাক্স থেকে সযত্নে তুলে নিয়ে মুখে ফেলে জল দিয়ে গিলে নিল।

বিশ্বজিৎদা লাফিয়ে উঠল— ও মাই গড অনিলিখা। এ কী করলে!

তন্ময় চিৎকার করে বলে উঠল— ও শিট।

সহেলী 'অনিলিখাদি' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতীক 'সর্বনাশ' বলে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে টেবিলের উপরে রাখা জলের জাগটা উলটে ফেলল।

অনিলিখাদি দেখি শান্তভাবে গ্লাসটা টেবিলের উপরে নামিয়ে জলের জাগটা ঠিকভাবে তুলে রেখে হেসে বলে উঠল — তোরা পারিসও বটে। মাথা ধরেছিল। তাই একটা প্যারাসিটামল খেলাম।

মিস্টার পাই ও শিক্ষামন্ত্রী ঘনশ্যামবাবু

১৫ সেপ্টেম্বর

কিছুদিন আগে থেকে ঠিক করেছি নিয়মিত ডায়েরি লিখব। বিশেষ করে দরকারি কথাগুলো লিখে রাখব। গত তিরিশ বছর ধরে যে অজস্র আবিষ্কার করে চলেছি, তা লিখে না রাখলে আমি নিজেই ভুলে যাব। একই সঙ্গে আমার ফাউন্টেন পেনগুলোরও সামান্য সদব্যবহার হবে।

কিছুদিন আগে অনিলিখাই আমার ফাউন্টেন পেনের সংগ্রহ দেখে প্রথম আমাকে এ আইডিয়াটা দিল। আমি তো আর সাহিত্যিক নই, যে ইচ্ছেমতো সাদা কাগজে একটা গল্প বা উপন্যাস লিখে ফেলব। মাঝেমধ্যে অবশ্য বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখি, কখনও বাংলা কিশোর সাহিত্য নিয়ে, কখনও বা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে। সারা ভারত ঘুরে দেখা দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে এখন লিখছি। একই সঙ্গে গত কিছুদিন ধরে ডায়েরি লিখে দেখেছি, বেশ ভালো লাগছে। কালি, কলমের সঙ্গে মনের যোগাযোগ হয়তো অনেক গভীরে। লেখা অনেক বেশি অকপট হয়, নিজেকেও ভাবায়।

এ ছাড়া অবশ্য আরেকটা কারণও আছে। তা হল লিও। লিও হল আমার তৈরি কৃত্রিমবুদ্ধি সম্পন্ন রোবট। ও যে রোবট তা দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। এমনকী ওর গায়ে হাত দিলেও বোঝা যাবে না যে ও মানুষ নয়। তোমরা নিশ্চয়ই 'লিও এর অদ্ভুত জগতে' লিওর কথা আগেই শুনেছ। তা লিওকে আমি অনেক কিছু শেখালেও শুধু আমার হাতে লেখা বাংলা নোটস পড়তে শেখাই নি। এর পিছনে আমার হাতের লেখার মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে। সেটা আমি ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু তো ক্লাস সিক্স ফেল ছাত্রের হাতের লেখা বলে মন্তব্য করতেও ছাড়েননি।

যতই হোক, দিনের শেষে লিও একটা রোবটই। কিছু জিনিস থাকা ভালো যা রোবটের আয়ত্তের বাইরে চিরকাল থাকবে, যেমন আমার বিদঘুটে অপাঠ্য হাতের লেখা। আমি অবশ্য ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তবুও।

তবে এই ডায়েরি লেখার ব্যাপারে আমাকে আরও নিয়মিত হবে। এখনও সে অভ্যেসটা গড়ে ওঠেনি।

পাঁচসপ্তাহ আগে আমার বন্ধু প্রফেসার ফিলিপো পাচিনি একটা গুরুতর সমস্যার ব্যাপারে আমাকে ফ্রান্স থেকে ফোন করেছিল।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য জলের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রে কোরাল রীফ বা প্রবাল প্রাচীর সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রবাল প্রাচীর সমুদ্রের জলের তলায় কখনও অগভীর জলে, কখনও বা গভীর জলে গড়ে ওঠে। খুব বড় ঢেউ, বন্যা বা বড় ঝড়ের হাত থেকে উপকূলকে রক্ষা করতে ঢালের মতো কাজ করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর জন্য এই প্রবাল প্রাচীর শুধু খাদ্যের সন্ধানই নয়, বাসস্থানও।

এখন সামুদ্রিক ঝড়, প্লাবনের সম্ভাবনা যেমন একদিকে বাড়ছে আর অন্যদিকে কোরাল রীফ উধাও হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আগামী দিনে উপকূলবর্তী এলাকায় মানুষের পক্ষে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। সমস্যাটা বিশ্বজুড়েই সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করছে। এই ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল প্রফেসার ফিলিপো পাচিনি। আমি একটু সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করব এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

আমি এধরনের সমস্যা এলে ‘Gedanken experimente–’ বা 'থট এক্সপেরিমেন্ট' এ বিশ্বাস করি। ঠিক যেমন আইনস্টাইনও করতেন। বেশিরভাগ বড় আবিষ্কারের পিছনে থাকে গভীর পরীক্ষামূলক চিন্তাভাবনা বা 'থট এক্সপেরিমেন্ট'। আমার ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ আবিষ্কারে সেটাই সাহায্য করে। এর দুটো উদাহরণ দিই।

কী হবে যদি পৃথিবীর আকাশে একটার জায়গায় তিনটে চাঁদ থাকে বা যদি একটা সাইকেলের বেগ আলোর বেগের থেকেও বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা সেই সাইকেলকে কীভাবে দেখব।

এটা তো আর ল্যাবে বসে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যায় না। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে সেই বিষয়ের অনেক গভীরে গেলে একটা ধারণা করা যায়। সেটাই হল 'থট এক্সপেরিমেন্ট'।

এসব ক্ষেত্রে আগে ভাবতে হয়। ল্যাবের কাজ অনেক পরে। সেভাবেই এই আইডিয়াটা প্রথমে মাথায় এল। যদি এরকম কিছু করতে হয়, তাহলে সেটা যেন সহজে তৈরি করা যায়, সেটা ভাবতে হবে। সমুদ্রের জলের নীচেতো আর কংক্রিটের প্রাচীর গড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সমুদ্রের জলে যদি দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে সমুদ্রের জল থেকে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড আলাদা হয়ে চুনাপাথর তৈরি করবে, যা অনেকটাই সাধারণ কোরাল রীফের মতো হবে। এভাবে আমরা নিজেরাই কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরি করে নিতে পারব যা আমাদের ঝড়জল, বন্যা— এসব থেকে রক্ষা করবে।

কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে ল্যাবের অ্যাকোয়ারিয়ামে সমুদ্রের জল এনে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। আমার ধারণা একদম ঠিক। দু

দিন বাদে সামান্য চুনাপাথর-এর কণা পেলাম। কিন্তু এত আস্তে হলে চলবে না। এভাবে প্রবাল প্রাচীর তৈরি করতে হলে কয়েকশো বছর লেগে যাবে। অনেক তাড়াতাড়ি করতে হবে।

এখানেই আমার আসল পরীক্ষা শুরু হল। আমি সব সময় মনে করি একটা সফল ইকোসিস্টেমে যারা থাকে, তারা প্রত্যেকেই সে ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সাহায্য করে। যদিও বিজ্ঞান এখনও জানে না যে এই কোরাল রীফের পিছনে বিভিন্ন প্রাণীজগৎ বা মাইক্রোব-এর অবদান কী, কিন্তু আমার ধারণা নিশ্চয়ই কিছু আছে। বিশেষ কিছু মাইক্রোব-এর সাহায্য নিয়ে যদি এই প্রসেসটাকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে প্রবাল প্রাচীর তৈরি করা যাবে।

সেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলাম। আজ সকালে সে পরীক্ষায় প্রথম বিশেষ সাফল্য পেলাম। সেই বিশেষ মাইক্রোবসগুলোর মধ্যে কিছু অজানা মাইক্রোব আছে। সেগুলোর সহজ নাম দিলাম রাম, শ্যাম,যদু, মধু-এরকম। জটিল বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে ওদের দুর্বোধ্য করে রাখার কোনও মানে নেই। আমার আবিষ্কার করা সবকিছুরই আমি তাই সহ্য নাম দিই।

গণেশ আর লিও দুজনে এসব এক্সপেরিমেন্টের সময় আমার সঙ্গেই থাকে। আজও ছিল। তবে কিছু সময় ইচ্ছে করে লিওকে সঙ্গে রাখিনি।

এখন একটা ফোন করব ফিলিপো পাচিনি-কে। ওকে জানাতে হবে এই পদ্ধতির ব্যাপারে। আমার ধারণা এটা নিয়ে বড়ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার। সেক্ষেত্রে খুব সহজেই আমরা হাইব্রিড প্রবাল প্রাচীর তৈরি করতে পারব। এভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমি মনে করি আমরা এখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এড়াতে গেলে আমাদের সবার একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হবে। নিজের স্বার্থের কথা শুধু ভাবলে চলবে না।

এমনিতেও আমার নোবেল পুরস্কারের মতো পুরস্কারে কোনও লোভ নেই। প্রত্যেকটা আবিষ্কার করার পরে যে আনন্দ পাই, সেটাই সেরা পুরস্কার। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণের থেকে বড় পুরস্কার কীই বা আছে!

১৭ সেপ্টেম্বর

ইতিমধ্যে আমার পরীক্ষা আরও সাফল্য পেয়েছে। অবাক হয়েছি দেখে যে আমার আবিষ্কৃত দুই মাইক্রোব 'যদু' আর 'মধু'-কে জলে তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে আমার তৈরি ওই প্রবাল প্রাচীরে নিয়ে আসতে পারলে কী তাড়াতাড়ি সেই কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যে জিনিস এমনিতে করতে এক বছর লাগত, সেটাই ওরা করে ফেলছে চুনাপাথরের উপরে কয়েক মিনিটের মধ্যে। আর সেই হাইব্রিড প্রবাল প্রাচীর বেশ শক্তপোক্ত। ঢেউতে তেমন ক্ষতি করতে পারবে না।

তবে সেটা কতটা শক্ত ঠিকভাবে বোঝার জন্য আমার আরও অনেক বড় জায়গা লাগবে, যেখানে সমুদ্রের মতো কৃত্রিম ঢেউ তৈরি করা সম্ভব।

ফিলিপো পাচিনি কতটা খুশি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী মহলে এই আবিষ্কারের পিছনে আমার অবদানের কথা জানিয়েছে। আমাকে ফ্রান্সে যেতে অনুরোধ করেছে। যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার সব খরচ ওই দেবে। ও চায় এই আবিষ্কারের সঙ্গে আমার নামটাও যেন জুড়ে থাকে। পাচিনি লোকটা ভালো। সবাই এরকম চায় না। এমন নাছোড়বান্দা যে শেষে আমি আমার নাম রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছি।

ওর কাজ অবশ্য এখনও অনেক বাকি। বড় স্কেলে এই পরীক্ষা করা দরকার। তার জন্য বেশ কিছু জায়গা জুড়ে সমুদ্রে এই এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। দেখতে হবে এর অন্য কোনও সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা। হয়তো দেখা গেল যে কোনও ধরনের মাছ এ জন্য উপকূলবর্তী এলাকা থেকে উধাও হয়ে গেল। এরকম আরও অনেক কিছুই হতে পারে।

এ ব্যাপারে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল।

আগামীকাল আমাকে এখানে কল্যাণগড়ে কী একটা সরকারি পুরস্কার দেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আসবেন এখানে। তিনি নাকি নিজের হাতে আমাকে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। কিছুদিন আগে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এ ব্যাপারে বলতে এসেছিলেন। ওর আজকাল পার্টির লোকজনদের সঙ্গে ওঠাবসা। এতে নাকি ওর আজকাল কাজের ব্যাপারে অনেক সুবিধে হয়। এখানকার পার্টির লোককে সুপারিশ করেছেন আমার পুরস্কারের ব্যাপারে। আমার দেওয়া পাকা চুল তোলার মেশিনটা ওর খুব নাকি পছন্দ হয়েছে। সে সুপারিশ কাজ করেছে। আমি নাকি সে পুরস্কার পেতে চলেছি। বেশ দর্পের সঙ্গেই এসে বললেন কথাটা।

—বুঝলেন পাই, এসব আবোলতাবোল ছেলেভোলানো আবিষ্কারের মধ্যে একটাই কাজের কাজ করেছেন। আমার পাকা চুল তোলার মেশিনটা। কী দারুণ। মাথায় বসালে টুকটুক করে ঘুরে বেড়ায়, আর ঠিক দেখে শুনে আমার পাকা চুল তুলে দেয়। ভারী আরাম। এই একটা আবিষ্কার আপনার ভাগ্য বদলে দিতে চলেছে। শিক্ষামন্ত্রী ঘনশ্যামবাবুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। উনি নিজে হাতে আপনাকে এ পুরস্কার দেবে। পুরোটাই আমার সুপারিশে।

আমি শুনে বেজায় ক্ষেপে গিয়েছিলাম। এসব মন্ত্রী, দলীয় নেতাদের হাত থেকে এভাবে পুরস্কার নিতে আমার একদমই ভালো লাগে না। তার উপরে সুপারিশ! এসব শুনলে মনে হয় বিজ্ঞানকে যেন অপমান করছি। সরাসরি 'না' বলে দিলাম। আমি কোনওভাবে এ পুরস্কার নেব না।

ভাবলাম উনি সেটা মেনে নিয়েছেন। তখনকার মতো চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দু দিন বাদে আবার কানারনেনকে নিয়ে এলেন। বোমা তৈরি সময় ফেটে রনেনের এক চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল।

সে লোকটাকে দেখে আমার এমন গা রী রী করছিল যে কী আর বলব। লোকটার নানান ধরনের কুখ্যাতি আছে। আবার 'না' বলে দিলাম। কিন্তু তারপরে লোকটা আবার আরেকদিন এল। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার নাম ওরা উপরমহলে বলে দিয়েছে ও পুরস্কার সেজন্য মঞ্জুর হয়ে গেছে। এখন না গেলে মন্ত্রীর অপমান হবে। ওরা বেশ অসুবিধেতে পড়বে।

শেষে গণেশই আমাকে বোঝালো। গণেশ মানে আমার সহকারী গণেশ। বাড়ির বাইরের সব কাজ ও দেখে। ওকে নাকি মাছওয়ালাও এ ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছে। ভালো পারশে, চিংড়ি আর ইলিশ এলে, কোনওটাই আর দেবে না বলেছে। যাই হোক, ওর আর চিংড়ির কথা ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম এ পুরস্কার নেওয়ার। ধরেই নিয়েছি এর জন্য কয়েক ঘণ্টা নষ্ট হবে।

আগামীকাল সে পুরস্কার নিতে যেতে হবে খানিকক্ষণ। ভেবেছি লিওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার একবার দেখার ইচ্ছে ছিল লিও সবার সঙ্গে কীভাবে মেশে। কয়েকমাস হল ওকে তৈরি করেছি। কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন লিওকে দেখে কেউ বলবে না যে ও রোবট।

তবে দেখার ব্যাপারটা ওর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ও বুদ্ধিমত্তায় অনেক মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এখন ওর উপরে আমি নতুন কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছি। সেটা হল একবার দেখে, সামান্য কথা বলে মানুষকে চেনার ক্ষমতা। এটা শুনতে খুব সহজ মনে হলেও একজন কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন রোবট-এর পক্ষে এটা সহজ কাজ নয়।

হাবেভাবে, চলাফেরায়, চেহারায়, কথাবার্তার মাধ্যমে একজন মানুষ কেমন, তা সহজে বোঝা যায়। সেই জাজমেন্ট বা বিচারবোধ একটা রোবটকে দেওয়া যায় কিনা সেটাই দেখছিলাম পরীক্ষানিরীক্ষা করে। এর জন্য ওকে অবশ্য অনেক দাগী অপরাধী থেকে শিক্ষিত মানুষ তাদের সবার ছবি, তাদের সম্পর্কে নানান তথ্য, নানান সিনেমা, ভিডিও ইত্যাদি দেখিয়েছি। বাকিটা অবশ্যই ওর মেশিন লার্নিং, অর্থাৎ সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে ক্রমাগত শেখার ক্ষমতা। তবে এর জন্য আরও বেশি করে ওর বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা দরকার। সে সুযোগ পাইনি। ঠিক করেছি ওকেও তাই নিয়ে যাব কালকের অনুষ্ঠানে। একটা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর

গতকাল নানান কাণ্ড যা হল, তারপর রাতে আর লেখার ইচ্ছে হয়নি।

গতকাল সেই মন্ত্রীর সভায় আমি ঠিক সময় মতোই গিয়েছিলাম। সঙ্গে লিও ছিল। যথারীতি ওকে কেউ রোবট বলে বুঝতে পারেনি। আমার আপ্তসহায়ক বলার পরে কোনও প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়নি।

আমি এসব মন্ত্রী—টন্ত্রীর খবর বিশেষ রাখি না। তার মানে এই নয় যে রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু এদের মধ্যে সুযোগ সন্ধানী, অপরাধীদের সংখ্যা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে এদের সঙ্গে কথা বললেও নিজের অপরাধবোধ বেড়ে যায়। তাই বক্তৃতার সময় প্রথম সারিতে বসে একটা বাংলা গল্পের বই পড়ছিলাম।

যাই হোক এই মন্ত্রী যে বেশ জাঁদরেল ও জনপ্রিয় সেটা মাঝেমধ্যে দীর্ঘ হাততালির বহর দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম। এখানে আগে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বিমান-এর জন্য একটা হ্যাঙ্গার ছিল। সেই জায়গায় আর পাশের বুনো আমতলার পুরো মাঠ ভরে গিয়েছিল। বক্তৃতার শেষে আমার ডাক পড়ল পুরস্কার নেওয়ার জন্য।

আমার কী কী আবিষ্কার, সেসব ওরা আগেই জানতে চেয়েছিল। গণেশ আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের লিস্ট একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল। মন্ত্রীমশাই দেখি সেই লিস্টটা একবার দেখে, ছিঁড়ে পকেটে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন— ধুর, ওসব আমার লাগে না। আমি সব জানি।

বলে দৃপ্তভঙ্গিতে মাইকের সামনে গিয়ে বলতে শুরু করলেন—কল্যাণগড়ের গর্ব, আমাদের বাংলার গর্ব, কল্যাণগড়ের সুসন্তান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার পাই, আজ এখানে আছেন। ওঁর অজস্র আবিষ্কারের কথা তো আপনারা জানেনই। এসব আবিষ্কার কোনওটাই আমাদের সরকারের সাহায্য ছাড়া হত না। আমাদের কাছ থেকে আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রেরণা না পেলে উনি রাস্তায় রাস্তায় ভিখারির মতো ঘুরে বেড়াতেন। আজ সে সব আবিষ্কার ভারত পেরিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে চলেছে। পেনিসিলিন, মাইক্রস্কোপ, স্টেথোস্কোপ, আয়নোস্কোপ বলে মন্ত্রীমশাই যে কী কী বলতে শুরু করলেন যে আমি একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝতে পাচ্ছিলাম এই সমাজে শিক্ষাটাই অপরাধ। যাদের শিক্ষা থাকে না, তাদের লজ্জাই থাকে না।

কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম ওঁর উচ্চারিত প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা হাততালি দিয়ে উঠছিল। উনি উৎসাহিত হয়ে আরেকটা জিনিস এর নাম বলে উঠছিলেন। শেষে টর্চ, ব্যাটারি হয়ে উনি ম্যালেরিয়া, পোলিও—এসবের আবিষ্কারকর্তা হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করতে শুরু করলেন। তাতেও দেখি হাততালি আর থামে না।

যাই হোক সে কথার ঝড় এক সময় থামল। উনি আমাকে পুরস্কৃত করার পরে ফিসফিস করে আমাকে বলে উঠলেন—দেখলেন কীরকম আপনাকে আমি ফেমাস করে দিলাম। আজ থেকে আপনি হলেন একজন হীরো।

স্টেজের থেকে নেমে আমার পাশে 'লিও' কে দেখে ওঁর কী মনে হল কে জানে! বলে উঠলেন—বাহ, এর তো বেশ ভালো পেটানো চেহারা। আমার দলে যোগ দিতে বলুন। কী নাম তোমার!

বলে পাশে দাঁড়ানো স্থানীয় নেতা হাতকাটা বাবলুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন— কী ব্যাপার বাবলু, এসব ভালো ভালো ছেলেদের খবর রাখছ না।

ইতিমধ্যে লিও নিজের নাম বলেছে। কিন্তু মন্ত্রীর বাড়িয়ে দেওয়া হাত করমর্দন না করে, তারপরে যা বলে উঠল তার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। সেটা অবশ্য ও আমাকেই জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা মন্ত্রীমশাই-এর কান এড়ায়নি।

—লোকটা নির্লজ্জ, মিথ্যুক, চরিত্রহীন, অপদার্থ, কিছুই জানে না, কিন্তু সবজান্তা ভাব। অতীতে অনেক অপরাধ করেছে। খুন করে থাকলেও অবাক হব না। একানব্বই শতাংশ সম্ভাবনা।

মন্ত্রী ঘনশ্যামবাবুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মুহূর্তে দেখলাম ওঁর চোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। লিও-র দিকে এক পা এগিয়ে বলে উঠলেন— কী, কী বললে!

বলেই লিওর গালে সপাটে চড়। শুধু একটা নয়, একের পর এক। দেখলাম লিও বেশ হাসি মুখে মন্ত্রীর চড় থাপ্পড় সহ্য করল। কিন্তু কোনওরকম ক্ষমা চাইল না। মন্ত্রীর সঙ্গে দুটো গুন্ডা মতো লোক ছিল, তারাও লিওকে চড়-থাপ্পড়-লাথি মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল। আমি কোনওরকমে লিওকে আগলাতে গিয়ে নিজেও একটু মার খেলাম। ভাগ্য ভালো লিও উলটে ওদের মারেনি। সেক্ষেত্রে যে কী হত!

ফেরার পথে অবিনাশবাবু বললেন— আপনার জন্য আজ আমার মানসম্মান সব জলাঞ্জলি দিতে হল। এখন সামনের জলা জায়গা পুকুর বুজিয়ে বাড়ির যে এক্সটেনশন করব ভাবছিলাম, তা আর হল না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। ফের বলে উঠলেন—

—বলেছি না, এসব রোবট চাকর রাখবেন না। তাকে আবার আদিখ্যেতা করে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখন বুঝুন। আর ক'দিন এখানে থাকতে পারবেন দেখুন।

আমি আর উত্তর দিইনি। একটাই সান্ত্বনা লিও তাহলে মানুষ চিনতে শিখেছে। আমার পরীক্ষা ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। একই সঙ্গে যে সংযম লিও দেখিয়েছে, তা অসাধারণ।

এটা হল প্রথম খারাপ খবর। দ্বিতীয় খারাপ খবরটা পেলাম বাড়ি ফিরে গণেশের কাছ থেকে। ল্যাবে তৈরি হওয়া কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর কৃত্রিমভাবে তৈরি করা জলস্রোতে ভেঙে গেছে। যতটা শক্ত ভেবেছিলাম, ততটা নয় তাহলে? দেখতে হবে কীভাবে এই প্রাচীর আরও মজবুত করা যায়।

গণেশের সঙ্গে এই ব্যাপারে যখন আলোচনা করছিলাম, দেখলাম লিও আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আজকের এই ঘটনা ও কীভাবে নিয়েছে কে জানে!

২৬ সেপ্টেম্বর

একদিনে যা হল, তা কীভাবে লিখব জানি না। কতটা লেখা ঠিক, তাও জানি না। তবে একটাই ভরসা একজন ছাড়া অন্য কেউ আমার হাতের লেখা পড়তে পারে না।

একটু গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করি।

আমার পুরস্কার পাওয়ার ঘটনার তিনদিন পরে মন্ত্রীর বারাসাতের বাড়িতে ডাকাত পড়ে। সে ডাকাত সিকিউরিটি গার্ডদের মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে মন্ত্রীকে কিডন্যাপ করে। তার পর থেকে মন্ত্রী ঘনশ্যামবাবু উধাও। কোথাও কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যপুলিশ সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে সি আই ডিও কোমর বেঁধে তদন্তে নেমে পড়েছে। তবে কোনও কিছুর কুল কিনারা করতে পারেনি। কেউ বলছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কেউ বলছে বিরোধী দল এর জন্য দায়ী।

ডাকাতির ঘটনার দুদিন পরে মন্ত্রী ঘনশ্যামবাবুর জিম থেকে একটা পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়, যে মূর্তি বাড়ির লোক আগে কখনও দেখেনি। ঠিক মাদাম তুসোর মোমের মূর্তির মতোই 'মন্ত্রী'র অবিকল পাথরের মূর্তি। এত ভালো পাথরের মূর্তি কে কবে তৈরি করল তা বাড়ির এলাকেরা বলতে পারছে না। কাগজে খবরটা ছোট করে বেরিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ওই মূর্তির শিল্পী ঘনশ্যামবাবুর হদিশ জানে কিনা। কিন্তু সেরকম কোনও তথ্য এখনও সামনে আসেনি।

খবরটা শুনে আমি বুঝেছি কী হয়েছে। একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে ওই পাথর খুব সাধারণ পাথর নয়। ওই পাথর ঠিক দেখা যায় কোরাল রীফে। বা আমার তৈরি করা নকল কোরাল রীফে।

আমার ডায়েরির পাতায় যেখানে ওই কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর সম্বন্ধে সব ডিটেলস লিখে রেখেছিলাম, সেখানে দেখেছি ঠিক আমার হাতের লেখায় আরও দু লাইনকে যেন লিখে রেখেছে। আমার প্রসেস ও উল্লেখিত মাইক্রোবদের সঙ্গে আরেক পরিচিত মাইক্রোবের নাম যা কিনা ওই প্রবাল প্রাচীরকে মজবুত করে।

লিও তার মানে শুধু আমার হাতে লেখা পড়তে নয়, নকল করতেও শিখে গেছে। বাকিটা আর ডায়েরিতে লেখা ঠিক হবে না।

আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার। মন্ত্রী ঘনশ্যামবাবুকে আর কোনও দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবে এর বাইরেও একটা ঘটনা ঘটেছে। লিও দেখেছি আমার পাওয়া 'বাংলার আইনস্টাইন' নামক পুরস্কারটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। সেটা অবশ্য ও না করলে আমিই করতাম।

সব শেষের পরে

১

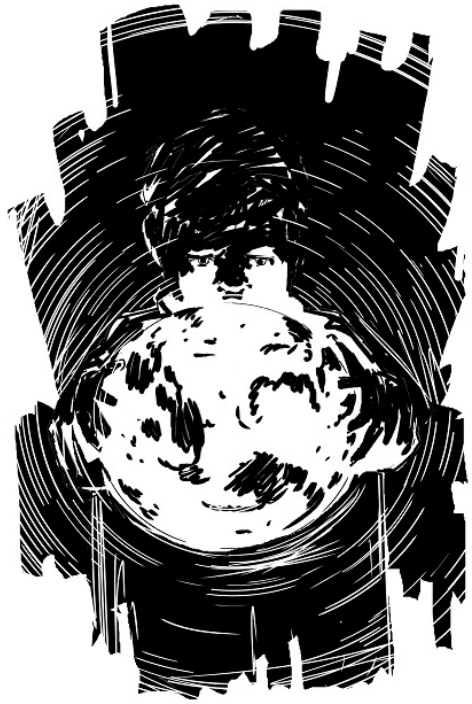
আজ ল্যাবে ঢুকে রোমিতকে দেখেই চমকে উঠলাম। ওর তো এ ল্যাবে ঢোকার কথা নয়! ঢোকা বারণ। কখন কীভাবে ঢুকল! আমি কী ল্যাবের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম!

আমার বাড়ির আর ল্যাবের মাঝে বাগান। সে বাগান পেরিয়ে ও ল্যাবে ঢুকেছে। শুধু ঢুকেছে তাই নয়, ল্যাবের ঠিক সেই কোণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে আমি কিছু জিনিস আলাদা করে রেখেছি। বাতিল জিনিসগুলোকে।

এত অজস্র জিনিসের, এত আলোর গোলকের ভিড়ের মধ্যে ঠিক ওটাই ওর চোখে পড়ল! ওটা ইচ্ছে করে আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিলাম যাতে চট করে কারও চোখে না পড়ে। দেখলে আমারই মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কত সম্ভাবনা ছিল, কত কিছু হতে পারত। কিন্তু শেষে কিছুই হল না।

এখন আর কী করার আছে! আড়চোখে দেখলাম। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। এত অজস্র আলোর বিন্দুর মধ্যে ও ঠিক অন্ধকার কোনওটুকু খুঁজে নিয়েছে। ঠিক ওই ছোট গোলকটার দিকে ওর চোখ নিবদ্ধ।

রোমিত আমার একমাত্র ছেলে। ও একটু একা একা থাকতে ভালোবাসে। স্কুলেও ওর বেশি বন্ধু নেই। খেলাধুলো অতি সামান্যই করে। বাড়িতে এসে পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ও জানে বাড়ির পিছনের এই ল্যাবে আমি আমার দরকারি কাজ করি। এখানে ওর আসা একদম বারণ।



এমনিতে খুব বাধ্য। কেন যে আজ এখানে এসেছিল, কে জানে! তবে এ বিষয়ে বকাবকি করলাম না। এতে অহেতুক জেদ বেড়ে যাবে। শুধু বললাম আর কোনওদিন যেন এখানে না আসে। ওর দেখি মুখ লাল হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল।

বাড়িতে এসে আমাকে এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করল না। মনে মনে খুশি হলাম। হয়তো অন্য গোলকগুলোর সঙ্গে ওই গোলকটার কোনও তফাত দেখতে পায়নি। অবশ্য দেখা সম্ভবও নয় অত সহজে। ল্যাবের সবকিছু একটা আলাদা আস্তরণের আড়ালে থাকে। সেই সময় আর মাত্রার বিভাজন রেখার জন্য সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। অহেতুক চিন্তা করছিলাম।

২

সেদিনের ঘটনাটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

পরের কয়েকদিন খুব কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অন্য কোনও কিছুরই সময় পাইনি। বেশ কয়েকদিন বাদে একসঙ্গে খেতে বসলাম।

আমার স্ত্রী দেখি খেতে খেতে রোমিতকে বলে উঠল— বাবুন, কী হয়েছে রে তোর? কোনও কথাবার্তা নেই? এ ক'দিন এত চুপচাপ হয়ে গিয়েছিস? স্কুলে কিছু অসুবিধে হয়েছে? কারও সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

আমিও ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। সত্যি তো! এতটা চুপচাপ হয়ে গেছে কী করে! অন্যসময় খেতে খেতে নানান হাবিজাবি কথা বলে। আজ কীসব ভাবতে ভাবতে মুখে খাবার

তুলছে। যেন একটা অন্য জগতে হারিয়ে গেছে। মার কথাও যেন শুনতে পেল না।

খানিকবাদে আমি জিজ্ঞেস করে উঠলাম— কী রে, কী হয়েছে তোর?

ও দেখি প্রশ্নটার কোনও উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল— আচ্ছা বাবা, তোমার ল্যাবে তুমি কী নিয়ে কাজ করো?

—কেন? হঠাৎ করে এ প্রশ্ন। বড়দের সবকিছু কী তুই বুঝবি? কিছু দেখেছিস?

ও দেখি চুপ করে রইল।

আমার নিজেরই মনে হল—ওকে একটু বলি। কিন্তু তার পরেই মনে হল না বলাই ভালো। বলতে বলতে আবার কী বলে ফেলব। বাচ্চাদের মনের উপরে প্রভাব পড়তে পারে।

খানিকবাদে ও আবার বলে উঠল— ওই গোলমতো জিনিসটার মধ্যে কিছু একটা যেন আছে। কীরকম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর রঙ পালটে পালটে যাচ্ছে। ওটা কি তোমার তৈরি করা? অন্যগুলোর মতো।

—কোনও জিনিসটা? ল্যাবে তো অজস্র গোল জিনিস আছে?

—ওই যে ল্যাবের মধ্যে আলাদা করা অংশটাতে যে একটা বল রাখা আছে না, তার কথা বলছিলাম। ওই অংশের অন্য বলগুলো যেমন পুরো কালো, এটা ঠিক সেরকমও নয়। এটার রংটা যেন পালটে পালটে যাচ্ছে। শুধু কালো অংশটা আস্তে আস্তে বাড়ছে।

—ও বুঝেছি। না-না, আমি কিছু করিনি। ওটা এমনি এমনি রঙ পালটায়। আমি ওটা তৈরি করেছিলাম অন্যগুলোর মতোই। কিন্তু কেন যে এরকম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কিছু এরকম সময়ে সময়ে নষ্ট হয়ে যায়। সব কী আর চিরকাল একরকমভাবে টিঁকে থাকে! তখন সেগুলো ওদিকে সরিয়ে রাখি।

ও চুপ করে গেল। কিন্তু মনে হল পুরোটা বিশ্বাস করল না। আরও প্রশ্ন আশা করছিলাম। কিন্তু ও করল না। ও কী কিছু আন্দাজ করছে? কে জানে?

৩

এখন ও মাঝেমধ্যে ল্যাবে আসে। গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার এসেছে।

এখন আমি আর ওকে বারণ করি না। আমি আমার মতো কাজ করি।

স্কুল থেকে ফিরে এসেই আমার ল্যাবে এসে ঢোকে। অবশ্য আমার কাজের মাঝে কোনও কথা বলে না।

শূন্যে ভাসমান গোলকগুলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ করে। চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে আলোর খেলা দেখে। আমার ছেলে। হয়তো আমার থেকেই নেশাটা পেয়েছে। ওর বয়সি

ছেলেরা ছুটোছুটি করে বাইরে খেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেটা না করে চুপ করে বসে দাঁড়িয়ে দেখে। মাঝেমধ্যে আবার খুব কাছে গিয়ে দেখে।

তবে আমার যে খারাপ লাগে তা না। এ সব আমারই সৃষ্টি। আমার এক্সপেরিমেন্টের অংশ। অবশ্য পুরোটা নয়। আমি শুধু শুরুটা করে দিই। তারপরে পুরোটাই ওদের উপরে।

শেষ কয়েকদিন পরীক্ষা করছিলাম আমার তৈরি কোয়ান্টাম জগতের কিছু কিউবিট-এর উপরে। বাটারফ্লাই এফেক্ট পরীক্ষা করছিলাম। অর্থাৎ দেখছিলাম অতীতে গিয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করলে বর্তমানের কিউবিটের অবস্থান ও মানের উপরে কীরকম প্রভাব পড়ে!

যেটা ভেবেছিলাম ঠিক সেটাই প্রমাণিত হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কিউবিটগুলো বর্তমানে ঠিক আগের যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরে আসছিল। অতীতে গিয়ে যে সামান্য নয়েজ বা তথ্য বিকৃতি তৈরি করেছিলাম, অবাক হয়ে দেখছিলাম যে বর্তমানে তার কোনও প্রভাব ওই কিউবিটের উপরে থাকছে না। এন্টেঙ্গেলমেন্ট এফেক্ট। কোনও কিউবিট বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। সব মিলিয়ে আবার ওই অতীতে যাত্রা শুরুর আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই কিউবিটগুলো দিয়েই তৈরি আমার এই পুরো জগৎ। এরাই আমার এই জগতের অণু-পরমাণু।

অর্থাৎ বাটারফ্লাই এফেক্ট যখন ওদের উপরে কাজ করেনি, তখন কিছু পরিবর্তনের ক্ষমতাও নেই আমার।

এখানেই আমার তৈরি কোয়ান্টাম জগৎ সব ক্লাসিক্যাল সিস্টেমের থেকে আলাদা। এখানে ভবিতব্য পালটানো যায় না। সব ভাগ্য যেন আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

যাই হোক, এটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন মেতে ছিলাম। নিশ্বাস ফেলার সময় পাইনি।

আজ আমার পড়ার টেবিলে বসে একটা বই পড়ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী দেখি রোমিতকে নিয়ে এসেছে।

মীরা বলে উঠল—তুমি ওকে কিছুই বলছ না! কিছুই খাচ্ছে দাচ্ছে না। আমি বার বার করে বলি তোমার ল্যাবে না ঢুকতে। তবু দেখছি সেখানে রোজ যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থাকে। তারপরে বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। পড়াশোনায় কোনও মন নেই। তুমি সেটাও লক্ষ করছ না। শুধু নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছো।

আমি রোমিতের দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। চোখে মুখে কী যেন বিষণ্ণতার ছাপ।

বলে উঠলাম— কী হয়েছে রোমিত?

—আচ্ছা বাবা, ওই বলের মধ্যে কী আছে? যে বলটার কথা সে দিন বলছিলাম!

—কেন? কী ব্যাপার? কোন বল?— যেন কিছুই জানি না, এমন ভাবে বললাম।

—ওই যে বলটার আলো সমানে পরিবর্তন হচ্ছে বলেছিলাম, তার মধ্যে কি কেউ আছে? আমাদের মতো লোকেরা আছে? আমার মনে হচ্ছে ওখানে অনেক লোক আছে। ওরা সবাই যেন আমাদের কাছে সাহায্য চাইছে। সবাই খুব বিপদে পড়েছে। মারা যাচ্ছে। দেখছ না বলটার রঙ কীরকম কালো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পাশের অন্য বলগুলোর মতো। নীল-সাদা- খয়েরি - সবুজ থেকে আস্তে আস্তে লাল হল। প্রথমে কিছু কিছু জায়গা লাল হত। তারপর সে লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ল পুরো বলটাতে। তখনও বেশ লাগত। এখন যেন আস্তে আস্তে সব কালো হয়ে যাচ্ছে।

—কী এসে যায় ওর রঙ লাল-নীল না কালো— কী হল তা নিয়ে! এরকম বল তো আরও কত আছে। আমার পক্ষে কী আর সব ক'টার খোঁজ রাখা সম্ভব। সব নিজের মতো জ্বলে-নেভে।

—না, না, বাবা, ওই একটাই অন্যরকম। আমার মনে হয় ওর মধ্যে যেন অনেকে আছে। তারা যেন আমার আর তোমার কাছে সাহায্য চাইছে। যেন অনেকের কান্না ভেসে আসছে। যেন তারা বাঁচতে চায়।

মীরা বলে ওঠে—দেখেছ, কী সব বলছে। সারাক্ষণ কী সব উলটোপালটা কম্পিউটার গেম খেলে। এসব আজব কথা ভেবে ভেবে শরীর খারাপ হচ্ছে। পড়াশোনায় একদম মন নেই।

—না মা, আমি ওদের দেখতে পাই। ওদের কথা শুনতে পাই। মনে হয় ওরা যেন অনেকটা আমাদেরই মতো। খুব ছোট ছোট। ওরা মনে হয় কেউ আর বেশিদিন বাঁচবে না। ওদের সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের থাকার ওই বলটা নষ্ট হয় যাচ্ছে।

এবারে বকুনি দিয়ে উঠলাম— কী সব বলছিস? এসব আমার পরীক্ষানিরীক্ষার অংশ। এগুলো সব আমার কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সিমুলসেশন। এর মধ্যে কোনও প্রাণ নেই। কোনও জীবন নেই। কিছু নেই— আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

আসলে মিথ্যে বলছি বলেই হয়তো জোর দিয়ে বলার দরকার হল।

—আমি ঠিক বলছি বাবা। তুমিও জানো। তাই আলাদা করে রেখেছ। ওই গোল বলটার মতো আর কোনও বল নেই। ওখানে আমাদের মতোই লোক আছে। ওরা সবাই কষ্টে ছটফট করছে। ওদের আমি স্বপ্নে দেখতে পাই। দেখি ওরা যেন আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। আচ্ছা, ওদের অন্য কোনও বলে নিয়ে যাওয়া যায় না, যাতে ওরা বেঁচে যায়? তোমার ওখানে তো এতরকম বল আছে। যেসব বল ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে নিয়ে গেলেই ওরা বেঁচে যাবে।

গম্ভীর হয়ে বলে উঠলাম—সে হয় না। এসব উদ্ভট চিন্তা তোর মাথায় আসে কী করে! আজ থেকে তোর সব কম্পিউটার গেম খেলা বন্ধ। এসব খেলেই তোর মাথায় হাবিজাবি চিন্তা ঢুকছে। ওগুলো সব নেহাত গোলক। কিচ্ছু নেই তাতে।

ও ফের অবুঝের মতো একই কথা বলে উঠল

—বাবা, কিছুই কী করা যায় না? তুমিই তো ওদের সৃষ্টি করেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো কী হচ্ছে ওখানে! তুমি ছাড়া আর কে কী করবে!

—এ বিষয়ে আমি আর একটা কথাও বলব না। তুমি পড়তে বসো গিয়ে।

রোমিত আর কিছু বলল না। চলে গেল ঘর থেকে।

সত্যি কথাটা ওকে হয়তো কোনওদিন বলতে হবে।

জানি কিছুই করা যায় না। ওর আয়ু শেষের দিকে। সে জন্যই দেখছিলাম অতীতে গিয়ে কিছু করে আসা যায় কিনা যাতে ওদের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সেটা করা যায় না। ভবিতব্য।

৪

আজ রোমিত আর স্কুলে যায়নি। সারাদিন ওই বলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল ল্যাবে। দু-বার এসেছিল বলতে—আমি কিছু করতে পারি কিনা! এখন পুরো বলটা কালো হয়ে গেছে। মিশে গেছে পাশের অন্ধকারের সঙ্গে।

এ নিয়ম আমি লিখিনি। এ নিয়ম ভাঙার সূত্রও আমার জানা নেই। আমি ওই সব বল শুধু তৈরি করতে পারি। নানান সাইজের। ল্যাবে ওদের জগৎ তৈরি করতে পারি যেখানে ওই গোল বলগুলো বিভিন্ন নিয়মে কাছে-দূরে থেকে নানানভাবে নিজেদের চারদিকে ঘুরতে পারবে। আমি ওদের জন্য সে পরিবেশ তৈরি করতে পারি।

বাকিটা ওদের হাতে। ওরা ধাক্কা খেয়ে ভাঙে, টুকরো হয়, আবার অন্য কক্ষপথে গিয়ে ঘোরে ওদের নিজেদের নিয়মে। সেখানে আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

কিছু দিন পরে ওরা ধ্বংস হয়ে যায়। ওদের তখন সরিয়ে নিয়ে আসি আমার বাতিলের অংশে।

এ ল্যাব আসলে আমার খেলনা ঘর। ওই ল্যাবের মধ্যে সময় অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আমি নিজেও জানি না ওখানে কীভাবে প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যদিও সেটা খুব কমই হয়। কিন্তু সেটা আমার কাছে সত্যি বড় রহস্য। তারপরে কীভাবে জানি ওরা তিলে তিলে সভ্যতা গড়ে তোলে। কীভাবে ওরা ওদের নিজস্ব বিশ্ব গড়ে তোলে। ওরা ভাবে ওরাই সবকিছু — ওদের আকাশ, ওদের বাতাস— সবকিছু ওদের কথা শুনবে।

আমার ক্যালেন্ডারে ওরা থাকে শুধু কয়েকটা দিন। এর মধ্যেই ওরা ওদের সভ্যতা গড়েতোলে, তারপরে আবার আস্তে আস্তে সব ধ্বংস হয়ে যায়। কোনও চিহ্ন থাকে না। ঠিক ওই বলটার মতো।

আমার ছেলে ভুল দেখেনি। ওরা দিনের পর দিন নিজেদের গ্রহ পৃথিবীকে ধ্বংস করেছে। নিজেদের পরিবেশ নষ্ট করেছে। শেষে যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর কিছুই করার ছিল না।

তখন ওদের জঙ্গলে জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে গেছে। প্রবল জল-ঝড়ে ওদের সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। হিমবাহ গলে ওদের তৈরি সব শহর সমুদ্রের তলায় হারিয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু জায়গা জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বাঁধিয়েছে। শেষে যেটুকু বাকি ছিল তাও পরমাণু যুদ্ধে সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু ওরাই যে শেষ হয়ে গেছে, তাই নয়, ওদের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে ওই পৃথিবীতে শেষ প্রাণের স্পর্শ।

রোমিত তারই লাল রঙ দেখেছিল। এখন আর কিছু বাকি নেই। সব পুড়ে গেছে। সব কালো হয়ে গেছে। ওরা নিজেদের মানুষ বলত। ওরা ওই গ্রহের বাকি সব প্রাণীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ওখানকার জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় ছিল ওদের রাজত্ব। সবসময় ভাবত ওদের মতো উন্নত জীব আর কোথাও নেই, কিন্তু শেষে সব শেষ হয়ে গেল। ওরা আর কেউ নেই।

আমিই ছিলাম ওদের ঈশ্বর। ওরা চিরকাল আমার খোঁজ করে গেছে, শেষে খুঁজে পায়নি। খোঁজ পায়নি ওদের মতো অন্য কারও, অন্য কোনও গ্রহ যেখানে ওদের মতো উন্নত আরও কেউ আছে।

আসলে তারা অন্য আরেকটা সময়ে এসেছিল, আবার ওদের মতোই সময়ের দাগে মুছে গিয়েছিল। রোমিত ঠিকই বলেছিল ওই বলটা ছিল সত্যি অন্যরকম। লক্ষ কোটিতে ওরকম একবারই হয়।

মানুষ বুঝতেও পারেনি যে ওদের এই গ্রহ— ওদের এই চেনা জানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলে শুধুই আমার ল্যাব, শুধুই আমার কিউবিটের জগৎ।

হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে স্রষ্টা বলা যায়। কিন্তু আমি নিজেই এই খেলার নিয়মকানুন কিছুই বুঝি না। এই যে আমার ল্যাবের পরিসর, ওই জগৎ কেন যে আস্তে আস্তে দিনের পর দিন বাড়ছে, কেন তা আরও ছড়িয়ে পড়ছে আমার বাগানে, তাও জানি না। কিছুদিন পরে আরও জায়গা করে দিতে হবে।

এই যে আমার নিজের এই জগৎ, যেখানে আমি আছি, রোমিত আছে, মীরা আছে, সেটাও যে কে গড়েছে তা জানি না। শুধু জানি আমার এই বিশ্বও একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরাও

হয়তো পড়ে আছি অন্য কারও ল্যাবে। তারাও হয়তো আমার উপরে লক্ষ্য রাখছে। হয়তো আমাদের উপরে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে।

এই সৃষ্টির রহস্য বোঝার জন্য আমি তাই আমার ল্যাবে এই এক্সপেরিমেন্ট চালাই। বিভিন্ন ধরনের গ্রহ-তারা তৈরি করে সিমুলেশন করি। বোঝার চেষ্টা করি। দিনরাত চোখ রাখি আমার সৃষ্টির উপরে। উদ্দেশ্য যদি কোনওদিন আমার মাথার উপরে থাকা এই সবুজ আকাশের রহস্য খুঁজে পাই।

সামনে রোমিত এখনও বসে কাঁদছে। কি করে যে ওদের কান্নার শব্দ ওর কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল কে জানে! ও সত্যি হয়তো ওদের ঈশ্বর হয়ে উঠেছিল। তাই শুনতে পাচ্ছিল।

তবে এখন আর কোনও কান্নার শব্দ ওর কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছচ্ছে না। সব থেমে গেছে। এখন ওখানে আর কেউ নেই।

তবে আমি আশাবাদী। এখানেই সব শেষ নয়। হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে আমার ল্যাবের অন্য কোনও গ্রহে বা গ্রহাণুপুঞ্জে আবার কোনও প্রাণের সম্ভাবনা তৈরি হতে চলেছে। যারা আবার ভাববে তারাই এই মহাবিশ্বের শেষ কথা। তারাই আবার তৈরি করবে সেরা সভ্যতা। ধ্বংসের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত খুঁজে যাবে আমাকে, রোমিতকে, ওদের ঈশ্বরকে। ঠিক যেমন আমিও তাঁকে খুঁজে যাই।

কানে যেন ভেসে আসে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, সেই পরিচিত মন্ত্র।

'ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন
সো অঙ্গ বেদ যদি বা নবেদ'

যিনি এই সৃষ্টির আদি উৎস, তিনি তা সৃষ্টি করুন বা নাই করুন, তিনি তা সর্বোচ্চ স্বর্গে বসে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি হয় সবকিছু জানেন, বা হয়তো কিছুই জানেন না।

জানি না এ মন্ত্র কেন শুনতে পাই। কেন বারবার শুনতে পাই সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই।

আলো-ছায়া

প্রত্যেকেই কোনও না কোনও জিনিসকে ভয় পায়। কেউ আরশোলায়, কেউ বাঘে, কেউ সাপে, কেউ বা ভূতে। আর আমি? হ্যাঁ, আমিও কিছু জিনিসকে ভয় পাই। তার মধ্যে একটা হল রকিং চেয়ার। দেখলেই মনে হয় চেয়ারে কে যেন বসে আছে। অথচ দেখা যাচ্ছে না। আর তাই রকিং চেয়ারটা না থেমে দুলে যাচ্ছে। এই এক মুহূর্ত আগেই কে যেন বসে ছিল, আর তার পরমুহূর্তেই সে যেন আর বসে নেই।

জানি না এটাকে আমার রকিংচেয়ার ফোবিয়া বলব কিনা। এটা আগে ছিল না। দু-বছর হল হয়েছে। কেন হল সেটা বোঝাতে গেলে সেই ঘটনা দিয়েই শুরু করতে হয়।

তখন মাস ছয়েকের জন্য অফিসের কাজে ইংল্যান্ডে গেছি। শহরটার নাম চেলতেনহ্যাঁম। পুরনো বর্ধিষ্ণু শহর। শহর জুড়ে ভিক্টোরিয়ান আমলের বাড়ি। অক্সফোর্ডও বেশি দূরে নয়। তাই শহরে বহু শিক্ষিত মানুষের বাস। ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটা বড় বড় ফেস্টিভ্যাল, যার মধ্যে সাহিত্য উৎসব আর বিজ্ঞানের উৎসবও পড়ে, এখানেই হয়। আর একটা বিখ্যাত ঘোড়ার রেসও হয় শহরটাতে। আর তা দেখতে দেশবিদেশ থেকে অনেক লোক আসে।

কর্মসূত্রে চেলতেনহ্যাঁমে তখন মাসতিনেক হয়ে গেছে। শহরের প্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকি। অফিস শহরের কেন্দ্রে। ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ শহরের মতো এখানেও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেশ ভালো। তাই গাড়ি কিনতে হয়নি। বাসেই অফিস যাতায়াত করি। শীতের সময়। দিনেরবেলা সূর্যের দেখা মিলতে মিলতে আটটা বেজে যায়। আবার বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে ঝুপ করে ডুব মারে। আর তাছাড়া বেশিরভাগ সময় মেঘলা আর তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছুটির দিনগুলো তাই ঘরেই বেশি কাটে।

সেদিনটা ছিল বক্সিং ডে। অর্থাৎ ক্রিসমাসের পরের দিন। ২৬শে ডিসেম্বর। রাস্তা শুনশান, ফাঁকা। সবাই বাড়ির ভিতরে। শুধু ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে লাগানো ইলেকট্রিক আলোর রোশনাইতে সব বাড়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেদিন আমার অফিস ছুটি। বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। বাস খুব কম। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাসের দেখা না পেয়ে ঠিক করলাম আর অপেক্ষা না করে হেঁটেই মাইল তিনেক পথ চলে যাব। ঠান্ডা থাকলেও, বৃষ্টি নেই। আলোয় সেজে ওঠা বাড়িগুলো দেখতে দেখতে হাঁটা যাবে। গত কয়েক সপ্তাহ শুধু বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি। শহরটাকে

আর দেখা হয়নি। সেও আজ আমার মতোই একাকী। নির্জন রাস্তায় তাকে আরও কাছ থেকে দেখা যাবে।

তখন রাত আটটার মতো হবে। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক অভিজাত পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পরপর প্রায় একই ধাঁচের বেশ কয়েকটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি। এগুলো বেশিরভাগ ১৮০০ সালের মাঝামাঝি তৈরি। এ ধরনের পুরনো বাড়িগুলো সরকার থেকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিশাল বিশাল কাচের জানলা। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গাজুড়ে বাগান। বোঝাই যায় যারা এসব বাড়িতে থাকে তারা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। এরকমই একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল বাড়ির সামনের বাগানে রকিংচেয়ারে কে যেন বসে আছে। বাড়িতে কোনও আলো জ্বলছে না। ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে পড়েছে লনে। আর তাতেই যা একটু দেখা যাচ্ছে। এই সময় এত ঠান্ডায় অন্ধকারে কোনওরকম আলো না জ্বেলে বাইরে বসে থাকা খুবই অস্বাভাবিক। একটু খেয়াল করে তাকাতেই মনে হল একজন বৃদ্ধা যেন রকিং চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে অজ্ঞানের মতো পড়ে আছেন। আর চেয়ারটা নিজের ছন্দে দুলে যাচ্ছে। ঘুমোচ্ছেন কি? না, তা তো মনে হয় না। ব্যাপারটা যে আদৌ স্বাভাবিক নয়, তা বুঝতে দেরি লাগল না।

বাড়ির বাগানের নিচু গেট খুলে ভিতরে এগিয়ে গেলাম। কাছে এসে ভালো করে খেয়াল করলাম। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়েস হবে। বিড়বিড় করে কী বলছেন। কপালে হাত রাখলাম। যা ভেবেছি তাই। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বেহুঁশ হয়ে বাইরে পড়ে আছেন। প্রথমেই এমারজেন্সিতে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে মিনিট কুড়ি লেগে যাবে। ওনাকে তো আর এই ঠান্ডার মধ্যে ফেলে রাখা যায় না। তাই ওনাকে ধরে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলাম। ঢুকেই বাঁদিকে ড্রয়িং রুম। সেখানে সোফার উপরে বসিয়ে বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা জানার জন্য কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠলাম—এনিবডি হোম?

উত্তর পেলাম না। অন্য কোনও ঘরেও আলো জ্বলছে না। তার মানে উনি এখানে একাই থাকেন। কিন্তু এই বয়সে বিশাল বাড়িতে একা থাকা সত্যিই কষ্টকর। ওনাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে থাকলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে পুরো পথটাই উনি জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে ছিলেন।

হাসপাতালে পৌঁছে ওখানকার লোকদের কাছ থেকেই পরে শুনলাম যে উনি এখানে যথেষ্ট পরিচিত। শহরের খুব বড় একটা অকশন হাউসের, বেশ কয়েকটা বড় স্পা-এর আর একটা চেন রেস্টুরেন্টের মালিক উনি। ওনার এক ছেলে আর এক মেয়ে। দুজনেই বিদেশে থাকেন। তাদেরকেও ফোনে ওনার অসুস্থতার কথা জানানো হল।

আমি সারারাত ওখানেই ছিলাম। এই সময়ে ক্রিসমাসের ছুটির জন্য ডাক্তার - নার্স বেশ কম। আমি না থাকলে উনি বেশ সমস্যাতেই পড়তেন। মাঝেমধ্যেই তাগাদা দিতে হচ্ছিল। তা না হলে উনি হয়তো স্ট্রেচারেই পড়ে থাকতেন। ভোররাতে নানান টেস্ট করার পর ওনাকে একটা বেডে দেওয়া হল। আমি আরও কয়েক ঘণ্টা ওখানে থেকে সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। দুপুরের দিকে হাসপাতালে ফোন করে জানলাম ওনার ছেলে এসে গেছে। ওনার সঙ্গেই আছে। আমার আর তাই যাওয়ার দরকার নেই।

পরের দিন আর যাওয়া হয়নি। হাসপাতালে ফোন করে একবার খোঁজ নিয়েছিলাম। ছেলে সঙ্গে আছে। উনি পুরোপুরি সুস্থ না হলেও অপেক্ষাকৃত ভালো।

এরপরে আমি আর কয়েকদিন খোঁজ নিইনি। অফিসের কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, যে ওনার কথাটা মাথাতেই ছিল না। দু-সপ্তাহ বাদে এক অচেনা নাম্বার থেকে হঠাৎ ফোন পেলাম। বেশ কয়েকবার 'হ্যাঁলো' বলার পরে উলটো দিকে এক ভদ্রমহিলার সাড়া পেলাম। দু-মিনিট বাদে পরিষ্কার হল সেদিনের সেই বৃদ্ধাই আমাকে ফোন করেছেন। উনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমাকে দেখতে চান। আমার নাম্বার হাপাতালের কাছে ছিল। সেখান থেকেই পেয়েছেন। সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। কিন্তু আমাকে শুধু ফোনে মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়েই উনি ক্ষান্ত নন। দেখা করতে চান।

বৃদ্ধার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। পরদিন অফিস ফেরত ওখানে গেলাম। ওই পাড়াতে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধে সাতটা। বেশ ভালো ঠান্ডা। দশ দিন আগেও শীত তেমন ছিল না। আর আজ! খেলার শেষ মুহূর্তের গোলশোধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে জানুয়ারির শীত। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তার মধ্যে সামান্য বৃষ্টিও হচ্ছে। গায়ে লংকোট আর মাথায় টুপি থাকলেও মুখে বরফের ছুরির মতো বৃষ্টির কণাগুলো এসে পড়ছে।

রাস্তার ষড়ভুজ ল্যাম্পশেডের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। তাদের হলদেটে আলোয় বৃষ্টির ফোঁটায় যেন রঙ লেগেছে। ২৯ ক্রাইস্টচার্চ রোড। থমথমে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। ড্রয়িংরুমের পর্দার ফাঁক থেকে শুধু সামান্য আলোর আভাস আসছে। বাগানের গেট খুলে নুড়ি ফেলা এক চিলতে পথ পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। বাঁ দিকের বাগানে রকিং চেয়ারটা আজকেও দেখলাম। মনে হল দুলছে। কেউ যেন এক্ষুনি এখান থেকে উঠে গেছে। বাড়ির মেন দরজার দিকে এগোলাম। বিশাল কাঠের দরজা। সামনে যেতেই খুলে গেল। এক মাঝবয়সি মহিলা দরজা খুলে দিলেন। আমি ওনার পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। সামনেই দোতলায় ওঠার কাঠের চওড়া সিঁড়ি। সেদিকে না এগিয়ে আমাকে বাঁ পাশে বিশাল ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন। দরজা খোলা। বৃদ্ধা একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। উনি আমাকে

দেখে মৃদু হেসে সম্ভাষণ করে সামনের লেদার সোফায় বসতে বললেন। ঘরের পরিবেশ বেশ সাবেকী। ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন জ্বলছে। তার সামনে কিছু দূরে একটা নিচু ওভালো শেপের কাঠের টেবিল। তাতে একটা ভারী সুন্দর কাচের মোমদানীতে মোমবাতি জ্বলছে। তার আলোয় আলোর থেকে ছায়াই যেন বেশি। আর সে আলোছায়ায় ধরা দিয়েছে বিশাল ড্রয়িংরুম। ঘরের অন্যদিকে আরেকটা বিশাল ডিনার টেবিল। প্রায় কুড়ি জন একসঙ্গে বসতে পারে তাতে। ঘরের দু'ধারে বিশাল কাচের জানলা। সেদিন এই ঘরেই এসেছিলাম। তবে অন্ধকার ছিল। আর ওনার দিকেই সমানে লক্ষ রাখতে হচ্ছিল বলে এত খেয়াল করিনি। ঘরের দেওয়াল জুড়ে অনেক ছবি আর নানান কাঠের কাজ।

বৃদ্ধাকে আজ দেখলাম ভালো করে। আভিজাত্য পোশাকে, মুখমণ্ডলীতে। ঘরের আবছা আলোতেও উজ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা। মাথাভর্তি সাদা কোঁকড়া চুল। মুখের মধ্যে ভারী সুন্দর একটা প্রশান্তির ছাপ।

মৃদু স্বরে বলে উঠলেন— তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা নিজের ছেলেরাও করে না। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। তা তুমি এখানে কী করো? কতদিন আছ?

আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম— আরও কয়েকমাস থাকব। তা আপনি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ, গত দশ বছর একাই থাকি। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে। তবে বাড়িতে কাজের লোক আছে। বেশ কয়েকজন।

—তা সেদিন তো কেউ ছিল না! ছুটিতে ছিল?

—হ্যাঁ, সেদিন একাই ছিলাম। আর তাই-বলে একটু থেমে বললেন—দাঁড়াও তোমার জন্য চিকেন সুপ করেছি। খেয়ে নাও।—বলে 'লিয়ন' বলে আস্তে করে ডেকে উঠলেন। দেখলাম দরজার কাছে একজন বছর ষাটের সুসজ্জিত বাটলার এসে দাঁড়াল। তারপরে চোখের ইশারায় কত্রীর নীরব নির্দেশ বুঝে আবার চলে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে সামনের টেবিলে সুপ রেখে গেল। লিয়নকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধা বলে উঠলেন—ও আমাদের এখানে বহু বছর আছে। আমার শ্বশুরের সময় থেকে। খুব ভালো রান্নার হাত।

বৃদ্ধা আস্তে আস্তে ওনাদের কথা বলতে লাগলেন। চারপুরুষের বাস এই শহরে। তবে এই বাড়ি কেনেন ওনার শ্বশুর স্টিভ। ফায়ারপ্লেসের উপরে রাখা সুট-টাই পরে সোফায় বসা অভিজাত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছবি দেখিয়ে বলে উঠলেন— ওনার আরও অনেক ব্যবসা থাকলেও আসল ব্যবসা ছিল পুরনো জিনিস বিক্রির। আর তাতেই অনেক টাকা লাভ করেন উনি। ওই একই ব্যবসা আমার স্বামী জনও দেখতেন। কিন্তু খুব কম বয়সে জন মারা যান।

তারপরে আমাকেই একা এই সব ব্যবসা পুরোপুরি সামলাতে হত। তারপরে আরও অন্যান্য কিছু ব্যবসা শুরু করি।

শুনলাম কীভাবে অন্য ব্যবসাতেও এর পরে উনি যথেষ্ট সাফল্য পান। খুবই উদ্যমী পরিশ্রমী মহিলা। এখন নেহাত বয়েস হয়েছে। কিন্তু তবু ব্যবসার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। এমনকী ভারতেরও অনেক খোঁজ খবর রাখেন। ব্যবসা সূত্রে কয়েকবার রাজস্থান গেছেন। ওনার এক ছেলে আর এক মেয়ে। এখন একজন আমেরিকা আর একজন অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। অসুস্থতার কথা শুনে ছেলে এসে দুদিন থেকে আবার ফিরে গেছে আমেরিকায়।

ওনাদের অবস্থা আগে এত ভালো ছিল না। এই বাড়ি-গাড়ি সবই ওই অ্যান্টিকের দোকান থেকে।

কথায় কথায় বললাম— হ্যাঁ, আপনার শ্বশুরমশাইকে দেখেই মনে হয় খুব পরিশ্রমী লোক ছিলেন। একই সঙ্গে খুব তুখোড় ব্যবসায়ী বলে মনে হয়।

—শুধু পরিশ্রম করলে কি হয়! ভাগ্যও লাগে। আর সেটাও ওনার ছিল। আর উনি, নাহ সে কথা থাক— থেমে গেলেন বৃদ্ধা। একটু থেমে আবার বলে উঠলেন— অনেক সময় আমরা সব কিছু পেয়েও শেষে হেরে যাই। উনি সারাজীবন প্রচুর রোজগার করেছেন, কিন্তু ওনার মতো অসুখী মানুষ খুব কম দেখেছি। আমার স্বামী জনও একইরকম ছিল। এত অর্থ, তবুও কোনও কিছুতে যেন শান্তি নেই। ব্যবসা তো নয় সবসময় যেন একটা যুদ্ধ। সবসময় টেনশন। সেখানে ভালো খারাপ বলে যেন কিছু নেই। তা জনও খুব অসুখী ছিল। কত কম বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। চলে যাওয়ার আগের দিনও এখানে সারারাত পার্টি হল। ও একটা বড় ব্রিজ তৈরির বরাত পাবে কিনা সে ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিল। ভোর রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, মনে হয় ওই কন্ট্রাক্ট পাবে। কেন পাবে সেটা বোঝাল। কয়েকদিন বাদে পেলামও। কিন্তু তখন ও আর নেই।

বৃদ্ধা থামলেন। ইতিমধ্যে বাটলার লিয়নের পিছু পিছু আরও দুজন ঘরে প্রবেশ করেছে ডিনার নিয়ে। বৃদ্ধা পরিচয় করে দিলেন। হেনরি আর মার্ক। বহু বছর ধরে আছে। চেহারায়-পোশাকে—ব্যবহারে সাবেকী কালের চিহ্ন। ডিনার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। রোস্ট চিকেন, তিন ধরনের সবজি। স্যালাড। ডেসার্ট।

কথায় কথায় ওনার ছেলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। ছেলের নাম ম্যাট। পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল। আমেরিকায় বড় ব্যবসা। কথায় কথায় উনি বলে উঠলেন— ও এসেছিল আমাকে দেখতে নয়। অন্য কাজে।

আমি একটু অবাক হয়ে বলে উঠলাম,— কিসের কাজ?

—একটা ছবির খোঁজে। সে ছবিটা বাড়ির মধ্যে কোথায় আছে, সেটা আমিই শুধু জানি। আমি যদি মারা যাই, আমার সঙ্গে ওই ছবিটাও হারিয়ে যাবে। তাই এসেছিল এত তাড়াহুড়ো করে। ছবিটা নিয়ে চলে গেল।

—কেন? ওর কি ছবির খুব শখ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে একটু অন্যধরনের শখ। সেটা ও ওর বাবা-ঠাকুরদার থেকে পেয়েছে। আসলে ওর রক্তে তো শিল্প নেই, ব্যবসা আছে। আর আমাদের বাড়িতে কত ছবি আছে, দেখেছ তো? এগুলো সাধারণ এলাকে দেখতে পেল না কোনওদিন।— বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সেদিন আরও দেড় ঘণ্টা ছিলাম। আসার সময় বৃদ্ধা বললেন— দাঁড়াও তোমার জন্য একটা ছোট উপহার আছে।— বলে আমার দিকে একটা আড়াই ফুট লম্বা টিউব দিয়ে বললেন— এর মধ্যে একটা ছবি আছে। তোমার জন্য। পরে বাড়ি গিয়ে খুলে দেখো।

আমি তখনই খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেখলাম ঢাকাটা বেশ শক্ত করে আটকানো।

সেটা দেখে উনি মৃদু হেসে বলে উঠলেন, পরে দেখো। যত্ন করে রেখো। এই আলোতে ছবি ভালো বুঝতে পারবে না।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ থেকে চলে এসেছিলাম।

বাড়িতে এসে ওই টিউবটা থেকে ছবিটা বার করে দেখলাম। ছবির সঙ্গে একটা টাইপ করা চিঠি আছে, যেখানে উনি আমাকে এই ছবিটা উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বেশ পুরনো ছবি। দু ফুট বাই দেড় ফুট। অয়েল অন ক্যানভাস। একটা মাঝবয়েসি এলাকের ডানহাতে ধরা ফলের ঝুড়ি। ঝুড়ির মধ্যে আপেল, লেবু, চেরী, আঙুর, বেরী, পিয়ার এরকম নানান ফলের সঙ্গে কিছু পাতা সাজানো আছে। লোকটা অন্য হাতের তর্জনী তুলে উপরের দিকে কিছু একটা নির্দেশ করছে। আর সেদিকে তাকিয়ে আছে। যেদিকে নির্দেশ করছে ঠিক সে দিক দিয়েই আলো এসে লোকটার মুখে এসে পড়েছে। লোকটার মুখভর্তি দাড়ি। ঘাড় অবধি কোঁকড়ানো চুল। চোখের নীচটা সামান্য বসা। মুখের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা। সব মিলিয়ে বেশ ভালো ছবি। পরের দিন দোকান থেকে একটা ফ্রেম কিনে ছবিটা ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম।

এরপরে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। রঞ্জন আমার স্কুলের বন্ধু। ও বেশ কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে থাকে। এক উইক এন্ডে হঠাৎ এসে হাজির। ও ছবির বেশ ভালো সমঝদার। নানান আর্ট একজিবিশনে যায়। নিজেও খুব ভালো ছবি আঁকে। আমার ওই ছবিটা

ড্রয়িংরুমে রাখা ছিল। ওটা দেখে কেন জানি না —ও বারবার করে ঘুরে ফিরে বেশ খানিকক্ষণধরে লক্ষ্য করতে থাকল। তারপরে বলে উঠল— তুই এ ছবিটা কোথায় পেয়েছিস?

—কেন? কী ব্যাপার?

—আহা, আগে বলই না। এ ছবিটা কোথায় পেলি?

আমি পুরো ঘটনাটা বললাম। ও খুব গম্ভীর হয়ে শুনল। তারপরে হঠাৎ করে ওর ফোনে কীসব সার্চ করতে শুরু করল। মুখ-চোখ দেখে মনে হল বেশ উত্তেজিত।

বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করলাম, কোনও উত্তর পেলাম না। শুধু একবার উত্তেজিতভাবে বলে উঠল— এ ছবিটার কোথাও কোনও উল্লেখ পাচ্ছি না। আর্টলস রেজিস্টারেও না। কিন্তু আমার মন বলছে এটা ক্যারাভাজ্জিওর আঁকা। সেই এক স্টাইল। কিন্তু তারপরেই মনে হচ্ছে তা কী করে সত্যি হয়?

—কী বল না, খুলে। আর্টলস রেজিস্টারটা কী?

—যে কোনও নামকরা ছবি চুরি হয়ে গেলে, ওই রেজিস্টারে থাকে। আর তাই চুরি করা ছবি বিক্রি করা সহজ হয় না।

—চুরি? কিসের চুরি?

—বলছি, তার আগে আমার ওই মহিলার সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য লাগবে। আমি এটুকু জানি এরকম একটা ছবি ক্যারাভাজ্জিও তার শেষ জীবনে এঁকেছিল। কিন্তু গত চারশো বছরে তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। নেহাতই আমার এ বিষয়ে বেশ কিছু পড়াশোনা আছে, কিছুটা রিসার্চও আছে, তাই জানি।

বৃদ্ধা সম্বন্ধে আমার যা জানা ছিল সব বললাম।

ও চুপ করে শুনল। তারপরে বলে উঠল— আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে তুই কি পেয়েছিস ভাবতে পারছিস না। ক্যারাভাজ্জিও-র নাম শুনেছিস?

—না। খুব নামকরা কোনও আর্টিস্ট?

—তুই ক্যারাভাজ্জিওর নাম শুনিসনি? ব্যারোক স্টাইলের পেন্টিং-এর অন্যতম পুরোধা। পনেরোশো সালের মাঝামাঝি খ্রিস্টধর্মের বার্তা সাধারণের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়ায় জন্য এই ধরনের পেন্টিং ক্যাথোলিক চার্চের উৎসাহে আঁকা শুরু হয়। বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাকে চাক্ষুষ তুলে ধরার জন্য এ ছবি আঁকা হত। ক্যারাভাজ্জিও ইতালির সবথেকে নামকরা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একজন। এত বছর বাদেও ওনার আঁকা সব চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করে। অবশ্য মানুষ হিসেবে উনি খুব ভালো ছিলেন না। একদিকে শিল্পী হলেও, অন্যদিকে ছিলেন একদম গুন্ডা। সারাজীবনই খুনখারাপি করে কাটিয়েছেন। খুব রগচটা ছিলেন। যখন

তখন ছোরা বার করে আক্রমণ চালাতেন। তাও আবার পিছন থেকে কাপুরুষের মতো। একবার এক পুলিশকে ছোরা মেরে জখম করেন। পরে অন্য এক ঘটনায় রোমের রাস্তায় ছোরা চালিয়ে একজনকে মেরেও ফেলেন। ওনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উনি তখন রোম থেকে পালিয়ে মালতা চলে যান। বাকি জীবনটা পালিয়ে পালিয়ে কেটেছিল। শুনেছি শেষদিকে ওনার মাথারও ঠিক ছিল না। ১৬১০ সালে ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। কীভাবে মারা যান তা আজও কেউ সঠিক জানে না। এ ছবিটা খুব সম্ভবত শেষদিকেরই আঁকা। শোনা যায় বেশ কয়েকজন প্রাইভেট কালেকটরের হাত বদল হয়েছিল এ ছবিটা। কিন্তু কখনোই জনসমক্ষে আসেনি। এটাই যদি সেই ছবি হয়, তার দাম কী হবে ভাবতে পারছিস?

—কত?

—জানা নেই। হয়তো একশো মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি। ভাবতে পারছিস, যে ছবি এত বছর ধরে সব চোখের আড়ালে আছে, যার খোঁজ সারা বিশ্বময় চলছে, তার দাম কী হতে পারে? তবে একে তো আর শুধু টাকার বিচারে ভাবা যায় না। যদি এটাই সেই আসল ছবি হয় তাহলে এককথায় এ ছবি অমূল্য। অবশ্য এটা আসল ছবি না হওয়ার সম্ভাবনাই নিরানব্বই শতাংশ। তা হলে তো এই ছবি কবেই বিখ্যাত কোনও মিউজিয়ামে স্থান পেত।

—আমারও মনে হয় এটা একটা সাধারণ ছবি। না হলে এই সামান্য পরিচয়ে আমার হাতে কেউ এ ছবি তুলে দেয়? তা তোর কেন মনে হল এটা ক্যারাভাজ্জিওর?

—কারণটা বলি। ছবিটা দেখেই মনে হয় খুব পুরনো। তাই তো? এবার ক্যারাভাজ্জিওর কথায় আসি। ওনার পেন্টিং স্টাইলের সঙ্গে এ আঁকা হুবহু মিলে যায়। সেই একই রকম আলোছায়ার কাজ। যেন ত্রিমাত্রিক কোনও ছবিতে নাটকের একটা মুহূর্ত ধরা হয়েছে। ওর ১৫৯৩ সালে আঁকা সেই বিখ্যাত ছবি 'ফলের ঝুড়ি'র সঙ্গে এ ছবির ফলের ঝুড়ি একদম মিলে যায়। একই রকমের ফল, একই রকমের পাতা। ছবির পিছনে তেমন কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, যেটা ওনার ছবিতেও থাকত না। আর তাছাড়া খুব শক্তিশালী কারুর হাতে আঁকা সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছিস। দেখেই মনে হয় যেন দর্শকও ওই ছবির একটা অংশ। তবে আমি অন্য কয়েকজন চিত্রশিল্পের সমঝদারকে দেখাতে চাই। তবে তার আগে তুই একবার বৃদ্ধাকে গিয়ে হালকাভাবে জিজ্ঞেস কর যে এ ছবিটা কোথা থেকে পেয়েছেন। কিন্তু ভুল করে আবার বলে দিস না, যে এ ছবি নিয়ে তুই কি সন্দেহ করছিস। এ ছবির মূল্য হয়তো বৃদ্ধা জানেন না, ভুল করে তোকে দিয়ে দিয়েছেন সেটাও হতে পারে। আর সবকিছু জানার পরে মন বদলাতেই পারেন। আর নকল হলেও এটুকু বলতে পারি, এছবি বেশ ভালো কারুর হাতেই আঁকা। আর সে শিল্পী নির্ঘাত ক্যারাভাজ্জিওরই শিষ্য।

—না, রঞ্জন। এ ছবি আমি নেব না। যদি জানতে পারি এটা দামি কোনও ছবি, তাহলে আমি ওনাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। কোনওভাবেই নেব না।

—আহা, সে কথার এখনই দরকার কী? আগে তো গিয়ে দেখ, কী বলেন!

আমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল রঞ্জন। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে এ ছবি ক্যারাভাজ্জিও-র আঁকা হলে বা দুর্মূল্য কোনও ছবি হলে আমি কোনওভাবে নেব না। ও কথা দিল যে এ ছবির কথা কেউ জানবে না। তবে এরকম কোনও ছবি ছিল কিনা সেটা জানার জন্যও খোঁজখবর নেবে। এ ব্যাপারে যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের পরে একদিন নিয়ে আসবে। আমি সেটাতে এখনই সম্মতি দিলাম না। জানালাম যে তার আগে আমি বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই।

পরের দিন আমি আবার ওই বাড়িতে গেলাম। অফিস ফেরত। যথারীতি ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে ছবি অবশ্য নিয়ে আসিনি। যদি সত্যি এ ছবি সে ছবি হয়, সেটা নিয়ে তো আর রাস্তায় ঘোরা চলে না। তবে আমার বিশ্বাস এটা খুব সাধারণ কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি। হতে পারে পুরনো। হতে পারে এর কোনও ইতিহাস আছে। আর সেটা জানতেই আসা।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে অবাক হলাম। বাঁদিকে ঘাসের লনে সেই রকিং চেয়ার দুলছে। অথচ কেউ নেই। ভিতরে সেদিনকার মতো মৃদু আলো জ্বলছে শুধু ড্রয়িংরুমে। মেন দরজার সামনে যেতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়েছে সেদিনকার সেই মধ্যবয়সি মহিলা। মহিলা মৃদু হেসে সম্ভাষণ করে বাঁ দিকে ড্রয়িংরুমের দিকে নির্দেশ করল। দেখি বৃদ্ধা ঠিক সেদিনকার মতোই বসে আছেন। ফায়ার প্লেসের দিকে মুখ করে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠলেন— কি ভালো আছ তো?

—হ্যাঁ, আমি আপনাকে না জানিয়ে এসে বিরক্ত করলাম। আসলে আপনি আমাকে যে ছবিটা দিয়েছিলেন তার সম্বন্ধে—

—ছবিটা ক্যারাভাজ্জিও-র আঁকা কিনা তাই জানতে চাও তো?— বৃদ্ধা আমাকে থামিয়ে বলে উঠলেন।

থমকে গেলাম। একটু থেমে কোনওরকমে বলে উঠলাম— হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ওটা ক্যারাভাজ্জিও-রই আঁকা। অন্তত তাই তো শুনেছি। আর এও শুনেছি এ ছবি অমূল্য। কয়েকটা কারণে। এক, এটাতে ক্যারাভাজ্জিও নিজেই আছেন। উনি নিজেকেই এঁকেছেন। দুই, ওনার আঁকার রহস্য খানিকটা হলেও এ ছবিতে তুলে ধরেছেন।

—কীরকম?

—উনি ওনার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এটা বোঝা যেত না, অত নির্ভুলভাবে ওনার ছবিতে আলো আর ছায়ার দাগ তুলে ধরতেন কীভাবে। এত নিখুঁতভাবে ছবির সাবজেক্টকে কীভাবে আঁকতেন। এটা একটা বিশাল রহস্য। বেশিরভাগ শিল্পী তাদের আঁকার কথা লিখে যান। উনি কিন্তু কিছুই লিখে রেখে যাননি। এ ছবি খুঁটিয়ে দেখলে দেখবে লোকটা যেদিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করছে, সেখানে একটা ছোট আয়না আছে। বাইরে থেকে আসা সূর্যের আলো ওই আয়নার উপরে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে লোকটার উপরে এসে পড়েছে। আয়না ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ছবির সাবজেক্টের উপরে নানানভাবে ফেলা সম্ভব হত। আর তাই আলোছায়ার শেডগুলো, মুখের এই অভিব্যক্তি এত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হত। এ ছবিতে ওনার আঁকার মেথড প্রমাণিত হয়। আর তাছাড়া এটাই বোধহয় ওনার আঁকা শেষ ছবি। আর তাই ওনার চোখে এই বিষণ্ণতা। দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে নয়, আলোর দিকে। হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে সারাজীবন অন্ধকার জগতে থাকলেও শেষ দিকে উনি আলোর জগতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন ভালো কাজের মধ্যে ফিরে আসার। আর তারই প্রতিফলন এই ছবি। আমাদের সবারই হয়তো কোনও না কোনও সময় তাই ইচ্ছে হয়। মনে হয় কীভাবে আলোর জগতে ফেরা যায়। তাই না?

—আমি কিন্তু এই ছবি আপনাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। আমার এত দামি উপহারের কোনও প্রয়োজন নেই।

—কেন? তুমি ভয় পাচ্ছ যে এটা চুরি করা ছবি? তোমাকে পুলিশ ধরবে, তাই? তোমাকে তাহলে এর ইতিহাস বলি। বলেছি না, আমার শ্বশুরমশাইয়ের হঠাৎ করে ভাগ্য ফেরে। এটা আমার শ্বশুরমশাই কেনেন এক পুরনো দোকান থেকে। যে বিক্রি করেছিল, সে ছবির কিছুই বুঝত না। জানতও না যে এ ছবির এত দাম হতে পারে। মাত্র ২০ ডাচ গিল্ডারে আমার শ্বশুরমশাই এটা কেনেন তার কাছ থেকে। তখন উনি নেদারল্যান্ডে থাকতেন। উনি কিন্তু এটার দাম ঠিকই বুঝেছিলেন। এক কথায় বলতে পারো জেনেশুনে ঠকিয়ে ছিলেন। উনি ভালো জিনিসের খুব বড় সমঝদার ছিলেন। আর ছবির ব্যাপারেও ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এভাবে আরও বেশ কিছু জিনিস উনি কেনেন, যার আসল দাম ছিল অনেক বেশি। আস্তে আস্তে আমার শ্বশুরের সমৃদ্ধি হয়। এ ছবিটা আর উনি বিক্রি করেননি। ওনার কাছেই রেখে দেন। তার অবশ্য একটা কারণও ছিল। উনি জানতেন এ ছবি বিক্রি করা অত সহজ হবে না। কারণ ততদিনে সারা বিশ্বের কাছে এ ছবির খবর পৌঁছে গেছে। বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।

নেদারল্যান্ডের নিয়ম অনুযায়ী তিরিশ বছর কোনও ছবি কারুর কাছে থাকলে সেই এ ছবির মালিক হয়ে যায়। উনি তার অপেক্ষায় থাকলেন। তখন আইনত বিক্রি করতে কোনও অসুবিধে হবে না। তিরিশ বছর কাটল। উনিও ছবির আইনত মালিক হলেন। কিন্তু তার দুদিন বাদেই মারা গেলেন। আমরা ততদিনে অবশ্য ইংল্যান্ডে চলে এসেছি। এরপরে ছবির মালিক হলেন আমার স্বামী। কিন্তু উনিও এ ছবি বিক্রি করলেন না। এটা আমাদের বাড়িতেই রয়ে গেল। তা তুমি এখন ছবি বিক্রি করতে পারো, কারণ আমার চিঠি অনুযায়ী তুমিই এখন এ ছবির মালিক।

—না, আমার টাকার কোনও দরকার নেই। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার জন্য যা করেছি, তা তো আমি কোনও পুরস্কারের লোভে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করব এ ছবি ফেরত নিয়ে নিন।

—তুমি এ ছবির দাম জানো তো? এ ছবি তোমাকে অবশ্য কোনও প্রাইভেট আর্ট কালেকটারকে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু এর দাম কত হতে পারে, তা হয়তো তুমি ভাবতেও পারছ না।

আমি মৃদু হেসে বলে উঠলাম,— জানি বলেই তো আর নিচ্ছি না। আমার সত্যিই টাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি এ ছবি ফেরত নিন। আপনি এটা কোনও আর্ট মিউজিয়ামে দান করে দিন, যাতে সবাই এ ছবি দেখতে পায়।

বৃদ্ধার মুখে এতক্ষণে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। বলে উঠলেন,— তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম। ঠিক হাতেই ছবিটা গেছে তাহলে। তুমি ওটা কোনও ভালো কাজে লাগিও। তোমাকে আমি আরও কিছু কথা জানাই। আমার স্বামী জনও খুব ভালো লোক ছিল না। ও এ ছবি একবার বিক্রিও করে। কিন্তু আসলটা নয়। এর হুবহু নকল। এ ছবি পঁচিশ মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করে এক বড় প্রাইভেট আর্ট কালেক্টারকে। আসল ছবি বিক্রি না করে অবিকল একইরকম একটা ছবি অন্য শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে বিক্রি করে। যিনি কেনেন, তিনি পরে বুঝতে পারেন যে ওনাকে ঠকানো হয়েছে। কিন্তু এমনিতেও এ ছবির কেনাবেচা খুব গোপনীয়ভাবে হয়েছিল, আইনত কেনা হয়নি, তাই ওনার পক্ষে কিছু করার উপায় ছিল না। শুনেছিলাম ওই লোকটা পরে ব্যাংকের দেনা না মেটাতে পেরে আত্মহত্যা করেছিল। আসল ছবিটা আমাদের কাছেই থেকে যায়।

বৃদ্ধা একটু থামলেন— দু-দুবার আমাদের পরিবার এ ছবিটা নিয়ে অন্যদের ঠকিয়েছে। আমি চাই না এ ছবি আমার কাছে রাখতে। সেদিন আমার ছেলে ম্যাটও এই ছবির খোঁজেই এসেছিল। কিন্তু আমি ওকে এর অন্য একটা নকল ছবি দিয়ে দিয়েছি। নিজের ছেলে তো!

চাইনি ওর মধ্যেও ওর বাবা ঠাকুরদার মতো খারাপ ভাবে অর্থ রোজগারের ইচ্ছা জেগে উঠুক। আমরা খুব বড়লোক হলেও, কখনও সুখের খোঁজ পাইনি। হয়তো আমরাও এ ছবি পাওয়ার পরে ওই ক্যারাভাজ্জিওর মতোই হয়ে উঠেছিলাম। আর ঠিক যেভাবে উনি শেষজীবনে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন, আমিও তারই চেষ্টা করছি এখন। নাও, এ ছবি তোমার কাছেই রেখে দাও। তোমার কাজে না লাগুক, তুমি এটা কোনও ভালো কাজে লাগিও।

আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বলে উঠলেন— আর আমি চাইলেও তো আর ফেরত নিতে পারব না।

—কেন? পারবেন না কেন? আইনত কোনও বাধা আছে?

কথাটা বলেই থেমে গেলাম। চোখের সামনেই বৃদ্ধা যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেলেন। ফায়ার প্লেসের আগুনটা জ্বলছে। মোমবাতিটা জ্বলছে। কিন্তু হঠাৎ করে উনি উধাও। ঘরে কেউ নেই। কাঠের চেয়ারটা ফাঁকা। কেউ বসে নেই।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। অন্য যে মহিলা আমার পিছনে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আমাকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিল, সেও নেই। আমি কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। ফায়ার প্লেসের উপরে ওনার শ্বশুরের ছবিটা চোখে পড়ল। সেদিনও দেখেছি। কিন্তু আগে লক্ষ করিনি। উনি সোফায় বসে আছেন। সোফার পিছনে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মহিলা, যে আমাকে দরজা খুলে দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল। সোফার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাটলার লিয়ন, যে আমাকে সেদিন সুপ খাইয়েছিল। সেই একইরকম চেহারা। একইরকম বয়েস। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বাইরে এসে অবাক হয়েছিলাম। সেই রকিং চেয়ার। সেটা তখনও একইভাবে দুলে যাচ্ছে। আর তাতেও কেউ নেই। কোনওরকমে একছুটে নুড়ি ফেলা পথ পেরিয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।

পরে বাড়ি এসে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে আমি যেদিন ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম, তার দুদিন বাদেই উনি মারা যান। অর্থাৎ আমি প্রথমবার ওনার বাড়ি যাই ওনার মৃত্যুর পরে।

তোমরা ভাবছ, ছবিটার কী হয়েছে, তাই তো? আমি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার আগেই ওখানকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ওটা দান করি। ওরা বিভিন্ন দেশের গরিব বাচ্চাদের সাহায্য করে। শুনেছিলাম ওরা ওই ছবিটা অনেক টাকায় এক আর্ট কালেকটরকে বিক্রি করেছে। আর সে টাকা দিয়ে বেশ কিছু বাচ্চার জীবনসংস্থান হয়েছে।

আমার মনে হয় আমরা সবাই এক আলোছায়ার জগতে থাকি। কখনও সেখানে আলো, কখনও সেখানে ছায়া। সুখের খোঁজে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখতেও ভুলে যাই। বুঝিও না যে ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছি। আমারও হয়তো তাই হত। ওই ছবিটাই আমাকে সেদিন আলোর সন্ধান দিয়েছিল।

আজ আমি তাই ভালো আছি। শুধু ওই রকিং চেয়ার ফোবিয়াটা বাদ দিলে।

কুয়াশা

এখন এখানে ভালোই ঠান্ডা পড়েছে। শীতের জাদুকরী ছোঁয়ায় লোকজন যেন উধাও হয়ে গেছে স্টেশন চত্বর, আশেপাশের রাস্তা থেকে। প্ল্যাটফর্ম ঘন কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গেছে।

এই স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়ায় না। শেষ লোকাল ট্রেন চলে গেছে খানিকক্ষণ আগে। সেই ট্রেন থেকে একজন লোক এসে নেমেছিল এই স্টেশনে। তারপরে প্ল্যাটফর্মের এককোণে থাকা ভাঙা বেঞ্চিতে এসে বসেছিল লোকটা। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। লোকটা যতই এই নাম না জানা স্টেশনের আধো-অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করুক না কেন, লোকটার ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু আছে, যা বলে দেয় এরকম অনুজ্জ্বল জায়গার জন্য যেন সে বেমানান।

স্টেশনের বাইরে একটা ছোট চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। লোকটা এগিয়ে গেল সেদিকে। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে। লোকটার পায়ে একটা দামি জুতো। পরনে দামি বিদেশি ব্র্যান্ডের প্যান্ট ও শার্ট। একটা পশমিনা শালে গা-মাথা ঢাকা। তবু এই ঠান্ডায় যেন কাঁপছে। মনে হয় লোকটা আন্দাজ করতে পারেনি এখানে এত ঠান্ডা পড়তে পারে।

লোকটা দোকানটার কাছে গিয়ে একটু অবাক হল দোকানি ছেলেটাকে দেখে। বছর বারোর ছেলে এত রাতে একা চায়ের দোকানে কী করছে! বলে উঠল

—চা হবে?

—হ্যাঁ। লেবু চা, না দুধ চা?

—দুধ চা-ই দে। তা তুই এত রাতে একা? এটা তোর দোকান?

—আমার বাবার ছিল। এখন আমি বসি।

—এত রাত অবধি এখানে তুই একা?

—অনেক সময় এখানে দু-এক জন চলে আসে অনেক রাতেও। তাই বসে থাকি।

—বাড়িতে কেউ নেই?

—মা আছে।

—তাহলে? এটা পড়াশোনার বয়স? তা না করে দোকানে বসে আছিস?

ছেলেটা একটু উদাসী হয়ে পড়ল। তারপরে বলে উঠল— এইতো কোভিড অসুখের জন্য আমার স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আর খুলল না। বাবাও মারা গেল। এখন শুধু মা আছে। সংসার চালাতে হবে তো?

—ও বুঝেছি।

দোকানের দেওয়ালে একটা ছবি রাখা আছে। সে ছবি দেখে লোকটা বুঝতে পারল এই হয়তো ছেলেটার বাবা।

—বাবা কীসে মারা গেল? কোভিডে?

না,—ছেলেটা আবার উদাস হয়ে গেল। তারপরে দূরে স্টেশনের লাইনের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল— ট্রেনে কাটা পড়েছিল।

—সে কী? কী করে?

—জানি না।— বলে থেমে রইল ছেলেটা। খানিকক্ষণ নীরবতার পরে ফের বলে উঠল— সবাই বলে সুইসাইড।

যেন থমকে গেল লোকটা। কী বলে সান্ত্বনা দেবে ছেলেটাকে?

—হঠাৎ করে? কী হয়েছিল?

—জানি না। মা বলেছিল চারদিকে অনেক ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল বাবার।

—কী করে?



—বাবা সবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'স্বপ্ন' না কী একটা সংস্থায় টাকা দিত। কিন্তু সে সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা আর সে টাকা ফেরত পায়নি। পাওনাদারেরা বাবার পিছনে পিছনে সবসময় ঘুরত। আমাদের বাড়িতে গিয়ে হানা দিত। ঝামেলা করত। বাবারও সব পুঁজি ওতে চলে গিয়েছিল। সব জমা টাকা। সেজন্যই হয়তো।

হাতটা কেঁপে গেল লোকটার। চা ছলকে উঠে জামার হাতায় লাগল। কোনও রকমের দোকানের সামনের কাঠের পাটাতনের কোনওটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এই 'স্বপ্ন' চিটফান্ডের জন্য গত পাঁচ বছর ও জেলে ছিল। এর জন্যেই একসময় সারা ভারত ওকে চিনত। সবাই জানত এই ফান্ডে টাকা রাখলে সে টাকা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। কিন্তু সে টাকা বাড়ানোর আড়ালের আসল রহস্যটা কেউ জানত না। শুরুর দিকে অনেকে তাদের টাকা ফেরত পেয়েছিল। কথামতো দু বছরে দ্বিগুণ। কিন্তু সেরকম তো আর চিরকাল চলতে পারে না। যখন আসল রহস্য সামনে এল, তখন সবাই টাকা ফেরত চাইল। সংস্থা-এর কয়েক মাস পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

জেলে যেতে হল। কিন্তু ভারতে ভালো ল'ইয়ারের পিছনে টাকা খরচ করতে পারলে বেশিদিন জেলে থাকতে হয় না। সেজন্য পাঁচ বছরের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু এ পাঁচ বছরে অনেক কিছুই পালটে গেছে। এলাকেও ওর কৃতকর্ম ভুলে গেছে। তবে ওর সেই 'স্বপ্ন' সাম্রাজ্য হারিয়ে গেছে। যারা ওকে ঈশ্বরের চোখে দেখত, তারাই এখন ওকে সামনে পেলে ছেড়ে দেবে না। অনেকে নিঃস্ব হয়ে গেছে। অনেকে জীবনের সব সম্বল হারিয়েছে এই চিটফান্ডে।

তবু টাকার জন্য নয়, এই হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতা, অপরাধবোধ যেন গ্রাস করেছে ওকে। সে জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গত কয়েকদিন। কিন্তু তারপরেও যেন ছেলেটার কাছে ধরা পরে গেছে ও। এ ছেলেটার এ অবস্থার জন্য ওই দায়ী! দোকানের এক পাশে পড়ে থাকা অঙ্কের বইটা মনে করিয়ে দিচ্ছে ছেলেটা কী হতে পারত! এরকম আরও কতজনের কাছে ও এখনও ধরা পরে যাবে! আদালতে জাজকে বলে বোঝানো যায়, কিন্তু নিজের কাছে যে বিচার হয়, সেখানে নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করবে কী করে!

লোকটার মাথা যেন ফের ঘুরে গেল। শক্ত করে দোকানের কাঠ ধরে নিজেকে সামলালো।

চায়ের দোকানের ছেলেটা উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল—শরীর কী খারাপ লাগছে? আজ রাতে কোথায় যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর সত্যি জানা নেই। ভারতজুড়ে অগুনতি বাড়ি আছে লোকটার। নানান নামে। কিন্তু সেখানে কোথাও আর যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আজ যেন মনে হচ্ছে সত্যি আশ্রয়হীন।

ছেলেটা লোকটার হাত ধরে নিয়ে এসে স্টেশনের বেঞ্চিতে বসাল। তারপরে বলে উঠল—আমাদের বাড়ি থাকলে তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতাম। এখন মা একটা এলাকের বাড়ি কাজ করে। আমি ওখানে গিয়েই রাতে থাকি। আমাদের নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

মৃন্ময়বাবু এতটা লিখে থামলেন। পেনটা খাতার উপরে রেখে চারদিকে তাকালেন। যেন এক ঘোরে মধ্যে ছিলেন। বীণা কোথায় গেল! পড়ার টেবিলের পাশে চায়ের কাপটা এতক্ষণ পড়ে আছে।

তারপরেই খেয়াল হল বীণা আসবে না। বীণা, ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন এক মাস আগে। দীর্ঘ আটচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সব রুটিন যেন থেমে গেছে হঠাৎ করে। সব যেন তারপর থেকে অন্যরকম লাগছে। যেন কোনও কিছুই ভালো লাগছে না।

চারদিকের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন আরও। ফ্ল্যাটের সঙ্গে এক চিলতে ছোট বারান্দা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। পাশের বাড়ির ছাদের কারনিসে একটা বেড়াল চুপ করে বসে আছে। মাথার উপরে বর্ণহীন ঘোলাটে মন খারাপের আকাশ যেন ওঁর নিজের মতোই থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

রান্নাঘরে গিয়ে চা করলেন। তারপর অশক্ত অনভ্যস্ত হাতে আনমনে রান্নার জায়গাটা একটু মুছে নিলেন। চুপ করে তাকিয়ে রইলেন রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। বহু বছর কাটিয়েছেন এ ভাড়ার ফ্ল্যাটে। নিজের ফ্ল্যাট হয়নি এরকমই একটা চিটফান্ডের খপ্পরে পরে। কিন্তু এ ফ্ল্যাটও এখন ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে। কে খেয়াল রাখবে এখানে ওঁর উপরে! বয়স হয়েছে। তাছাড়া বাড়িওয়ালাও চাইছে ভাড়া বাড়াতে। এসব ভেবে উনি ফ্ল্যাট ছেড়ে দুদিন বাদে উনি চলে যাবেন বৃদ্ধাশ্রমে।

পড়ার ঘরে এসে বই এর আলমারির দিকে সস্নেহে তাকালেন। এসব বই-এর মধ্যে থেকে কিছু বই নিয়ে যাবেন। আলমারির উপরে বহুবছর আগে ওঁর জীবনে পাওয়া এক মাত্র সাহিত্য পুরস্কার। সেটা না নিলেও হবে। ফ্ল্যাটের চারদিকে এখনও বীণার স্মৃতি।

আবার পড়ার টেবিলে এসে বসলেন। বসে খাতা, পেন তুলে নিলেন।

প্ল্যাটফর্মে এখনও ঘন কুয়াশা। ছেলেটা বেঞ্চিতে ওই লোকটার পাশে এসে বসেছে। লোকটাকে ওর স্কুলের গল্প বলছে। ওর বন্ধুদের গল্প। লকটা মন দিয়ে সে গল্প শুনছে। ছেলেটা আর কোনওদিন স্কুলে যাবে না।

ওরা দুজনেও মৃন্ময়বাবু মতোই একা।

ওরাও মৃন্ময়বাবুর মতো অসহায়, আশ্রয় খুঁজছে এক অনিশ্চিত কুয়াশাঘন রাতের মধ্যে।

অতিথি

ডোরবেলটা বেজে উঠল। পরপর দু'বার। কে না জানে দরজা খোলা বারণ! তাই দিপু দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

উত্তর এল না। বেলটা আবার বেজে উঠল। আবার চেঁচিয়ে উঠল দিপু, 'আমি একা আছি, বাবা-মা বাড়িতে নেই। নাম না বললে খুলব না। কে?'

উত্তর নেই। নাহ, এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি দিপুর। উলটো দিক থেকে সাড়া তো আসেই। আচ্ছা, ঋক মজা করছে না তো? চেয়ার টেনে তার উপর উঠে আইহোলে চোখ রাখল দিপু।

পরিষ্কার বোঝা না গেলেও দরজার বাইরে আধো অন্ধকারে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর যে বেশ বয়স হয়েছে তা বুঝতে সময় লাগল না দিপুর। ধুতি পরা। নাহ, ডাকাত অন্ত নয়। ডাকাতরা কি আর বুড়ো হয়?

তবু ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে দরজা খুলল ও। বাবা বলেন, সাবধানের মার নেই। ডাকাত হলে র‍্যাকেটটা দিয়ে ধাঁই করে এক মারে কাত করে ফেলবে দিপু। নাহ, সেরকম কিছু করতে হল না। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে দিপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে একটু এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এটাও না।'

'কী না দাদু?' ফস করে দাদুই বলে বসল দিপু।

'নাহ, এটাও আমার ফ্ল্যাট নয়। এখানেই কোথাও...' বলে মাথা নিচু করে দু'দিকে দু'বার নাড়লেন লোকটি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

অদ্ভুত তো! নিজের বাড়ি কোথায় জানেন না? দিপুর কেন জানি বেশ কষ্ট হল। ওরও একবার এরকম হয়েছিল গতবার পুজোতে ঠাকুর দেখতে গিয়ে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আধঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরেছিল। তারপর ওকে কাঁদতে দেখে একজন এগিয়ে আসে। মাইকে অনেক অ্যানাউন্সমেন্ট করার পর দশ মিনিট বাদে বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া গেল। তখন দিপুর কী রাগ। আরও বেশ খানিকক্ষণ কেঁদেছিল ও।

'দাদু, ও দাদু!' আবার চেঁচিয়ে ওঠে দিপু।

লোকটি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘুরে তাকালেন দিপুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলেন।

'আমাকে ডাকছিলে, খোকা?'

'হ্যাঁ, দাদু। ডাকছিলে, খোকা?'

'হ্যাঁ, দাদু। তুমি ভিতরে এসে বোসো। তা হলেই তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ে যাবে।'

লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন কে জানে। তারপর চটি পরেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দিপুও প্রায়ই এটা করে, আর তার জন্য বকাও খায়। দাদু ধীর পায়ে হেঁটে এসে সোফায় বেশ আরাম করে বসে পড়লেন। এতক্ষণে চেহারাটা ভালো করে খেয়াল করল দিপু। রোগা, ক্ষয়াটে। চোখ একটা বড় কালো ডাঁটির চশমা। মুখে-চোখে কেমন যেন উদাস ভাব। গালভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখও ভালো করে ধোয়া নয়। মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খাননি।

ঠিকই ধরেছে দিপু। দাদুর নির্ঘাত খুব খিদেই পেয়েছে। তা না হলে কিছু না বলে সামনের টেবিলে রাখা দিপুর আধখাওয়া কলাটা ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে খেতে শুরু করেন! দিপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একমনে কলাটা শেষ করে দাদু আবার এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখছেন। মনে হচ্ছে, আরও কিছু খাওয়ার ইচ্ছে।

'দাদু, আরও কিছু খাবে?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেন লোকটি। তারপর আবার দৃষ্টিহীন চোখে সামনের শো-কেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কলা, বিস্কিট, চকোলেট এনে একটা প্লেটে করে দাদুকে দিলে দিপু। নিজের খাবার নিজে নিয়ে খাওয়ার অভ্যেস নেই ওর। আর কারও জন্য নিয়ে আসা? ভাবাই যায় না।

দাদু খান। সেই ফাঁকে প্রিয় টিভি শো কী দেখতে শুরু করল দিপু। সিনচ্যানের একটা বেশ মজার মুভি হচ্ছে। সিনচ্যান একটা ম্যাজিক বল পেয়েছে কোত্থেকে। সেটা হাতে নিলেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে ও। দেখতে-দেখতে ঘরে উপস্থিত দাদুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দিপু। খানিকবাদে তাকিয়ে দ্যাখে, দাদুর প্লেট একেবারে পরিষ্কার। সোফায় পা তুলে বসে ঘাড় হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন দাদু।

মুশকিল, সত্যিই মুশকিল। মা-বাবা যদি জানতে পারেন যে, একটা অজানা-অচেনা লোককে এভাবে ঘরে ডেকে আনা হয়েছে, তা হলে পরের দিন থেকে দরজার বাইরে গেটেও তালা পড়ে যাবে।

'দাদু, ও দাদু, তুমি বাড়ি যাবে না?'

বেশ খানিকটা ধাক্কাধাক্কির পর দাদু চোখ খুললেন। তারপর একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে, অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আচ্ছা বিপদ! যাকগে, বাবা-মায়ের আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। নিশ্চিন্তে আবার সিনচ্যানের সিনেমাটা দেখতে বসে গেল দিপু। ঘণ্টাদেড়েক বাদে আবার খেয়াল হল। দাদু ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসেছেন। টেবিলের উপরে রাখা দিপুর স্কুলের ওয়ার্কবুক আর পেনসিলটা নিয়ে কী সব আঁকিবুকি কাটছেন। উঁকি মেরে দেখল দিপু। একটা রোগা ছেলে আর একটা মোটা ছেলের ছবি আঁকছেন দাদু। দিপুর মতো অবশ্য অত ভালো আঁকার হাত নয়। কী করে হবে? দিপু তো আঁকার মাস্টারমশাইয়ের কাছে আঁকা শেখে। দাদু কি শেখেন? নিশ্চয়ই নয়।

বাবা বলেন, আঁকা শিখতে অনেক টাকা লাগে। দাদুর কি আর অত টাকা আছে। না বোধ হয়। তা হলে কি আর ওরকম নোংরা ধুতি আর একগাল দাড়ি হয় নাকি?

'দাদু, ও দাদু, তুমি ওর ছবি আঁকতে পারবে?'

'কার সোনা?' আস্তে-আস্তে বলেন দাদু। ডাকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আপনার টান আছে।

'ওই-ওই যে, টিভিতে দেখছ না সিনচ্যান? ওই ছেলেটার।'

'অ,' বলে আবার মাথা নিচু করে পেনসিলের আঁচড় দিতে শুরু করলেন দাদু আগের ছবিটাতেই। সেই মোটা ছেলেটির মাথায় একটা টুপি আঁকছেন। দিপুর একটু রাগই হয়।

'কী দাদু, সিনচ্যানকে আঁকবে না?'

'না।'

'কেন? তোমার ছবির ওই ছেলে দুটো তো বিচ্ছিরি। সিনচ্যানকে অনেক ভালো দেখতে। জানো তো, ও ভারী দুষ্টু। বাবা-মা না থাকলেই নানা দুষ্টুমি করে। ওর আবার এক বোন আছে।'

সিনচ্যানের গল্প বলতে থাকে দিপু। ছবির থেকে মুখ সরিয়ে দিপুর দিকে তাকিয়ে থাকেন দাদু। বেশ খানিকক্ষণ শোনার পরে আবার আঁকার দিকে মন দেন। দীপু এবার ভীষণ বিরক্ত হয়। দাদু তো কথাই বলতে চান না।

এবার লুডো নিয়ে আসে দিপু। এই লুডোটা বাড়িতে পড়েই থাকে। খেলার লোক নেই। কতদিন বাবা আর মাকে সাধাসাধি করেছে। কিন্তু ওঁদের কোনও আগ্রহ নেই।

'দাদু, খেলবে লুডো? সাপলুডো?'

'হ্যাঁ,' এতক্ষণ বাদে বেশ জোরে উত্তর পায়। যাক, দাদুটা তা হলে অতটা বোরিং নয়।

'কিন্তু,' একটু ভেবে দাদু বলেন, 'আমার সবুজ ঘুঁটি চাই, সবুজ ঘুঁটি।'

দিপু রাজি হয়। লাল ঘুঁটিই ওর বেশি পছন্দ।

খেলা এগোয়। সাপ, সিঁড়ি নামা, ওঠা। দাদু কখনও-কখনও হাসছে। কখনও বা সাপের মুখে পড়ে ব্যাজার হয়ে বসে থাকছে।

খেলতে-খেলতে দিপু বলে, 'দাদু, তোমার বাড়ি কোথায়?'

দাদু মুখ তোলেন। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে ওঠেন, 'এটা না?'

'না দাদু, এটা তো আমাদের ফ্ল্যাট। আমি, মা, বাবা থাকি। ওঁরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন। সিনেমা দেখতে গিয়েছেন।'

'তা, আমাকে ওরা থাকতে দেবে না, তাই না?'

দিপু ভারী চিন্তায় পড়ে যায়। মাসি মাঝেমধ্যে এসে থেকে যায়। ড্রাইভার কিশোরকাকু, সেও কখনও-সখনও থাকে বটে। কিন্তু দাদু?

'তুমি কি কোনও কাজ জানো দাদু?'

'না', সংক্ষেপে উত্তর দেন দাদু।

'তা হলে তোমাকে থাকতে দেবে না। কাজ জানে না, এরকম লোকদের ওরা থাকতে দেয় না। এই তো দ্যাখো না, আমার ঠাম্মা। তারও তোমার মতো অনেক বয়স। কিন্তু ঠাম্মার শরীর খারাপ, শুধু শুয়ে থাকে। তাই দূরে একটা বাড়িতে থাকে।'

'তোমার দাদু?' এতক্ষণে দিপুর কথা শুনছেন বলে মনে হল।

'নেই, আমি দেখিইনি।'

'হুঁ, বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর তারপরই এক ছক্কা দুই পেয়ে সরাসরি নব্বইয়ের ঘরে উঠে যান দাদু। ভারী খুশি হয়ে বলে ওঠেন, 'আর মোটে একটা সাপ।'

'দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি', বলে বেশ খানিকক্ষণ নাড়িয়ে ছক্কাটা ফ্যালে দিপু। না, ফের দুই। পুট পড়লেও একটা সিঁড়ি পেত দিপু।

'দাদু, তোমার বাড়ি নেই?'

খানিকবাদে দাদু বলে ওঠেন, 'আছে, খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তা তোমার কাছে অ্যাড্রেস নেই?'

'থাকার কথা, তাই না?' বলে পাঞ্জাবির পকেটে হাতড়ান দাদু।

'দাঁড়াও, আমি দেখছি,' বলে দিপুও দাদুর পকেটে হাত ঢোকায়।

'এই, এই তো দাদু, তোমার পকেটে একটা কাগজ। কিন্তু তোমার কাছে টাকা, মানিব্যাগ এসব নেই।'

দাদুর অবশ্য তাতে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তিন ফেলে শেষ সাপটাও পেরিয়ে আটানব্বইয়ে পৌঁছে খুব খুশি-খুশি ভাব। দিপু কাগজটায় চোখ বোলায়। ইংরেজিতে লেখা।

'দাদু, তোমার আর চিন্তা নেই। অ্যাড্রেস পেয়ে গিয়েছি। আমি এখনই বিল্টুদাকে ডাকছি। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। ও সব জায়গা চেনে। তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে।'

দাদুর মুখে তবু হাসি নেই। শুধু বলে ওঠেন, 'কোনও বাড়ি?'

'ওই দ্যাখো, নীচে দমদমও লেখা আছে। তার মানে এখান থেকে দূরে নয়।'

দাদু পিছনে হেলান দিয়ে বসেন। 'বাড়ি?' আস্তে-আস্তে বলতে থাকেন, 'সেখানে গাছ ছিল, পুকুর ছিল, কত লোকজন ছিল। আমরা বটগাছের তলায় বসে গল্প করতাম, মাঠে ফুটবল খেলতাম, ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম। এটা বাড়ি নয়। এখানে লোক নেই, কেউ নেই। শুধু কতকগুলো চেয়ার, খাট, আলমারি...।' দাদু বলতে থাকেন। দিপুও অবাক হয়ে শুনতে থাকে।

খানিকবাদে দিপু বলে, 'তা দাদু, তোমার আগের কথা এত মনে আছে, আর বাড়ি কোথায় তা মনে নেই?'

দাদু বলে ওঠেন, 'এখনকার কথা মনে থাকে না। কেমন যেন সব হারিয়ে যায়। ঠিক যেমন ওরাও হারিয়ে গিয়েছেন।'

'কারা দাদু?'

চুপ করে থাকেন দাদু। খানিকবাদে বলে ওঠেন, 'সবাই, মন্টু, সন্তু, সবাই।'

আধঘণ্টা বাদে দিপু বিল্টুদাকে ডাকে। বিল্টুদা দিপুর চেয়ে অনেক বড়। সবে কলেজে ঢুকেছে। আজ বাড়িতেই ছিল। বিল্টুদা আসার পরে দিপু ওর সঙ্গে দাদুকে নিয়ে বেরোয়। বেশি দূরে নয়। ওদের কমপ্লেক্সের উলটোদিকেই একটা গলি আছে, সেখানকারই অ্যাড্রেস। বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগে না। একটাই বিল্ডিং, অনেকগুলো ফ্ল্যাট। একতলার পিছনের দিকের ফ্ল্যাটটা দাদুর।

বেল বাজাতে একজন লোক বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হয়, কাজের লোকই হবে। দাদুকে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'সকাল থেকে আপনাকে আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। রান্না করে এসে দেখি, আপনি আর বারান্দায় নেই। বায়না করছিলেন বলে বাইরে চেয়ার টেনে বসতে দিয়েছিলাম। আর দেব না। দাদাবাবুকেও এই ফোন করলাম। উনিও ভারী চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। কী যে করেন না! কতবার বলেছি, বাড়ি থেকে বেরবেন না। ভুলো মানুষ, ডাক্তার একা বেরতে বারণ করেছেন।'

দাদু কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকেন অপরাধীর মতো। দাদুর কাজের লোকের নাম ভগীরথ। দিপুরা জানতে পারে যে, দাদু একাই থাকেন এখানে। প্রায় তিন বছর। দুই ছেলেই বাইরে থাকে। এখনকার কোনও কথা দাদুর খেয়াল থাকে না। সব ভুলে যান। তাই সব সময় সঙ্গে ঠিকানা রাখা থাকে।

এসব কথার মধ্যে দাদু আবার বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। হাতে একটা পাতলা কমিকসের বই। বইটা দিপুর হাতে দিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'পড়ো, আমার আঁকা।'

বিল্টুদা বইয়ের দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল, 'আপনিই সনাতন চৌধুরী? আপনার কত বাংলা কমিকস পড়েছি একসময়।'

দাদু হাসেন। তারপর দিপুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার টিভির ওই ছেলেটির চেয়ে আমার এই ছেলেগুলো অনেক ভালো।'

'দাদু, তুমি আবার আসবে আমাদের বাড়িতে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন দাদু। তারপর ভগীরথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, 'দরজা খোলা পেলেই।'

কারিগর

রহিম খুব ভালো পুতুল তৈরি করে। আগে কাগজে ও সে পুতুলের একটা ছবি এঁকে নেয়। ঠিক করে নেয় ঠিক কীরকম দেখতে হবে সে পুতুলকে। সে পুতুল ঠিক কীরকম পোশাক পরবে। স্কারট, না শাড়ি না কী জিন্স। ঠিক কীরকম চুলের স্টাইল হবে। নাক, চোখ, মুখ,ঠোঁট — ঠিক কীরকম হবে। কীরকম উচ্চতা হবে। তারপরে ঠিক সেরকম ভাবে পুতুলের জন্য পোশাক তৈরি করে।

মাটি দিয়ে সে পুতুল বানায়। সারা হাতে মাটি মেখে বারবার পুতুলের গায়ে হাত বোলায়। নিখুঁতভাবে তৈরি করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেটে যায়। সিল্কের সুতো দিয়ে চুল তৈরি করে। নানান জিনিস দিয়ে চোখ, চোখের মণি তৈরি করে। ক্যালিপার, আলুমিনিয়ামের তার, স্টিলের তার, কাঠের ছুরি, নানানরকম কাঠের, বাঁশের যন্ত্র দিয়ে নিখুঁত আঁচড়ে পুতুলের শরীর, নাক, চোখ, মুখ ঠিক করে।

এক একটা পুতুল তৈরি করতে দু-তিন মাস লেগে যায়। এগুলো ও বিক্রি করে না। এগুলো শুধু ওরই জন্য।

বাড়ির মধ্যে পরপর বন্ধ কাচের ঘরে পুতুলগুলোকে পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। পুতুলগুলো নানান সাইজের হলেও কাচের ঘরগুলো একই সাইজের হয়। এর জন্য অবশ্য ওর বাড়িতে অনেকটা জায়গা লাগে। তবে তাতে ওর অসুবিধে নেই। ওদের খুব বড় পারিবারিক ব্যবসা। তা ছাড়া বংশানুক্রমে প্রচুর অর্থ সম্পত্তি পেয়েছে। পায়ের উপরে পা তুলে বসে থাকলেও তিন প্রজন্ম কাটিয়ে দিতে পারে অনায়াসে।



মাঝেমধ্যে ওর বাড়িতে যখন বন্ধুবান্ধব- ইয়ারদোস্তরা আসে, তখন তাদের ও এই ঘরে নিয়ে আসে। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরে থেকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ অবিশ্বাসী চোখে বলে ওঠে —কী বলছ এগুলো শুধুই পুতুল! এত ঠিক মানুষের মতোই দেখতে? মনে হয় যেন এখনই কথা বলে উঠবে!

—হ্যাঁ, হঠাৎ করে নড়ে উঠলে অবাক হব না— পাশ থেকে আরেকজন বলে ওঠে।

—ওরেবাবা, হঠাৎ করে নড়ে উঠলে হার্টফেল করব। তবে যাই বলিস, তোর পুতুলগুলো সবাই খুব সুন্দরী। একটু অন্যরকম সুন্দরী। পারলে আমার বউকে এখানে রেখে এদের নিয়ে

যাব।— ওর আরেক বন্ধু বলে ওঠে।

রহিম হেসেছিল। এদের একটু অন্যরকম দেখতে কেন, রহিম তা জানে। রহিম ওদের সবাইকে তৈরি করেছে, ঠিক ওর পছন্দ মতো। তাই ওদের চোখ সবার খয়েরি রঙের, সবার ঠোঁট একটু অন্যরকমের— হার্টশেপের।

আরেকটা কারণেও হেসে ছিল। তবে সেটা ও অন্য কাউকে জানাতে পারবে না কখনও।

রোজ বেশ কিছুটা সময় রহিম পুতুলগুলোর সঙ্গে কাটাতো। তখন এক এক করে সব পুতুলের ঘরে যেত রহিম। জড়িয়ে ধরত। সে আশ্লেষ ও উপভোগ করত। এত সহজে পুতুলগুলো ওর কাছে আত্মসমর্পণ করত যে ও এক বিশেষ শ্লাঘা, উত্তেজনা অনুভব করত। পুতুলগুলো ছিল ওর সম্ভোগের যন্ত্র, ওর বিকৃত কামুক ইচ্ছে চরিতার্থ করার উপায়। পুতুলগুলোর মধ্যে এমন সব যন্ত্র লাগিয়ে ছিল যে তারা হাত পা সামান্য নাড়তে পারত। সামান্য কথা বলতে পারত। একটু একটু করে হাঁটতে পারত। সেভাবেই ওদের তৈরি করেছিল ও।

ওর কাছে ওই পুতুলগুলো ছিল জীবন্ত। ও জানত ওর মতো পুতুল আর কেউ তৈরি করতে পারবে না। ও হল সেরা কারিগর।

ওই মেয়ে পুতুলগুলো ঠিক কী কী কথা বলবে, তা ওই ঠিক করে দিত। তাদের ব্যাকরণে ঠিক কী শব্দ থাকবে, সেটা ও বলে দিত। তারা ঠিক কীভাবে হাসতে পারে, কখন হাসতে পারে সেটা ও ঠিক করে দিত। ওর ইচ্ছেমতো কিছু না হলেই ও পুতুলগুলোকে শাস্তি দিত। হাতের আঙুল ভেঙে দিত। শরীর ছুরি দিয়ে চিরে দিত। ও নিজে এই অকারণ অত্যাচার করে আনন্দ পেত।

কিন্তু ও জানত ঠিক ওর মতো করেই শুধুই ওর জন্যেই এসব পুতুল তৈরি। ও চেয়েছিল এই পুতুলগুলোর জগতের সম্রাট হয়ে থাকতে। তাদের ওর রাজত্বে বন্দি করে রাখতে। ও চেয়েছিল ওদের জন্ম-মৃত্যু সবকিছু যেন আবর্তিত হয় ওকেই কেন্দ্র করে। ওর কামুকতা চরিতার্থ করার জন্য।

সেদিন একটা পুতুলের ঘরে ঢুকেই ও বুঝল পুতুলটা ঘরের মধ্যে নিয়ম ভেঙে হেঁটেছে। শুধু তাই নয়, কাচের ঘরের থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। সেটা দেখে ও পুতুলটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। চুল ধরে টেনে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। হাত ভেঙে দিল, কান-নাক ভেঙে দিল। তার পর পুতুলটার পোশাক খুলে নিয়ে তার শরীর নিয়ে উপভোগের আনন্দে মেতে উঠল ঘণ্টাখানেক।

ও চেয়েছিল বাকি সব পুতুলগুলোকে দেখাতে, কেউ পালাতে চাইলে তাদের কী হতে পারে। শেষে যখন থামল, তখন ওই পুতুলটার শরীরের মাটির টুকরো শুধু এদিক ওদিক মেঝেতে পড়ে আছে।

এরপর বাকি পুতুলগুলোও খুব ভয় পেত রহিমকে। তারা ঠিক সেটাই করত, সেটাই বলত, যা রহিম চাইত। তারা আগে থেকে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত রহিম কখন আসবে। তখন তাকে খুশি করতে পারবে কিনা।

রহিমের এক কাজের লোক ছিল। নাম তার রূপম। রূপমের উপরে দায়িত্ব ছিল ওই কাচের ঘরগুলো পরিষ্কার করার। রূপম জানত না যে এই পুতুলগুলোর প্রাণ আছে। রহিমের পুতুলগুলোর উপরে কড়া আদেশ ছিল যে ওর সামনে ছাড়া অন্য কারও সামনে যেন পুতুলগুলো না নড়ে-চড়ে, কথা না বলে। সেরকম করলেই সেই পুতুলকে ভেঙে ফেলা হবে। কখনও তাই পুতুলগুলো নড়ত না, কথা বলত না রূপমের সামনে। রূপম ভাবত এগুলো সবই শুধুই মাটির পুতুল।

ও যখন কাচের ঘর পরিষ্কার করত, অবাক হয়ে দেখত এদের। কী নিখুঁত দেখতে এদের। কী সুন্দর। কিন্তু সে দৃষ্টিতে যেন ভয় মিশে আছে। ও অবাক হয়ে দেখত, আর ভাবত এত সুন্দর পুতুলগুলোর চোখে-মুখে-দৃষ্টিতে কেন এত বেদনা মিশে আছে। কেন ওরা সবাই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! যেন সব ফুল ফোটার আগেই সে গাছে পোকা ধরে গেছে।

এসব সত্ত্বেও বিশেষ করে একটা পুতুল ওর খুব পছন্দের ছিল। ও রোজ তার কাচের ঘরের সামনে এসে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকত।

তার কালো বড় দীঘল মায়াবী চোখের দিকে তাকিয়ে ও যেন কোথায় হারিয়ে যেত। যেন সে পুতুল ওকে কিছু বলতে চায়। সেই পুতুলের সামনে এলে সময় যে কীভাবে কেটে যেত বুঝতে পারত না। মনে হত ও যেন আস্তে আস্তে ওই পুতুলকে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে তার বেদনার কথা, তার বন্দিদশার যন্ত্রণার কথা। ওর যদিও ওই কাচের ঘরের মধ্যে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। তাই দরজার বাইরে থেকেই তাকিয়ে থাকত বিভোর হয়ে। ওকে মুগ্ধ করত সে পুতুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নারীসত্তা, রহস্যময়তা আর চোখের মনির আড়ালে লুকিয়ে থাকা দিঘির জলের মতো গভীর দৃষ্টি।

একদিন পরিষ্কার করতে গিয়ে ও খুব অবাক হল। সেই পুতুলটার চোখে যেন জল। চোখের নীচে কালি। গালে একটা কাটা দাগ। হেলে একদিকের কাচের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি করে কাচের দরজা খুলে পুতুলটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন পুতুলটার হাতে হাত পড়তেই যেন ওর সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। এ যেন এক

মহিলার নরম হাত। ও সেই পুতুলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ওর যেন মনে হল খুব আপন কারও হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর আবার তাড়াহুড়ো করে কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ও জানে রহিম জানতে পারলে ওকে তখনই মেরে ফেলবে।

কিন্তু এরপর থেকে রোজ যখন আসত, একবার করে ওই পুতুলের হাত একবার করে ধরত। মনে হত যেন নিজের খুব আপন কারও হাত ধরেছে। একটা জিনিস ওর অবাক লাগত, যখন দেখত পুতুলটার চোখের নীচের কালি আর নেই। মুখ উজ্বল, ঠোঁটের কোণে হাসি এলগে আছে।

এ কী ওর চোখের ভুল?

একদিন যখন ও পুতুলটার হাত ধরেছে, ও স্পষ্ট শুনল কে যেন মিহি গলায় বলে উঠেছে — আমাকে তুমি নিয়ে যাবে?

ও আশেপাশে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল। কে, কে বলল কথাটা! কিন্তু কাছাকাছি আর কেউ নেই। তাহলে! কে বলতে পারে এরকম ভাবছে, এরকম সময়ে পুতুলটার ঠোঁট আবার নড়ে উঠল—আমাকে তুমি এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে?

পুতুলটা ফের বলে উঠল,— আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চাই। এখানে আর থাকতে চাই না।

ভয়ে কেঁপে উঠল রূপম। ও কী পাগল হয়ে গেছে!

কী করে একটা পুতুল ওর সঙ্গে কথা বলতে পারে। হঠাৎ ও খেয়াল করল পুতুলের হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরেছে ওর হাতের আঙুলগুলো।

ফের শুনতে পেল ওই পুতুল ওর কাছে সরে এসে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এনে বলছে,— তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? আমার এখানে থাকতে ভালোলাগে না। আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তোমার দিকে তাকালেই যেন আমি আমার প্রাণ ফিরে পাই। সত্যিকারের প্রাণ।

ও থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠল—

—কিন্তু রহিম তোমায় তৈরি করেছে। ও তোমাদের সবার স্রষ্টা।

—না, রহিম নয়, তুমিই আমাদের প্রাণ দিয়েছ। তুমি যেভাবে আমাকে স্পর্শ করো, যেভাবে আমার দিকে তাকাও, তার থেকেই আমি প্রাণ পেয়েছি। রহিম যখন আসে, তখন আমি চোখ খুলেও বন্ধ করে রাখি। আর তুমি যখন আসো, তখন মনে হয় শুধু তোমাকেই দু-

চোখ দিয়ে দেখি। আমাদের দেখে বাকিরাও বুঝতে পেরেছে ভালোবাসা কী। আমরা সবাই আগে মৃতই ছিলাম। আমরা সবাই তোমার জন্যেই এখন প্রাণ পেয়েছি।

কিন্তু রূপম জানত ওর পক্ষে পুতুলটাকে নিয়ে পালানোর উপায় নেই। রহিম ও রহিমের বাড়ির অজস্র পাহারাদারেরা ওদের ঠিক ধরে ফেলবে। জানতে পারলেই মেরে ফেলবে। তবু এর পরে মাঝেমধ্যে ও এসে পুতুলটার কাচের বাক্সের দরজা খুলে কাছে গিয়ে মনের কথা বলত। আর সেই সামান্য সময়টুকু যেন সেই পুতুলটার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যেন রূপমকে দেখলেই দূরে চলে যেত পুতুলটার অনুক্ষণের নীরবতা, অবহেলা, শৈত্য। সব অনুচ্চারিত ভালোবাসার শব্দ যেন আপনা থেকে ওরমুখ থেকে বেরিয়ে আসত।

পুতুলটা টের পেত তার শারীরিক সব সংকেত যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে রূপম কাছে এলেই। শুকনো পাতার স্তূপের কাছে আগুন আনলে যেরকম হয়। যেন সব বিবর্ণতা মুহূর্তে দূরে সরে যেত। ও বার বার হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইত রূপমকে।

একদিন এরকমই এক সময়ে পিছন থেকে রহিমের ডাকে চমকে উঠল ও। পিছনে রহিম এসে দাঁড়িয়েছে।

রাগে উত্তেজনায় রহিম চিৎকার করে উঠল—কী করছিস তুই ওখানে! আমার পুতুলের কাছে গিয়ে। কী করে এত সাহস হল ওই কাচের পুতুলঘরে ঢোকার!

কিছু বলার সুযোগ দিল না রহিম। চুল ধরে টানতে টানতে বার করে আনল রূপমকে। রহিমের বেল্টে একটা রিভলভার থাকে। সেটা বার করে গুলি করল রূপমকে। রূপম মাটিতে পড়ে গেল। তবু থামল না রহিম। পরপর বেশ কয়েকটা গুলি চালালো যতক্ষণ না রূপমের মৃত্যু সম্বন্ধে ও নিশ্চিত হয়।

তারপরে ইচ্ছে করে পুতুলগুলোর সামনেই ফেলে রাখল রূপমের মৃতদেহ।

আবার করে রহিম বলে উঠল সব পুতুলদের— দেখো, নিয়ম ভাঙলে কী হয়, দেখো। এখানে সবকিছু ঠিক সেভাবেই চলবে, আমি যেরকম চাইব। যে এই নিয়ম ভাঙবে, তার ঠিক ওই দশাই হবে। কেউ যদি এই কাচের ঘর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করে, তার তখনই মৃত্যু। আমি যা বলব ঠিক তাই অক্ষরে অক্ষরে শুনতে হবে তোমাদের। না হলেই মৃত্যু।

রহিম সেদিনও সব পুতুলগুলোকে নিয়ে মেতে উঠল ওর সম্ভোগের খেলায়। সেদিন যদিও ওর মনে হল পুতুলগুলো যেন আরও বেশি শীতল হয়ে গেছে। সব যন্ত্রগুলো হয়তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন রাতে রহিমের ঘুম হঠাৎ সামান্য শব্দে ভেঙে গেল। কে যেন এসে ঢুকেছে ওর ঘরে। ও চমকে উঠে বসল। দেখল সেই পুতুলটা, যেটা রূপমের হাত ধরেছিল। কিন্তু সে কী করছে এখানে!

আলো জ্বালতে দেখল পুতুলটার দুর্বল কাঁপা ডানহাতে একটা রান্নার ছুরি চকচক করছে।

এত বড় সাহস ওকে মারতে এখানে এসে গেছে।

ও উঠে রেগে গিয়ে ধাক্কা দিল পুতুলটাকে। পুতুলটা ছিটকে ঘরের এক কোণে গিয়ে পড়ল। ছুরিটা দূরে গিয়ে পড়ল। একটা হাত ভেঙে গেল। কিন্তু আবার আস্তে আস্তে পুতুলটা উঠে দাঁড়াল। একটু একটু করে আবার এগিয়ে আসল রহিমের দিকে। রহিম পুতুলটাকে লাথি মেরে উত্তেজনায় আবার দূরে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই ওর মনে হল ওর পিঠে কে যেন ছুরি বসিয়েছে। পিঠে সেই ছুরিটা গেঁথে আছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, পিছনে আরেকটা পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একা নয়। আরও চারটে পুতুল। তাদের হাতেও ছুরি। কিছু বোঝার আগেই আবার ওর পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিল আরেকটা পুতুল। পুতুলগুলোর মুখ আক্রোশে রাগে থমথমে হয়ে উঠেছে। মেঝেতে পড়ে গেল রহিম।

সবাই মিলে রহিমের উপরে বারবার ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাকল, যতক্ষণ না ওর দেহটা সম্পূর্ণ প্রাণহীন হয়ে গেল।

পরের দিন যখন পুলিশ দেখতে এসেছিল, তখন তারা দেখেছিল একটা মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, রূপম, বাড়ির কাজের লোক। তাকে বেশ কয়েকটা গুলি করা হয়েছে। বাড়ির কর্তা রহিমের মৃতদেহ তার থেকে কিছু দূরে মাটিতে পড়ে আছে। ওদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কী হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারপিট হয়েছে নিশ্চয়ই।

তবে কাচের ঘরগুলোতে সেদিন শুধু একটা হাতভাঙা পুতুল দাঁড়িয়েছিল। তার ডানহাত কনুই এর পরে আর নেই। মাথা যেন আঘাত লেগে বেঁকে গেছে। অন্য বাঁ-হাত সে বাড়িয়ে রেখেছিল। বাকি অন্য কোনও কাচের ঘরে কোনও পুতুল ছিল না।

পুলিশ না বুঝলেও, আসলে সেই হাতভাঙা পুতুলটা অপেক্ষায় ছিল রূপমের জেগে ওঠার। ঠিক যেমন ও একদিন জেগে উঠেছিল রূপমের হাতের স্পর্শে। ও তাই হাত বাড়িয়ে রেখেছিল, যদি সে আঙুলের স্পর্শে আবার প্রাণ ফিরে পায় রূপম।

ও জানত না রূপম পুতুল নয়।

কলিংবেল

বাইরের কলিংবেলটা বেজে উঠতে চমকে উঠলাম। ভয়ে বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

কে এল এখন? বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যে কে আসতে পারে এত রাতে?

এরকম সময় তো আমাদের ফ্ল্যাটে কারও আসার কথা নয়।

আমার আজ এখন এখানে থাকার কথা ছিল না। মিমির একা থাকার কথা। অবশ্য প্রতিবেশীদের সেটা জানার কথা নয়। আজকালকার দিনে কলকাতার উপরে এরকম কমপ্লেক্সে কে কার খবর রাখে!

কিন্তু তা বলে এতরাতে কে আসবে?

দেওয়াল ঘড়িটা দেখলাম। রাত একটা।

আমি অনেক রাত অবধি অনেক সময় জেগে থাকি ঠিকই। কিন্তু সেটা প্রতিবেশী কারও জানার কথা নয়। কখনোই রাত অবধি কারও সঙ্গে আড্ডা দিতে যাই না।

ঘরের কোনও আলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কী?

বাইরের দরজার নীচে সামান্য ফাঁক আছে। কিন্তু ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছে না।

একটা বেডরুমের আলো জ্বলছিল, সেটা নিভিয়ে চুপ করে বসে রইলাম যাতে কোনও শব্দ না হয়। আধ মাইলের মধ্যে একটা ফ্যাক্টরি আছে। সেখানে থেকে লোহালক্কড়ের আওয়াজ আসছে। তবে আমাদের ফ্ল্যাটে কোনও শব্দ নেই।

শুধু আমার নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আমার জানা নেই। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা এখন ছড়িয়ে পড়েছে স্নায়ুর প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

কিছু দূরে মিমি শুয়ে আছে। ওর নিশ্বাসের শব্দ অবশ্য শোনা যাচ্ছে না। খানিক আগে ওর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। যদিও সেটা স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক নয়। সুপরিকল্পিত, সুপরিচালিত হার্ট অ্যাটাক।

কেউ জানবে না যে আমি আগামীকাল সকালের পরিবর্তে আজ রাতেই ফিরে এসেছি দুর্গাপুর থেকে। শুধু এর জন্যেই। কাল ভোররাতে চুপিসাড়ে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। দুর্গাপুর থেকে ট্রেন আসার কথা সকাল আটটায়। দেখাতে হবে যেন সেই ট্রেনেই ফিরেছি। স্টেশনে বই-এর দোকান থেকে বই কিনব। বেশি দাম চাওয়ার জন্যে ঝগড়া করব। চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে চা জামায় ফেলব। সব প্ল্যান করা আছে, যাতে বেশ কিছু লোক

আমাকে মনে রেখে দেয়। তাড়াহুড়োতে বেরিয়েছি বলে টিকিট কাটার টাইম পাইনি, এরকম বলে টিকিট না কেটে আসার জন্যে বেরোনোর সময় চেকারকে ফাইনও দেব।

এখানে যে রাত দশটায় ফিরে এসেছি, সেটা কেউ দেখেনি। দেখলেও চিনতে পারত না। মাস্ক পরে ছিলাম। ভাগ্যও সঙ্গে ছিল। যেরকম বৃষ্টি হচ্ছে তাতে বাড়ির কাছাকাছি বা পথে চেনা কারওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

গত দশদিন হল এই কমপ্লেক্সের সি সি টিভি ক্যামেরা সিস্টেমটাও কাজ করছে না। কমপ্লেক্সের আবাসিকদের মাতব্বরদের মধ্যে আমি একজন। সেজন্যে তাড়াহুড়ো করে সারাইনি। ক্যামেরাতে ধরা পড়ার ভয়ও নেই।

বাইরে কলিংবেলটা আর বাজেনি। মাঝে পাঁচ মিনিট কেটে গেছে।

তবে কি ভুল শুনলাম? নাকি কেউ এসেছিল। না পেয়ে চলে গেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সোফায় বসলাম।

কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আবার কলিংবেল বাজছে।

কে আসতে পারে? আমাকে আসার সময় কেউ দেখেনি তো! অবশ্য যা পোশাকে এসেছিলাম তাতে কারও চেনার কথা নয়। এমনকী এই যে বাড়িতে ঢুকেছিলাম বা এই ফ্ল্যাটে এসেছি, সেটাও কারও খেয়াল করার কথা নয়। নিশ্চয়ই কেউ অকারণে আমার পিছু নেয়নি। আমি ছাড়া কে জানবে যে আমি এরকম কাজ করতে চলেছি!

এরকম কী হতে পারে যে আমি ট্যাক্সিতে কিছু ফেলে এসেছি! ট্যাক্সি ড্রাইভার ফেরত দিতে এসেছে। নাহ, মানিব্যাগ, ব্যাগ সবই তো ঠিক আছে। তাহলে?

বাইরে খানিকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। হয়তো ভুল শুনেছি।

কেউ যদি এখন আমাকে এখানে দেখে ফেলে, তাহলে ওই পুরো প্ল্যান একেবারে মাঠে মারা যাবে।

না, না, এখন কোনওভাবেই দরজা খুলব না।

কিন্তু কী হতে পারে? আরেকটু ভাবার চেষ্টা করলাম।

আমাদের জন্য অন্য ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের কী কোনও অসুবিধে হচ্ছে? সেজন্য জানাতে এসেছে? নাহ, সেরকম হওয়ার কথাও নয়।

কিছুদিন আগে আমাদের ঘরের এসি চালানোর জন্যে, এই ব্লকের ফিউজ উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এসি চলছে না। ফিউজ ও ওড়েনি। সে ক্ষেত্রে আমাদের ঘরেও আলো জ্বলত না।

আবার কলিংবেলটা বেজে উঠল। চমকে উঠলাম আবার। এবারে যেন মনে হল আমার বুকের ভেতরেই বেজে উঠেছে।

তাহলে কী মিমির চেনা কেউ! কেউ হয়তো জানে যে আজ রাতে আমি এখানে থাকব না। কোনও প্রেমিক? কিন্তু সেটা কী আমি এতবছর টের পেতাম না। অবশ্য গত দু-বছর সেভাবে প্রয়োজনের বাইরে কথাই হত না।

মিমিকে সেরকম আকর্ষণীয় দেখতে নয়। তবু কে বলতে পারে! আজকাল সবাই সবার প্রেমে পড়ে।

সে প্রেমিকের হয়তো এরকম সময়ে অভিসারে আসার কথা ছিল। আমি নেই। এটাই বেস্ট টাইম। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে এসে দরজা কেউ না খুললে, বারবার কলিংবেল না বাজিয়ে, অবশ্যই আগে মিমিকে ফোন করবে। কিন্তু নাহ, মিমির ফোনে কোনও মিসড কল দেখছি না। আমার ফোনটাও একবার দেখে নিলাম। তাতেও কোনও মিসড কল নেই। কেউ খুব জরুরি কিছু হলে আগে আমাদের ফোনেই করত।

দরজার আইহোলে চোখ দিয়ে দেখব একবার?

কিন্তু যদি আমার উপস্থিতি উলটো দিক থেকে টের পায়। যতই সাবধানী হই না কেন, হয়তো বোঝা যেতে পারে।

কিন্তু আর এটাকে ইগনোরও করা যাচ্ছে না। তাছাড়া, মিমি তো শুয়ে আছে। হার্ট অ্যাটাক কে জানবে! শুধু আমি জানি। ঘুমোচ্ছে বললেই হবে। যে ওষুধটা খাবারে মেশানোর জন্যে এটা হয়েছে, সেটারও আর কোনও চিহ্ন নেই ঘরে।

তবে? আমি অহেতুক এত ভয় পাচ্ছি কেন? আমার প্রথম খুন বলে! আমারও এত রাতে শুয়ে থাকারই কথা। দরজা খুলতে দেরি হতেই পারে। না শুনতেই পারি।

যেন নিজেকে আরেকটু কনভিনসড করার জন্যেই আবার করে এলাম। শুয়ে পড়ে গেমপ্ল্যান বানাতে থাকলাম।

যদি খুলতেই হয়, সেক্ষেত্রে কী বলব?

এক, সবে ফিরলাম। এসে দেখি এই অবস্থা। ডাক্তার ডাকব ভাবছিলাম।

দুই, বলব শরীর খারাপ লাগছে বলল। আমিও তাই আর ডিস্টারব না করে অন্য ঘরে গিয়ে আমার কাজ করছিলাম।

৩

মনে মনে এরকম বিভিন্ন সিনারিও অ্যানালিসিস করলাম।

কিন্তু পুরোটাই ডিপেন্ড করছে এই আগন্তুক আমাদের কতটা জানে তার উপরে বা আমাকে দেখেছে কিনা তার উপরে।

এই বৃষ্টির মধ্যে এত রাতে যেই এসে থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই খুব জরুরি কাজে এসেছে! আমি অবশ্য না খুলতেই পারি। পরে বলতে পারি এত রাতে কেউ এলে দরজা খুলি না। বা বলতে পারি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘরের পোশাক পরেই মিমির পাশে চুপ করে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

অন্ধকারে মিমির মুখটা দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য না দেখাই ভালো। এত ঘৃণা আমি আগে কাউকে কখনও করিনি। অবশ্য বাইরের কেউ সেটা জানত না।

জানত আমাদের আইডিয়াল 'কাপল' বলে। প্রতি বছর খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে বিবাহবার্ষিকী পালন করতাম। জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের সামনে বিশাল কেক কাটি। স্কচ নিয়ে মাতামাতি করি। কিন্তু সবই ওই বাইরে বাইরে।

বিয়ের পর থেকেই যখন জানতে পারি যে ওর জন্য আমাদের কখনও সন্তান হবে না, তখন থেকেই ওর উপরে আমার রাগ। ওর দিক থেকে সেটা যেনও খুব সহজে মেনে নিয়েছিল। আমি শুধু মেনে নিতে পারিনি। এমনকী আত্মীয়স্বজনের পড়শীর সামনে আমি বেশি বিব্রত বোধ করতাম। ওর সেই সামান্য লজ্জাটুকু ছিল না। একই সঙ্গে আবার বাবা-মা যে আমার সঙ্গে থাকবে এটাও ও কোনওদিন চায়নি। শেষ বয়সে গিয়ে ওদের স্থান হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে। এসবের জন্যেই উত্তরোত্তর ওর উপরে আমার সে রাগ ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল।

যে সম্পর্কতে এমনিতেই আমাদের মধ্যে কোনও শব্দ বিনিময় ছিল না, সেটাকে একেবারে নিস্তব্ধ করে দিতে অসুবিধে কী!

সেজন্য শেষে এই সিদ্ধান্ত।

বাইরে আবার কলিংবেল। এভাবে বারবার বাজালে এবারে প্রতিবেশীরা এসে হাজির হবে। কী বলব তখন?

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম বাইরের দরজার দিকে। দরজার আইহোলে চোখ রাখলাম।

কেউ, কেউ তো নেই। তবে কে বাজাচ্ছে? নাকি, আমি ভুল শুনছি বারবার। বাইরে দরজার সামনে প্যাসেজে ঘন অন্ধকার। সেখানে কেউ নেই।

একটু ইতস্তত করে দরজা খুললাম।

নাহ, বাইরে কেউ নেই।

ফিরে আসছিলাম। কিন্তু আবার কলিংবেলের শব্দে চমকে উঠলাম। কেউ তো নেই, তবে কে বাজাচ্ছে!

নাকি কেউ আছে।

কিছু দূরে লিফটের দরজার সামনে ও কে! কে, কে ওটা? এই দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক মিমির মতোই। মিমির মতো নয়। মিমিই।

ভয়ে দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। ভয়ে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে।

কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে চমকে উঠলাম। দু-হাত দূরে আরেকজন মিমি এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই মিমি ঘুমচোখে বলে উঠল— কে এসেছে এত রাতে? বারবার কলিংবেল বাজছে। একটু খুলে দিতে পারছ না। সেই আমাকেই উঠে আসতে হল ঘুমের মধ্যে!

খুঁজে পাওয়া

প্রত্যেকবারই এখানে এসে খানিকক্ষণ বসে থাকে অরিজিৎ। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের ঠিক এই জায়গাটায়। এতবার এখানে এসেছে যে চারপাশের প্রত্যেকটা দোকান ওর অত্যন্ত পরিচিত। শুধু দোকান নয়, দোকানের ভিতরে কোথায় কী থাকে তাও অরিজিৎ খুব ভালো করে জানে।

গত পনেরো বছরে এই দোকানগুলোর চেহারা যে একেবারে বদলায়নি তা নয়। কিন্তু অরিজিৎ এতবার এখান দিয়ে গেছে যে, সে পরিবর্তনের ছোঁয়া আর আলাদা করে কোনও চমক জাগায়নি। বলা যায়, ধরাই পড়েনি। বাঁদিকের ডিউটি-ফ্রি দোকানটিতে একসময় সবরকম পারফিউম সাজানো থাকত। চার-পাঁচজন সেলস গার্ল ঘুরে বেড়াত আর প্রসপেকটিভ কাস্টমার দেখলে মুচকি হেসে 'মে আই হেল্প ইউ' জিজ্ঞেস করে যেত। একটা প্লেন থেকে নেমে আরেকটা প্লেনে ওঠার মাঝের সময়টায় টুরিস্টরা টেস্টার ব্যবহার করে গন্ধ বিচার করে বেড়াত।

আর এখন?

ওই দোকানে ঢোকামাত্র প্লেনের বোর্ডিং পাস অটোমেটিক্যালি স্ক্যান হয়ে যাবে। ওই বোর্ডিং পাস থেকেই বেরিয়ে আসবে ওই ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য। কী পছন্দ, কী অপছন্দ। বর্তামানে কী পারফিউম ব্যবহার করেন ইত্যাদি। সে অনুযায়ী সেলস রোবটগুলো গাইড করে নিয়ে যাবে পছন্দের পারফিউম কাউন্টারে। কাউন্টারেও কিন্তু এখন আর পারফিউমগুলো রাখা থাকে না। শুধু মুখে একটা ছোট্ট মাস্ক পরে নিতে হয়। সুইচ টিপলে এক এক করে সুগন্ধীর গন্ধ ভেসে আসে। এবার সিলেক্ট করে নাও— যেরকম পছন্দ। এই হল পরিবর্তন। তা, সে পরিবর্তন তো আর শুধু ফ্র্যাঙ্কফুর্টের এয়ারপোর্টের টার্মিনাল টু-তে নয়, সে পরিবর্তন হয়েছে সর্বত্র।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল অরিজিতের। শুধু একটা জিনিসেরই কোনও পরিবর্তন হয়নি। তা হল বুদ্ধর নিখোঁজ হওয়া। তা পনেরো বছর আগের কথা। অরিজিৎ, ডোনা আর বুদ্ধ আমেরিকা থেকে ফিরছিল ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে। বুদ্ধর বয়স তখন সাড়ে পাঁচ। ছটফটে দুষ্টু ছেলে। যেখানেই যায়, মাতিয়ে রাখে। চেনা-অচেনা সবার সঙ্গে গিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে সেদিন ছ'ঘণ্টার গ্যাপ ছিল। লুফৎহ্যাঁনসার কানেক্টিং ফ্লাইট বিকেল পাঁচটায়। মাঝে বেশ খানিকটা সময়। ঘুরতে ঘুরতে টার্মিনালের ঠিক এই জায়গাটায় এসে বসেছিল ওরা। ছোট্ট একটু সময়। কিন্তু তা-ই সব ওলট পালট করে দিয়ে গেল। রুমালের প্রান্ত দিয়ে চোখ থেকে নেমে আসা জলের ফোঁটাটাকে

চট করে মুছে ফেলে অরিজিৎ। ঝাপসা হয়ে আসা চোখটা মুছে সেদিনের সেই স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি চায় অরিজিৎ। কিন্তু পায় কই? সে-ই তো ফিরে ফিরে আসে সেদিনটা।

ডোনা ওর স্কুলের এক বান্ধবীর দেখা পেয়ে কথা বলছিল। আর অরিজিৎ ওই বুদ্ধকে বসতে বলে ঢুকেছিল পাশের ইলেকট্রনিক্সের দোকানটায়। তখন ছোট ছোট ল্যাপটপ সবে বেরিয়েছে। বলা হত নেটবুক। ওই নেটবুকই দেখতে ব্যস্ত ছিল অরিজিৎ। মিনিট দশেক বাদে যখন বেরিয়ে এল তখন বুদ্ধও নেই, ডোনাও নেই। হয়তো ডোনার সঙ্গেই কোথাও গেছে বুদ্ধ। পাশের একটা বই-এর দোকানে ঢোকে অরিজিৎ। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। এরকমভাবে যে কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! হুঁশ ফেরে ডোনার কথায়।

'আই, আর তো মোটে দেড়ঘণ্টা বাকি আছে। আবার সিকিউরিটি চেক হবে। এবার যেতে হবে, চলো। সিকিউরিটি চেক-এও সময় লাগবে। কোনও কোনও গেটে দিয়েছে দেখেছ?'

পায় তাকে।



'আট নম্বর', বলে একটু থেমে বুদ্ধকে পাশে না দেখে অরিজিৎ বলে ওঠে, 'বুদ্ধ কোথায়?'

'কেন, ও তো তোমার সঙ্গে ছিল।'

দুজনে মিলে বই-এর দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসে। বসার জায়গাটার পাশে কোথাও লুকিয়েছে কিনা তা একবার দেখে নিয়ে আশেপাশের দোকানগুলোতে খুঁজতে থাকে। বুদ্ধ দুষ্টু হলেও না বলে চলে যাবে এমন ছেলে নয়।

আধঘণ্টা ধরে ওরা খুঁজে চলে। না পেয়ে পাগলের মতো জিজ্ঞাসা করতে থাকে— যাকে পায় তাকে।

'দেখেছেন? লাল-সবুজ ডোরাকাটা জামা, নীল প্যান্ট। বছর পাঁচেকের। এই— এই সাইজের।' কোমরের উচ্চতায় হাত রেখে অরিজিৎ জিজ্ঞেস করে।

এইসব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্রতিমুহূর্তে কোনও না কোনও ফ্লাইট নামছে। আবার প্রতিমুহূর্তে কোনও না কোনও ফ্লাইট চলে যাচ্ছে পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে। কিন্তু তা বলে যে কোনও ফ্লাইটে উঠে বসা অত সোজা নয়। প্রত্যেকটার আগে আলাদা আলাদা সিকিউরিটি চেক হয়। তারপরে বোর্ডিং পাস চেক করে দেখে অন্তত দুজন। আর বাচ্চা একা থাকলে তো কথাই নেই। নিশ্চিত না হলে কখনোই কোনও এয়ারলাইন্স তাকে ফ্লাইটে উঠতে অ্যালাউ করবে না।

খানিকবাদে ওরা এয়ারপোর্ট পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন আরও একঘণ্টা কেটে গেছে, ফ্লাইট মিস করা একেবারে নিশ্চিত। অনেক টাকা গচ্চা। নন-রিফান্ডেবল টিকিট। নতুন টিকিট কাটতে হবে। সে যাক। এখন যে করেই হোক বুদ্ধকে খুঁজে বার করতে হবে।

অরিজিতের মাথা আর কাজ করছে না। ও ধপ করে ডোনার পাশে বেঞ্চে বসে পড়ে। ডোনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে।

'মন শক্ত করো ডোনা। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কখনও শুনেছ যে কেউ কোনো এয়ারপোর্ট থেকে হারিয়ে গেছে? ওরা চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কাছ থেকে ওর একটা ছবিও নিয়ে গেছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারব।'

কিন্তু সে খবর আর পায়নি ওরা। পনেরো বছর কেটে গেছে। কী না করেছে? পুরো এয়ারপোর্টের সিসিটিভি ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। কোনওরকমে ইমিগ্রেশন এড়িয়ে যদি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে একথা ভেবে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরেও খোঁজাখুঁজি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। পুরো এয়ারপোর্ট চিরুনি তল্লাশি হয়েছে। প্রত্যেকটা টার্মিনালে। সব প্লেনের যাত্রীতালিকা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। সেদিন যত বাচ্চা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে ট্রাভেল করেছে, তার লিস্ট দেখা হয়েছে। তবু বুদ্ধকে পাওয়া যায়নি। নিরুদ্দেশের ছবি হয়ে রয়ে গেছে।

প্রত্যেক বছর অন্তত ছ'বার অরিজিৎ আসে এখানে। কেন আসে তা ও নিজেও জানে না। ওকে এখন এখানকার সবাই চিনে গেছে। এখন সব চুল উঠে মাথা জোড়া টাক। মুখে বয়সের ছাপ। পায়ের জোর খানিকটা কমে এসেছে। আগে ভালো ফুটবল খেলত। কিন্তু দুবার হাঁটুর অপারেশনের পর খেলা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনের দোকানটার দিকে তাকায় অরিজিৎ। ওই দোকানটার জন্যই যত গন্ডগোল। যদি না ও ওইদিন নেটবুকটা দেখতে যেত— যদি না ওইদিন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট আসত,

যদি না— নাহ অরিজিৎও জানে যে এই যদিরই নাম ভাগ্য। আর এরকম ক'টা মুহূর্তই জীবনের সবকিছু পালটে দিয়ে যায়।

আজ ওর সঙ্গে না আছে বুদ্ধ, না ডোনা। অথচ জীবনটা অন্যরকমও হতে পারত। হয়তো, ওই ছেলেটার মতো— সামনের সোফায় বসা বছর চব্বিশের ছেলেটার মতো— বুদ্ধও আজ এখানেই থাকতে পারত।

'বুদ্ধ', বিড়বিড় করে বলে উঠল অরিজিৎ। তারপরেই পাশের আফ্রিকান লোকটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল—ওকেই লক্ষ করছে। ইনফ্যাক্ট আরও যে অনেকের লক্ষ ওরই দিকে তাও ও জানে। জার্মানিতে অনেকেই বুদ্ধর হারানোর ঘটনাটা জানে। আর এও জানে যে তার আকর্ষণে প্রতিবছর বারবার এই টার্মিনালের ঠিক এই জায়গায় ছুটে আসে বুদ্ধর বাবা।

এখনও তিনঘণ্টা সময় আছে পরের ফ্লাইটের আগে। অরিজিৎ টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়ায়। ট্রলি ব্যাগটাকে সঙ্গে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোয়। চিন্তায় এতটাই বিভোর যে আশপাশের ব্যস্ত হাঁটাচলার চেহারাটা ওর চোখে পড়ে না। মনে হয় সব যেন থেমে আছে। ঠিক যেমনভাবে ওর পৃথিবীটা থেমে আছে গত পনেরো বছর ধরে একই জায়গায়।

বাথরুমে ঢোকার ঠিক আগেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অরিজিৎ। টয়লেটের ঠিক আগেই বাঁদিকে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে। আশ্চর্য, এটা তো কখনও চোখে পড়েনি! নতুন হয়েছে? নাহ, তাও তো নয়। অন্তত দেওয়ালের চেহারা বা পথের চেহারা দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। আরেকটা অবাক ব্যাপার। সব প্যাসেজেরই সামনে মার্কিং করা থাকে। কোনওটা গেছে গেট ১-৮, তো কোনওটা ৯-১৫, কোনওটাতে এলখা আছে লাউঞ্জে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু এটাতে সেরকম কিছুই এলখা নেই। আর রাস্তাটাও সরু। আচ্ছা, বুদ্ধ সেদিন এদিকে আসেনি তো? ভাবনাটা যে কতটা অলীক তা অরিজিৎ জানে। আর গেলেও তো সে পনেরো বছর আগেকার কথা। সময়ের পিছন দিকে তো আর হাঁটা যায় না। তবু মনে হল আরেকটু এগিয়ে দেখাই যাক না।

রাস্তাটা কীরকম অন্য ধরনের। এয়ারপোর্টের অন্য জায়গার মতো ঝকঝকে সাদা আলো নেই। কীরকম একটা নীলচে আলো ওপর থেকে এসে পড়েছে সরু রাস্তাটার ওপর। ওই রাস্তা ধরেই এগোতে থাকে অরিজিৎ। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে একটা কাঠের দরজার সামনে। তার ওপরে লেখা 'প্রজেক্ট বক্স'। লেখাটা সবুজ আলোতে ফুটে উঠেছে।

দরজাটা খোলার চেষ্টা করল অরিজিৎ। বন্ধ। নীচ থেকেও কোনো আলো আসছে না। তাহলে কি কেউ নেই? দরজাতে কান পাতল অরিজিৎ। একটা ইনস্ট্রুমেন্টের আওয়াজ ভেসে

আসছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল। তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। হয়তো ভিতরে কেউ নেই। ফিরেই আসছিল। কিন্তু, মনে হল আরেকটু দেখা দরকার। এবার আরও জোরে ধাক্কা দিল অরিজিৎ। ভিতরে কেউ থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। কিন্তু নাহ, এবারও কোনও সাড়াশব্দ মিলল না। হঠাৎ চোখে পড়ল দরজার পাশের দেওয়ালে লিফটের সুইচের মতো একটা স্বচ্ছ সুইচ। টিপতেই কাঠের দরজাটা পাশাপাশি খুলে গেল।

স্বল্প আলোকিত একটা ঘর। সারা ঘর জুড়ে হালকা সবুজ আলো। ঘরে কেউ নেই, একটা মিউজিক আস্তে বাজছে। দেওয়ালে প্রজেক্ট এক্স সম্পর্কে নানা কথা লেখা আছে। দেওয়াল মানে অবশ্য বিশাল কম্পিউটার স্ক্রিন— যার উপরে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর ম্যাপ, কিছু লোকের ছবি, ডি. এন. এ-র ছবি। হেড সেট লাগিয়ে বর্ণনাও শোনা যাচ্ছে।

অরিজিৎ প্রজেক্ট এক্স-রে হিস্ট্রি শুনতে থাকে। ২০১১-এ দশজনকে এই প্রজেক্টে নেওয়া হয়। তাদের বয়স ছিল পাঁচ থেকে ষাটের মধ্যে। এই দশজনকে স্পেশালি সিলেক্ট করা হয়েছিল তাদের অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতার জন্য। যেমন থমাস ক্যুরিয়নকে নেওয়া হয়েছিল ফটোগ্রাফিক মেমারির জন্য। জিয়োভানি পারসানো— ১০০ মিটার দৌড়ে যে পরপর দু'বার অলিম্পিকে সোনা জিতে বিশ্বরেকর্ড করেছিল, তাকেও নেওয়া হয়েছিল। নেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত বক্তা সাংচেন শুশাইকেও, যার কথা শুনে হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। এরকম আরও সাতজনের কথা লেখা। এদের সবাই যে খুব পরিচিত ছিল তা নয়। যেমন, সারা প্যাগানেলা— ষাট বছরের এই বৃদ্ধাকে দেখতে লাগত বছর তিরিশেকের মতো। এদের সবাইকে নেওয়ার উদ্দেশ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা এদের জিনে কী ব্যতিক্রম থাকার জন্য এদের এরকম অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সেই ডি.এন. এ মার্কারগুলো চিহ্নিত করে মিউটেশনের মাধ্যমে উন্নততর মানব প্রজাতি তৈরি করা। এমন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি করা যাদের বয়স বাড়বে না, যারা ছুটবে চিতাবাঘের মতো, যাদের গায়ের জোর হবে খুব বেশি...।

আশ্চর্য, এসব যে হচ্ছে তা তো আদৌ জানা ছিল না অরিজিতের। হয়তো গোপনীয়তার কারণে এ খবর কোথাও বেরোয়নি। ২০১১-তে এ জায়গা থেকেই উধাও হয়ে গেছে বুদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধ! ও তো তখন মোটে পাঁচ বছরের। একদম সাধারণ—ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল অরিজিৎ। সত্যিই কি বুদ্ধ সাধারণ ছিল?

মনে পড়ল, বুদ্ধ একদম খেতে চাইত না, বলত সবকিছুতে পোকা আছে। খাবারের উপর নাকি পোকা ঘুরে বেড়ায়। নানান ডাক্তার দেখিয়েছিল, তারা সবাই বলত এটা ওর মানসিক। খেতে না চাওয়ার বাহানা। এখানে আসার ঠিক দু'দিন আগেই অরিজিৎ জানতে পেরেছিল এর

আসল রহস্য। বুদ্ধর অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির কথা। টেস্ট করে দেখেছিল বুদ্ধর দৃষ্টিশক্তি ঈগলের থেকেও শক্তিশালী। ও মাইলখানেক দূর থেকেও কোনও কিছু দেখতে পারে। আর খুব ছোট লেখাও পড়ে ফেলতে পারে। এটা জানতে পারার দু'দিন বাদেই ও এখান থেকে হারিয়ে যায়।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে অরিজিৎ। তাহলে কি বুদ্ধও এখানেই আছে? সারা গায়ে শিহরন জাগে অরিজিতের। অনিরুদ্ধ রয়। বুদ্ধর ভালো নাম। নামটা খুঁজতে থাকে অরিজিৎ নাহ, ওর নামটা তো নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরিজিৎ। একটু আশার আলো দেখেছিল।

'দিস ইজ নট দ্য ফুল লিস্ট। দেয়ার আর আদার্স', গলা শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় অরিজিৎ। একজন মাঝারি হাইটের সাহেব অরিজিতের সামনে। টাকমাথা, শুধু মাথার পিছন দিকে গোল করে চুল। গায়ে বাদামি জ্যাকেট। পায়ে স্পোর্টস শু।

'বাঙালি? তাহলে বাংলাতেই বলি,' বলে ট্রান্সলেটরের সাহায্যে লোকটা যান্ত্রিক উচ্চারণে বলতে থাকে, 'এর বাইরেও অনেককে নেওয়া হয়েছিল। এখানে শুধু তাদের নাম আছে যারা স্বেচ্ছায় এতে যোগ দিতে রাজি হয়েছিল। তা না হলে তো হইচই পড়ে যেত।'

'বাকিরা? তাদের নাম জানার কোনও উপায় আছে?'

'তুমি কি বিশেষ কাউকে খুঁজছ?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে।' কান্নায় অরিজিতের গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে। 'আমার পাঁচ বছরের ছেলে। নাম অনিরুদ্ধ রয়। প্রায় পনেরো বছর আগে এখানে হারিয়ে যায়।'

'কীরকম দেখতে?'

'নীলচে চোখ। বাঁ চোখের পাশে কালো আঁচিল।'

'বুঝতে পেরেছি। অনিরুদ্ধকে চিনি।' লোকটা বলে।

'কোথায়? কোথায় ও?' চেঁচিয়ে ওঠে অরিজিৎ।

চুপ করে থাকে লোকটা।

'কী... কী হয়েছে বুদ্ধর? ও বেঁচে আছে তো?' লোকটা চুপ করে থাকায় সব থেকে খারাপ চিন্তাটাই আগে মাথায় আসে অরিজিতের।

'হ্যাঁ, তা আছে। তবে তোমার সামান্য দেরি হয়ে গেছে। মাত্র দু'দিন আগে ওকে মঙ্গলে পাঠানো হয়েছে। বসতি বানানোর কাজে। ফিরে আসবে আরও সাত বছর পরে। যেতে-আসতেই তো সাড়ে ছ'বছর লেগে যায়।'

অরিজিৎকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা ফের বলে ওঠে, 'আয়্যাম রিয়ালি স্যরি। দু'দিন আগে এলেই দেখা পেতে পারতে। তবে সাত বছর ওয়েট করতে হবে না যদি

তুমি নিজেই মঙ্গলে চলে যাও। ও তো ওখানে ছ'মাস থাকবে। তবে তাতে অনেক অনেক খরচ তা তো জানই।'

'আমার যা আছে সর্বস্ব দিয়েও যদি মঙ্গলে যাওয়া যায় আমি যাব। ও ছাড়া আমার আছেই বা কে? আমি যাব। আমার সারা জীবনটাই তো ওর অপেক্ষায় কেটে গেছে।' উত্তেজিত হয়ে অরিজিৎ বলতে থাকে। চোখ থেকে জলের ধারা নামতে থাকে। আনন্দাশ্রু।

২

অরিজিৎ হাসপাতালে বিছানায় উঠে বসে। 'বুদ্ধ, বুদ্ধ কোথায়?'

তিনজন ডাক্তার সাদা গাউন পরে অরিজিতের বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তারমধ্যে একজন ডাক্তার পিট। চোখে ডিম্বাকার ফ্রেমের চশমা। জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন মনে করছেন? শরীর কেমন লাগছে?'

'বুদ্ধ, বুদ্ধ কোথায়? আমি ওর কাছে যাব। মঙ্গলে। আমাকে যেতে দিন প্লিজ', কাঁদো কাঁদো গলায় বলে অরিজিৎ।

'বুদ্ধ বলে আপনার কোনও ছেলে নেই। কোনওদিন ছিলও না। পুরো গল্পটা আমাদেরই সৃষ্টি। এর সাহায্যে।' — অরিজিতের দিকে একটা ছোট যন্ত্র এগিয়ে দেয় পিট। 'এটাই আপনার নার্ভাস সিস্টেমের ওপরে কাজ করে এ ঘটনাটা তৈরি করেছিল। আপনি স্বপ্নে তাই দেখছিলেন।'

অরিজিৎ অবিশ্বাসী চোখে বলে ওঠে, 'না না, এ হতে পারে না। এত স্পষ্ট! কোথায় গেলেন ওই ভদ্রলোক, আমার ছেলের কথা বললেন?' মাথা ঘুরিয়ে উদভ্রান্তের মতো চারদিক দেখতে থাকে অরিজিৎ।

'একটু মনে করিয়ে দিই। আপনার ছেলের নাম বুদ্ধ নয়, সোম। আপনি সোমের জন্যই আমাদের কাছে এসেছিলেন। আর সে কারণেই আমরা এই পুরো গল্পটা আপনার মস্তিষ্কে আরও করতে বাধ্য হই।'

একটু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকে অরিজিৎ। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ে ওর। হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে বটে। 'তাহলে বুদ্ধ বলে কেউ নেই!'

'ঘটনাটা সত্যি। তবে আপনার সঙ্গে লিঙ্কড নয়। অন্য একজন তার ছেলেকে হারিয়েছিল ওই এয়ারপোর্টে। তারপর পনেরো বছর ধরে সে ছেলেকে খুঁজেছিল। পরে সে পাগল হয়ে যায়। বহু বছর আগের ঘটনা। সেই ঘটনাকে নিয়েই আমাদের এই গল্প তৈরি। যখনই আপনার মতো কেউ আসে তখন আমরা তাদের এই গল্পটা বলি, যদি তারা তাদের ভুল বুজতে পারে।'

'কিন্তু আমার হয়েছেটা কী?' বলেই থেমে যায় অরিজিৎ। পিটের ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

'মনে পড়ছে না; সোমের কথাটা?'

এবার অরিজিতের খেয়াল হয়।

পিট আবার বলে ওঠে, 'তাহলে আপনার ডিসিশনটা কী? সোমকে কি মেরে ফেলা হবে? আপনি ওকে চান না?'

'না না', আর্তনাদ করে ওঠে অরিজিৎ। 'আমি ওকে আমার ছেলে বলে অ্যাকসেপ্ট করছি।'

সম্পতিসূচক মাথা নেড়ে পিট বলে ওঠে, 'রাইট ডিসিশন। সমাজ অনেক পালটে গেছে। তবুও সামান্য বার্থ ডিফেক্টের জন্য আপনার ক্লোনড ছেলেকে মেরে ফেলাটা মানবিক নয়। হাজার হোক ও তো আপনারই ছেলে। ওর শরীরে তো আপনারই রক্ত। সব থেকে বড় কথা ওরও তো একটা জীবনের অধিকার আছে। এত ছোট কারণে সে অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।'

'তা এটাই তো আপনার ফাইনাল ডিসিশন?' পাশ থেকে ড . সাইমন বলে ওঠেন। 'হাতের আঙুলে ডিফেক্ট থাকা সত্ত্বেও আপনি সোমকে, আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, ঠিক তো?'

'অবশ্যই। ও তো আমারই ছেলে। তা ও যেরকমই হোক না কেন। ছেলের খোঁজে কেউ পনেরো বছর অপেক্ষা করতে পারে, আর আমি ওকে...,' কথাটা শেষ করতেও লজ্জা হয় অরিজিতের।

সময় বদলে গেছে। মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো ডি. এন. এ থেকে ক্লোন করে বাচ্চা তৈরি করতে পারে অনেক সহজে। সহজে পাওয়া যায় বলেই হয়তো প্রাণের দাম গেছে কমে। তাই বাচ্চার সামান্য ডিফেক্ট থাকলেও আবার করে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান এনারা। সোমের মতো ডিফেক্টিভ বাচ্চারা যাতে হারিয়ে না যায়, বাঁচার সামান্য সুযোগ পায়, সে জন্যই এই গল্পের সাহায্য নেন পিটেরা। যারাই এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যায়, খানিকক্ষণের জন্য হলেও, তারাই ডিসিশন চেঞ্জ করে। সন্তানকে স্বীকার করে নেয়। পিটের অভিজ্ঞতা অন্তত সেরকমই বলে।

অনাথবন্ধু

আলুকাবলি খেতে খেতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল। 'সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।— কী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ!'

প্রতিবাদ জানালাম— 'রবীন্দ্রনাথ নয়, কামিনী রায়।'

'সে যাই হোক বুকলি ঘোচুকে লিখলেন তা দিয়ে কি এসে যায়। আসল কথাটা বুঝলেই হল। আমিও এই কথাটাই ভেবে ভেবে গত সাত-আটদিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অন্যের জন্য কিছুই করা হল না।'

'হ্যাঁ, সে তোমার ওই আলুকাবলি খাওয়া দেখেই বোঝা যায়।'

'যাঃ, এই ফেলে দিলাম।'— বলে বিশ্বজিৎদা চেটে খাওয়া শালপাতাটাতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর বলে উঠল— যাহোক, যা হবার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। আর একটা দিনও নষ্ট নয়। আমি একটা প্ল্যান করেছি। একটা ফ্রিস্কুল খুললে কেমন হয়? দেশের মূল সমস্যা তো অশিক্ষা। আর গরিবদের শিক্ষার সুযোগ কোথায়।

আমরা সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলাম— খুব ভালো হয়। খুব ভালো হয়। ভোম্বল বলল— 'আমিও পড়াব।'

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল— 'হ্যাঁ, তুই পড়াবি না! তুই ক্লাস সিক্সে পড়াস। এই নিয়ে তো বারতিনেক ওই ক্লাসে ফেল করলি। ক্লাস সিক্সের পড়ার ব্যাপারে তোর রীতিমতো অভিজ্ঞতা আছে বলতেই হবে।'

'আহ, তুমি এত ভোম্বলের পিছনে লাগো কেন বল তো? তুমিও তো বি. এ. ফেল!'

'কিছু না জেনে বকিস না! আমার সময় বি.এ.তে ফেল না করলে লোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত না। ইউনিয়ন লিডারও হওয়া যেত না। যে যত্তো বেশিবার ফেল করেছে, সে কলেজের তত্তো সিনিয়র লিডার। দেখিস না দেশের বড় বড় মন্ত্রীদের! তা সে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক। আজ থেকে আমাদের প্রত্যেককে স্কুলের জন্য যে কোনও ধরনের আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘোচুর বাড়ির একতলায় স্কুল হবে।'

আমি আঁতকে উঠলাম— 'আমার বাড়ির একতলায় কিন্তু দিদিমা যে একতলার ঘরে...'

'থাম ঘোচু। দেশ আগে, না দিদিমা আগে। দিদিমাকে বার করে দে, অথবা দিদিমাকে বল আমাদের স্কুলে ভর্তি হতে।' একটু থেমে বিশ্বজিৎদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ফের বলে উঠল—

'আমাদের স্কুলের নাম হবে অনাথবন্ধু। বলতো ভোম্বল, অনাথবন্ধু মানে কী?'

'কি আবার! বন্ধুদের অনাথ করা।'— ভোম্বল বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদা সায় দিয়ে বলে উঠল—'আমরা পরশু থেকে স্কুলের ব্যাপারে লিফলেট বিলি করব।'

দুদিন পরে রাস্তোয় রাস্তায় বিজ্ঞপ্তি পড়ে গেল। 'বিনা খরচে সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করুন। অনাথবন্ধু স্কুল। শেখাবেন কৃতী ও অভিজ্ঞ ছাত্রেরা। প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র।'

ভোম্বলের মতো সুদীপ আর শান্তনুও আছে যাদের একাধিক বার এক ক্লাসে ফেল করার অভিজ্ঞতা আছে। তাই অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু কৃতী কথাটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। তাতে বিশ্বজিৎদা একটা জনপ্রিয় চ্যানেলে কৃতী বলে যাদের মাকে মধ্যে আলোচনায় ডাকা হয় তাদের উদাহরণ দিয়ে বলে উঠল— ওরা যদি কৃতী হতে পারে, তাহলে আমরা সবাই কৃতী। আমাদের ভোম্বলও।

এর সঙ্গে সঙ্গে হাজার খানেক লিফলেটও তৈরি করলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার আশেপাশের অজস্র লিফলেট জড়ো হল। লোকে নিচ্ছে, দেখছে আর ফেলে দিচ্ছে। একজন উৎসাহী মহিলা একটা নিয়ে খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে আরও দুটো চাইলেন উৎসাহে আরও তিনটে দিলাম। ওনার চেনাজানার মধ্যে বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে আছে হয়তো। কিন্তু না ওকি! খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন উনি।

'কই কই, দেখি শার্টের কোথায় কাকে পায়খানা করেছে!' বলে কাগজের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হলেন।

ভোম্বলের বাবা একটা জিনিসই সহ্য করতে পারেন না। তা হল সিনেমা দেখা। ভোম্বল একটা সিনেমাহলের সামনে দাঁড়িয়ে লিফটে বিলি করছিল। হঠাৎ কোত্থেকে ওর বাবা এসে হাজির।

ছিঃ ছিঃ ভোম্বল, তুই এতটা নীচে নেমে গেছিস। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করছিস।— বলে হিড়হিড় করে ভোম্বলের কান টানতে টানতে কোথায় উধাও হলেন। ভোম্বল কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কানের টানে কিছুই বলতে পারল না।

লিফলেটের ভাষাটা এখনও বলা হয়নি। ওটা বলা যাক।

'মহাশয় সবিনয় নিবেদন,

আমাদের বেপরোয়া ক্লাবের পক্ষ থেকে অবৈতনিক স্কুল খোলা হচ্ছে। আপনাদের অশিক্ষিত ছেলেরা যাতে আপনাদের মতো অশিক্ষিত না হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই এই স্কুল। এই

উপলক্ষে আপনারা সবান্ধবে স্কুলে উপস্থিত থেকে বাধিত করবেন।'

একজন ষণ্ডামার্কা লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ডেকে দিলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল—তুমি লিখেছ?

পুরো কৃতিত্ব আমারই প্রাপ্য। একটা বিয়ের কার্ড থেকে খানিকটা ভাষা চুরি করে লিখেছিলাম। লজ্জার হাসি হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললাম 'হ্যাঁ'।

'এক চড়ে দাঁতগুলো ফেলে দেব। আমাকে অশিক্ষিত বলা। সবান্ধবে স্কুলে ভর্তি হতে বলা। ছোঁড়া এসেছে শেখাতে!' লোকটা হাত নাড়িয়ে মুখভঙ্গি করে বলে উঠল।

না, আপনি অশিক্ষিত থাকতে চাইলে, সেরকমই হবে— বাধা দেব না। শুধু আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করব।'— আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

'চামড়া ছাড়িয়ে নেব মেরে।' বলে লোকটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জনা কয়েক লোক এসে আমায় উদ্ধার করল। কিন্তু ততক্ষণে আমি কয়েকটা রামচড় খেয়ে গেছি।

আমরা সবাই সন্ধেতে ফের জমায়েত হলাম। আমি গালে, ডোম্বল কানে হাত বোলাচ্ছি দেখে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল— 'দেখ ভালো কাজে বাধা একটু আসে। ওতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তা আমরা কে কোন ক্লাসে কে কোন সাবজেক্ট পড়াব সেটা একটু ঠিক করে নিই।'

একেকজনের উপর একেটা সাবজেক্ট পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হল। আমার উপরে অঙ্ক। দাদু-বাবা-মা প্রত্যেকেই অঙ্কে বেশ ভালো ছিলেন। আশা করা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমারও অঙ্কে ভালো দখল থাকবে। হাফিয়ার্লিতে ১০০তে ১০ পাওয়ার কথাটা আর বললাম না।

বিশ্বজিৎদা দুটো বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনেছে। স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো হবে। একটা বিদ্যাসাগরের অন্যটা নিজের। আমাদের কথা চলছে এর মধ্যে এক মোটাসোটা কালো মাঝবয়সি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে বছর আটেকের ছেলে। তার চোখেমুখে ছটফটে ভাব। রাস্তার চটি পরে ঘরে ঢুকতে বারণ করায় ছেলেটা বলে উঠল— 'হাজারবার ঢুকব।' তারপর ওর মার দিকে তাকিয়ে নালিশ করল। 'মা এমন হলে আমি কিন্তু পড়ব না।' আমরা সবাই হাই-মাই করে উঠলাম। বিশ্বজিৎদা মিছরি ভেজানো গলায় বলে উঠল— 'না, ভাইটু চটি পরবে না কেন, অবশ্যই পরবে। চটি পরেই খাটে বস।'

ছেলেটা একটু শান্ত হয়ে বসে আমার খাটের উপর রাখা রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতা ছিঁড়ে নৌকা বানাতে লাগল। বিশ্বজিৎদার গদগদ ভাব। পারলে শরৎ রচনাবলীও ছেলেটার হাতে দিয়ে বসে।

'তা আপনাদের টিফিনের কি ব্যবস্থা আছে?' মহিলা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন।

'না, আমরা তো টিফিন নিয়ে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।'

'কি? দেবেন না। টিফিন দেবেন না তো ও আসবে কি জন্যে! চল কালু। স্কুল খুলেছে। অথচ জানে না ফ্রি স্কুলে খাওয়াতে হয়।'

কালুকে নিয়ে মহিলা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ঝনঝন করে আওয়াজ হল। কালু কাচের জানলার উপর ঢিল ছুড়ে লক্ষ্য পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেছে।

পরের কদিনে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া গেল। এদের মধ্যে আছে শান্তি। প্রতীকদের কাজের মেয়ে। আমাদের ক্লাবের সদস্যরা বাড়ির কাজ করে দেবে এ শর্তে প্রতীকের বাবা শান্তিকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয়েছেন। বুবলে, আমাদের ফুচকাওয়ালা ফুচুকাকুর ছেলে ভর্তি হয়েছে। বুবলেকে আমরা পড়াশোনা শিখিয়ে নষ্ট করে দিতে পারি বলে ফুচুকাকুর যে এমনভাবে পড়ার যাতে ও বড় হয়ে ফুচকাওয়ালাই হয়।

গণু আমাদের গয়লার মেয়ে। সেও অন্যতম ছাত্রী। গণুকে রাজি করাতে গিয়ে বিশ্বজিৎদাকে খুন্তির ছ্যাঁকা খেতে হয়েছে। গণুর মাকে বিশ্বজিৎদা গিয়ে বলেছিল আপনার মেয়েকে নিতে এসেছি মাসিমা। গণুর মা যে ওইটুকু একটা কথার পরে এতখানি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। শুধু দূর থেকে দেখলাম তাগড়াই বিশ্বজিৎদা পাই-পাই করে ছুটছে আর তার পিছন পিছন গণুর মা খুন্তি হাতে। বলতে বলতে চলেছে, 'কি সাহস হতচ্ছাড়ার বলে কিনা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে।' — আমরা পরে অবশ্য সদুদ্দেশ্যটা বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই খুন্তি বিশ্বজিৎদার পিঠে স্থান করে নিয়েছে।

সবথেকে ভালো প্রতিক্রিয়া পেলাম লিচু বাগান বস্তিতে। ঢুকেই ডানদিকের প্রথম বাড়িতে দেখি একজন রান্না করছেন। বিশ্বজিৎদার ঘটনার পর থেকে রান্নার সময়ে আমরা কাউকে কিছু বলতে যাই না। প্রথম বাড়ি ছেড়ে তাই দ্বিতীয় বাড়িতে ঢুকলাম। একজন মাঝবয়সি লোক দালানে বসে তেল মাখতে মাখতে জলের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করছিলেন। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতেই বললেন, না, চাঁদা দেব না। তারপর আমরা মিনিট পাঁচেক ধরে বোঝানোর পর উনি ভারী খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। আমাদের বাড়ির উনিশটা বাচ্চার প্রত্যেকেই যাবে।'

শুনে আমরা তো প্রায় নাচতে শুরু করি আর কি। স্কুলের ঠিকানা, ক্লাস শুরু হওয়ার তারিখ ইত্যাদি জানিয়ে আমরা ফিরে এলাম। ফেরার পথে ভোম্বলকে বলতে শুনলাম, 'মিশনারীজ অব চ্যারিটিস-এর পরেই অনাথবন্ধু স্কুল।' বিশ্বজিৎদা কঠিন উদাত্ত গলায় জানালে 'সামনে আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ। প্রস্তুত হ ভোম্বল।'

পরের সোমবার, অর্থাৎ স্কুল খোলার দিন, ভোরবেলা ছটার সময়ে চোখ খুলে দেখি বিশ্বজিৎদা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি এক কাঁধের ওপর ভাঁজ করা চাদর। চোখে নির্মোহ দৃষ্টি। খানিকবাদে নীচে নামলাম। ক্লাস দশটায় শুরু। আজকে আমরা শুধু ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের ডেকেছি। লিচুবাগান সাড়ে-নটায় এসে গেছে। শুধু এসেছে না, সঙ্গে আছে বেশ কয়েকটা ব্যাট ও বল। বাকিরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির উঠোন খেলার মাঠের চেহারা নিল।

বিশ্বজিৎদা আমাদেরকে উৎসাহিত করতে শান্তিনিকেতনের উদাহরণ দিয়ে বলল, 'প্রকৃতির মধ্যে বসে না শেখালে বাচ্চাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তোরা এর মধ্যেই ক্লাস শুরু কর। বিশ্বজিৎদার কথা মতো অচিন্ত্য অর্থাৎ আমাদের ক্লাস ওয়ানের বাংলার শিক্ষক বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুরু করল, 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।'

—কেউ শুনেছে না দেখে দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে ফের বলে উঠল। শোনার মধ্যে উৎসাহী শ্রোতা বলতে একটা কালো কুকুর, যেটা লিচুবাগান বস্তির লোকেদের সঙ্গে এসেছিল। নাম জিমি। বাকিরা সব একমনে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে। হঠাৎ যেই না অচিন্ত্য আমটি আমি খাব পেড়ে... বলল, কি হল বুঝলাম না— জিমি ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে অচিন্ত্যর দিকে তেড়ে গেল— আম ভেবে কিনা জানি না। অচিন্ত্য আর জিমির বেশ চারদিকের বারান্দায় বেশ খানিকক্ষণ চলল। বাকিরা এখন ক্রিকেট ছেড়ে ওদের দৌড় বেশ উৎসাহের সঙ্গে দেখছে। বেশিরভাগের সমর্থন জিমির দিকে। শেষপর্যন্ত অচিন্ত্য একটা পাইপে পা বেঁধে আছাড় খেতেই জিমি এসে অচিন্ত্যর পাশে বসল। কামড়ালো না, নখ বসালো না— শুধু জিভ দিয়ে মুখ চাটতে থাকল। দূর থেকে বাচ্চাদেরকে একজন বলে উঠল, 'ফার্স্ট উইকেট ডাউন।'

এরপর আমার অঙ্ক করানোর পালা। বারান্দায় বোর্ড টেনে বোর্ডে এক লিখে এক বলতে বললাম। উত্তরে একটা বল এসে বোর্ডে লাগল। উত্তেজিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তখনও সবাই একমনে ক্রিকেট খেলে চলেছে। কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বোর্ডটা হল আমাদের বাউন্ডারি লাইন। রেগে উঠে বললাম, 'না পড়লে কান ধরে বের করে দেব।'

নেতাজী কণ্ঠে বললাম, 'বল এক'। শুনলাম 'ঘ্যাঁক'। নাঃ এবার আর চাটা নয়। অচিন্ত্যকে ছেড়ে জিমি মোক্ষমভাবে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে আমার পায়ের গোড়ালিতে। উঃ-বলে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকলাম, তারপরে নার্সিং হোমে।

ফিরলাম দিন দুই পরে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বজিৎদা, চোখের নীচে কালি, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বিশ্বজিৎদা, পড়ানো কেমন চলছে? ছাত্র বেড়েছে?'

উত্তরটা অচিন্ত্য দিল। 'হ্যাঁ, বেড়েছে মানে দেখে আয়। ছাত্ররা আর বাড়ি ফিরতে চাইছে না।'

ভিতরে ঢুকে হতবাক। একি! এযে পুরো লিচুবাগান বস্তিই আমার বাড়ির উঠোনে চলে এসেছে। একধারে ক্রিকেট, একধারে তাস, আরেকধারে জামা কাপড় শুকোনো। বাচ্চা, বুড়ো, বুড়ি কেউ বাদ নেই। রীতিমতো সবান্ধবে উপস্থিত। বিশ্বজিৎদা আমার সঙ্গেই ঢুকেছিল। ওদের উদ্দেশ্যে বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এরকম হলে সব্বাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেব।' পরক্ষণেই অবশ্য মিনমিনে গলায় বলে উঠল, 'না, না আমি সেরকম বলছিলাম না। আপনারা থাকুন। আমি-ই যাই।'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি গোটা পাঁচেক কুকুর। জিমিরই বন্ধুবান্ধব হবে। চোখের দৃষ্টি খুব সুবিধের নয়।

বাইরে বেরিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বিশ্বজিৎদাকে বললাম, 'এ কি হল বিশ্বজিৎদা স্কুলের জন্য শেষে ঘরছাড়া হলাম!'

বিশ্বজিৎদা আশ্বস্ত করল, 'ঘর আগে না দেশ আগে!'

মিস্টার পাই এর কৌটো

১

—আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

—সে বলতে পাচ্ছি না। স্যার খুব ব্যস্ত আছেন গতকাল থেকে।

—হ্যাঁ, সে তো সকাল থেকেই শুনছি। প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেল অপেক্ষা করতে করতে— গণেশ তাড়া দেয়।— বলছি না, ব্যাপারটা খুব আর্জেন্ট।

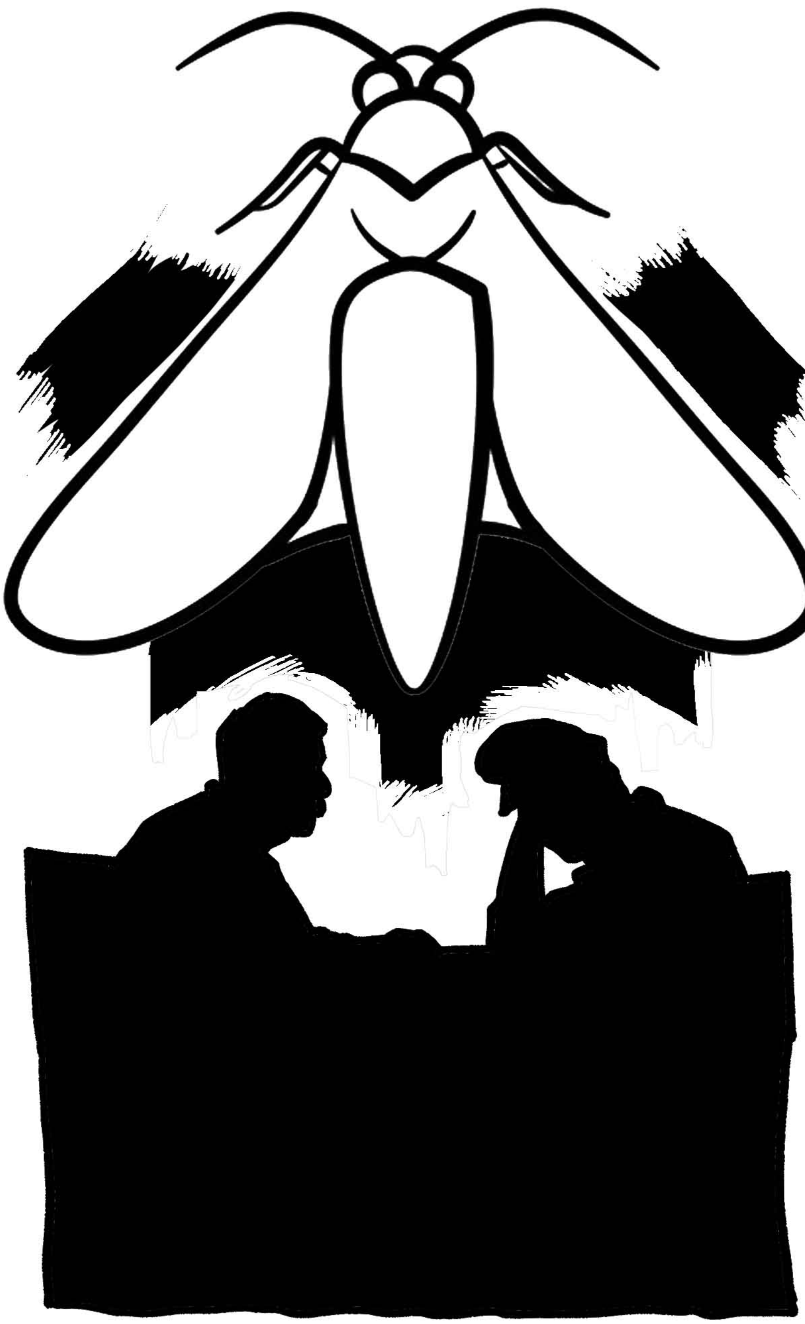
—ঠিক আছে আবার দেখছি।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা বাদে গণেশের ডাক পড়ে। অশোকনগর থানার ওসি দীপ্তমানবাবুর ঘরে।

দীপ্তমানবাবু যে সকাল থেকে প্রচুর ছোটাছুটি করেছেন, আর টেনশনে আছেন তা দেখেই বোঝা যায়। গণেশকে দেখেই বলে ওঠেন— কী ব্যাপার বলুন! আজ খুব ব্যস্ত আছি। বিকেলে এখানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা আছে।

গণেশ বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই দীপ্তমানবাবুর কাছে একটা ফোন এসেছে। ফোনটা নিয়ে দীপ্তমানবাবু আরও মিনিট দশেক কারও সঙ্গে কথা বললেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভাপ্রসঙ্গে। তারপরে গম্ভীর গলায় গণেশকে বলে ওঠেন —কী ব্যাপার বলুন, চুপ করে বসে আছেন। একদম সময় নেই, তাড়াতাড়ি বলুন।

—আমার স্যার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার পাই এর কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। আমি ওঁর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করি।



—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু শুনেছি না, নিয়মিত অনেক কমপ্লেন পাচ্ছি। কী সব নাকি উলটোপালটা এক্সপেরিমেন্ট করেন সারাক্ষণ। আচ্ছা, এখনকারদিনে বিজ্ঞানের আর কী দেওয়ার আছে বলুন তো! সবই তো আবিষ্কার হয়ে গেছে?

গণেশ মূলপ্রসঙ্গে আসার চেষ্টা করে।— স্যারের একটা কৌটো হারিয়ে গেছে। দরকারি কৌটো-থামিয়ে দিয়ে দীপ্তমানবাবু তীক্ষ্ন গলায় বলে ওঠেন— কীসের কৌটো? হীরে না জহরতের?

—না, না সেরকম কিছুর নয়।

—তাহলে? একটা সাধারণ কৌটো হারিয়ে গেছে বলে তা নিয়ে আমার সময় নষ্ট করছেন। সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর্যন্ত সময় পাইনি। বলছি মুখ্যমন্ত্রীর সভা আছে আজ এখানে। আর তার মধ্যে আমার মহার্ঘ্য সময় নষ্ট করছেন?

—না, না, এ কৌটো ঠিক সাধারণ কৌটো নয়।

—সাধারণ নয় মানে? খুব দামি?

—না না, দামি নয়।

—তাহলে? দেখুন আমার সময় একদম নষ্ট করবেন না। এমনিতেও আপনার স্যারের সম্বন্ধে নিয়মিত অনেক অভিযোগ পাচ্ছি। ওনার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন এই একসপ্তাহ আগেও। অবিনাশবাবুর কুকুরটাকে নাকি না বলে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর থেকে কুকুরটা নাকি আর অবিনাশবাবুর কথা শুনছে না।

—হ্যাঁ, সে তো 'ডগ ল্যানগোয়েজ ট্রান্সলেটর' এর উপরে এক্সপেরিমেন্ট ছিল। কুকুরের ভাষা বোঝার যন্ত্র বার করার জন্য। একই সঙ্গে কুকুরটা যাতে কিছু বাংলা কথা ভালো বুঝতে পারে সেজন্য। আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছেন। তারপরে যদি অবিনাশবাবু কুকুরকে ও অন্যদের নিয়মিত বাজে গালাগাল দেন, সে কুকুর তো মনিবের উপরে শ্রদ্ধা হারাবেই।

—এই দেখুন, মানুষে মানুষের কথা বুঝতে পারছে না। উনি আবার কুকুরকে মানুষের ভাষা বোঝানোর চেষ্টা করছেন।— একটু থেমে দীপ্তমানবাবু গজগজ করে বলে উঠলেন —ঠিকই শুনেছিলাম, বদ্ধ উন্মাদ।

—যা বলছিলাম। ওই কৌটোটা স্যার-এর খুব জরুরি। ওতে—

দীপ্তমানবাবুর আরেকটা ফোন এসেছে। মুখের কাছে আঙুল দেখিয়ে গণেশকে থামতে বলে ফোনটা ধরলেন। গণেশের সঙ্গে যে কনস্টেবল ঘরে এসেছিল তাকে ইঙ্গিতে বললেন গণেশকে ঘর থেকে বার করে দিতে। গণেশ বেরিয়ে এল।

২

—আপনি আবার এসেছেন? গতকাল বললাম নাওসব ছোটখাটো কাজ আমরা থানা থেকে করি না।— দীপ্তমানবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন গণেশ ঘরে ঢোকা মাত্র। এই একদিনেই দীপ্তমানবাবুর চোখের তলায় কালি পড়ে গেছে।

—আসলে কৌটোটা খুব জরুরি ছিল। সে বিষয়ে জানাতেই

—কী জরুরি! ওটা কি আলেকজ্যান্ডারের কৌটো না কি শাহজাহান-এর? কৌটোটা হারিয়েছে বেশ হয়েছে। আরও হারাবে। আমার একদম সময় নেই। গতকাল রাতে কী হয়েছে

শুনেছেন তো! সেসব নিয়ে আমার চাকরি যায় যায়। এর মধ্যে কৌটোর গল্প।

—কিন্তু কৌটোটাতে ওঁর

—থামুন, ফের কৌটো। — ফের থামিয়ে দিয়ে একটু নরমস্বরে দীপ্তমানবাবু ফের বলে উঠলেন— বুঝতে পারছি। হয়তো কোনও পার্সোনাল কানেকশন থেকে থাকবে। হয়তো মিস্টার পাই- এর মা বা বাবার প্রিয় কৌটো ছিল। দাম দিয়ে কী আর সব বিচার হয়? আমার কাছেই বাবার এক প্রিয় নস্যির ডিবে ছিল। সে হারানোর পরে আমারও কী মন খারাপ। তাই তো? কিন্তু ওসব কৌটো-ফৌটো খোঁজা পুলিশের কম্মো নয়। এমনিতেই কত মানুষ দিনে দুপুরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে কৌটো! গতকাল কী হল শুনেছেন নিশ্চয়ই। এসবের মধ্যে কী অন্যকিছু করা যায়।

—গতকাল ওই পঙ্গপাল হানার কথা বলছেন কি?

—হ্যাঁ, আর কিসের কথা বলব। আমাদের সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। আজকের সব কাগজের হেডলাইন দেখুন। কল্যাণগড় আর কল্যাণগড়। ভাবুন, মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে উঠেছেন, হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা মনে করলাম হয়তো ঝড় আসছে। কিন্তু সে ঝড় পঙ্গপালের ঝড়। সোজাসুজি অ্যাটাক মুখ্যমন্ত্রীর সভার উপরে। লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের। ভাবুন। আমার মতো এফিসিয়েন্ট ওসি, সেই আমি পর্যন্ত কিছু করতে পারলাম না। আমাকে পুরো নকআউট করে দিল ওই উচ্চিংড়ের বাচ্চাগুলো।

—পঙ্গপাল— গণেশ কারেক্ট করে দেয়।

—হ্যাঁ, ওই একই হল। মুখেও সে নাম আনতে ইচ্ছে করছে না। বিরোধীরা এখন পঙ্গপালদিবস উজ্জাপন করার কথা ভাবছে। বলছে সবাইকে চুপ করে রাখা গেলেও পঙ্গপালকণ্ঠ চুপ করানো যায় না। গতকাল কোনওরকমে মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এখনও মুখ্যমন্ত্রীর পঙ্গপাল ফোবিয়া যায় নি। এই খানিক আগে খবর পেলাম চিফ সেক্রেটারি হঠাৎ করে আরজেন্ট একটা বিষয় জানাতে ওনার চেম্বারে ঢুকতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পঙ্গপাল ভেবে পেপারওয়েট ছুঁড়ে মেরেছেন। এই একঘণ্টা আগের ঘটনা। এমন পঙ্গপাল-এর জন্য আমার প্রমোশনের আর কোনও চান্স থাকল না।

নিজের উপরে ধিক্কারে মাথা ঝাঁকালেন দীপ্তমানবাবু।

গণেশ তবু চুপ করে বসে আছে। সেটা দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে দীপ্তমানবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—এখনও বসে আছেন? বেরোন এখান থেকে। আপনার স্যার মিস্টার পাইকে বলে দেবেন ওসব কৌটো খুঁজতে পারব না। আর একই সঙ্গে সাবধান করে দেবেন যেন একদম উলটোপালটা কাজ না করেন। আমাদের নজর আছে ওনার উপরে।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন— এই যে আমাদের পাড়ার কালু গুন্ডা, সে বেচারা পর্যন্ত আপনার স্যারের সম্বন্ধে অভিযোগ করে গেছে দু দিন আগে। তার বন্ধু শাকরেদ কানা পঞ্চুকে নাকি আপনার স্যার ব্রেনম্যাপিং যন্ত্রের সাহায্যে কীসব করে তার অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে সমাজের জন্য ভালো ভালো কাজ না করে একটা মুদির দোকান খুলে চাল-ডাল বেচছে আর শুধু অঙ্ক কষে যাচ্ছে।

—ভালো কাজ মানে সে তো শুধু বোমা বানাতা বসে বসে।

—সে যাই হোক। সেটাও তো কাজ। অঙ্ক করে কী হবে? তা কী না কী করে তার অঙ্কের ভক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনার স্যার। এনিয়ে সেদিন আবার কালু আমাকে ধমকি দিয়ে গেল।

—তাহলে উঠি স্যার, শুধু কৌটোটার ব্যাপারে—

—খবরদার, কৌটো নিয়ে আর একটা কথাও শুনতে চাই না।— উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন দীপ্তমানবাবু। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন।— উঠুন। আমাকে এখন পঙ্গপাল নিয়ে তদন্ত করতে হবে। আমার প্রমোশনটা এবারেও হল না।— দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দীপ্তমানবাবু।

—ওই পঙ্গপালের ব্যাপারটা কী হয়েছিল স্যার সেটা জানেন।

—মানে? এতক্ষণ সেটা বলেন নি!— লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দীপ্তমানবাবু।— কী করে?

—আসলে পঙ্গপাল এমনিতে সলিটারী পোকা অর্থাৎ একা একা থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু ভারী বর্ষণে যখন জলা জঙ্গল বেড়ে যায়, তখন একটা বিশেষ ফেরোমন এদের শরীরে বেড়ে যায়। এদের ব্যবহার পালটে যায়। তখন এরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের দল গড়ে তোলে আর একসঙ্গে খাবারের সন্ধানে দিনে একশো মাইল পর্যন্ত উড়ে চলে। পথে শস্যক্ষেত, ফসল যা পায় সব খেয়ে ধ্বংস করে ফেলে। তার জন্য আমাদের দেশে চাষিদের পঙ্গপাল হানায় এত ক্ষয়ক্ষতি হয়।

—আরে বাবা পঙ্গপাল নিয়ে লেকচার দিতে কেউ বলেনি। বলি এটা তো শস্যক্ষেত নয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সভা। সেখানে হঠাৎ হানা দিল কেন?

—আসলে পঙ্গপালের ঝাঁক মাঝে মধ্যে ভারতের বিভিন্ন শস্যক্ষেতে হানা দিয়ে যেভাবে সব নষ্ট করে দেয়, তার জন্য অনেক চাষি প্রতি বছরে আত্মহত্যা করে। যদি এদেরকে কোনওভাবে অন্য কোনওদিকে পাঠানো যায়, বা এদের যাত্রাপথ পালটে দেওয়া যায়, সেজন্য স্যার পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন। উনি একটা কেমিক্যাল তৈরি করেছেন যারনাম '৪-ভাইনাইল অ্যানিসোল'। এই কেমিক্যালের গন্ধ পঙ্গপালের দল চারশো মাইল দূর থেকেই

পায়। এর গন্ধের টান ওরা কোনওভাবে এড়াতে পারে না। এভাবে ওদের ফাঁদে ফেলা যেতে পারে। অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ওনার পরীক্ষা ঠিক সেদিকেই এগোচ্ছিল।

—মানে? হোয়াটডু ইউ মিন? গতকালের ঘটনার পিছনেও কী মিস্টার পাই? ক্রিমিন্যাল কন্সপিরাসি, মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলা, ১০০ বছর জেল— কাঁপতে কাঁপতে দীপ্তমানবাবু বলে উঠলেন।

—ওই জন্যেই তো কৌটোটা খুঁজছিলেন স্যার। ওতেই ওই কেমিক্যাল রাখা ছিল। উনি মাঠের মধ্যে রেখে দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন ঠিকভাবে কাজ করে কিনা অর্থাৎ আশেপাশের সব পঙ্গপালের ঝাঁককে এদিকে নিয়ে আসা যায় কিনা। সে জায়গায় তার উপরেই মাঠের মধ্যে আপনারা যে সভা করবেন, তা কে জানত! তাও যখন আন্দাজ করলাম, আমার কথা আপনি তো কাল শুনতেই চাইলেন না।

—মাই গড। কী সর্বনাশ।— বলে চেয়ারে ফের ধপ করে বসে পড়লেন দীপ্তমানবাবু।

গণেশ ফের বলে উঠল— আপনাকে স্যার আজ নিয়ে যেতে বলেছেন। মিষ্টি খাওয়াতে। কৌটো শুধু পাওয়া গেছে বলে নয়, পরীক্ষা দারুণ ভাবে সাকসেসফুল। বিশেষ করে এত ভিড়ের মধ্যেও যে ওটা এভাবে কাজ করবে, সেটা স্যার একদম আন্দাজ করতে পারেননি! আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এত সুন্দরভাবে পরীক্ষা সম্ভব ছিল না।

নিয়ম যখন ভাঙে

কাচের জানলার বাইরে তাকাল দীপন। বাইরে নীল আকাশ। যেন ছবির পাতা থেকে উঠে এসেছে। দূরে কম্পাউন্ডের দেওয়ালের উপর একটা চিল বসে আছে। কি যেন দেখে, ডানা দুটো স্থির রেখে কম্পাউন্ডের মধ্যে একপাক খেয়ে বাইরে চলে গেল। ইস, দীপনও যদি এত সহজে এই 'আরওগ্য'-র বাইরে যেতে পারত!

ছোট থেকে ও এখানেই আছে। ও একা নয়— ওর বয়সি, ওর থেকে বড় আরও অনেকে আছে। ওরা প্রত্যেকেই ক্লোন। ছোটবেলা থেকে ক্লোনদের সরল নীতি ও রোজ মুখস্থ করে এসেছে। প্রথম নীতি— ক্লোনদের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য। তার জিনদাতাকে রক্ষা করা— প্রয়োজন মতো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় নীতি-ক্লোনদের তার নিজের জীবন রক্ষার অধিকার থাকবে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ না প্রথম নীতির জন্য সে অধিকার ভাঙতে হয়। ক্লোনদের যাবতীয় খরচ তার জিনদাতাই বহন করে। পরিবর্তে, যখন দরকার হয় তখনই জিনদাতা ক্লোনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারে।

ওদের এখানে তাই অন্য জগৎ। ওরা বাইরের কারুর সঙ্গে মেশে না। বাইরের কোনও খবর রাখতে দেওয়া হয় না। সবকিছু নিয়মে বাঁধা। সময় বেঁধে পড়া, স্বাস্থ্যচর্চা, খেলা, খাওয়া, ঘুমোনো। সুস্থ না থাকলে অঙ্গদান করবে কি করে! সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু দেড়বছর আগে এই 'আরওগ্য'তে একজন লোক এসেছিল— সবার জন্য চকলেট, মিষ্টি এসব নিয়ে। কোনও একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজ করে। ওই লোকটা বেশ কয়েকটা গল্প বলেছিল। তারমধ্যে একটা ছিল বাবা-ছেলের গল্প। ছেলের মৃত্যুর ভুল খবর পেয়ে সে লোকটা যুদ্ধক্ষেত্রে সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে শত্রুসেনার হাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এটা শোনার পর দীপন শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল— বাবা কি হয়?

শম্ভু ওদের সবার দেখাশোনা করে। রোবট। ও বলেছিল—

—আমি কি জানি! আমি হলাম মুখ্যুসুখ্যু রোবট। আমাদের কি আর বাবা হয়? তবে বাবারা খুব ভালো হয়, একথা আমি শুনেছি।

—আমাদের বাবা হয় শম্ভুদা?

—হ্যাঁ, হয় বইকি! তোমরা তো মানুষ। যার থেকে জিন নিয়ে তোমায় তৈরি করা হয়েছে — তুমি যার ক্লোন— সেই তো তোমার বাবা।

—বাবা এখানে কখনও আসে না কেন শম্ভুদা?

—সে কি আর আমি জানি? এটাই নিয়ম।

এর বেশি আর কোনও উত্তর পায়নি দীপন। এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। এটাই আরোগ্যের নিয়ম।

হঠাৎ শম্ভু এসে ঘরে ঢোকে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। তোমার বাবা আসবে।

—বাবা? এত অবাক দীপন আগে কখনও হয়নি। শম্ভুর কথায় বিশ্বাস হল না দীপনের—সত্যি বলছ শম্ভুদা?

—হ্যাঁ, নয়তো কি? এই তো স্যার জানাতে বললেন বলেই এলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন— বলে শম্ভু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর আরও অনেক কাজ আছে। এই আরোগ্যতে যে চৌত্রিশ জন বাসিন্দা আছে তাদের সবার দেখাশোনার ভার শম্ভু আর হরির ওপর। তাই একফোঁটা সময় নেই ওর।

দীপন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। আনন্দে কি করবে ঠিক করতে পারে না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্যাসেজ দিয়ে ছুটতে শুরু করে। হাতদুটো প্লেনের ডানার মতো ছড়িয়ে। প্রথমেই ছুটে এসে ঢোকে অনিমেষ জ্যেঠুর ঘরে। অনিমেষ জ্যেঠুই দীপনের সবথেকে বন্ধু। সবরকম খবর তাই প্রথমে অনিমেষ জ্যেঠুকেই শোনায় দীপন।

—জ্যেঠু, জ্যেঠু-বাবা আসবে। শম্ভুদা বলল।

যতটা খুশি হওয়ার কথা— অনিমেষ জ্যেঠু সেরকম কিছুই খুশি হল না।

—কি, ফোন করেছিল?

—তা জানি না—শম্ভুদা জানে। তবে আসছে শিওর।

—শম্ভু আর কিছু বলেছে? কেন আসবে?

দীপন মাথা নাড়ল। বাবা আসছে। এটাই বড় কথা। কেন আসছে তা নিয়ে দীপনের কোনও মাথাব্যথা নেই।

অনিমেষ জ্যেঠু দীপনের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে আনমনে কি যেন ভাবতে লাগল। অনিমেষের বয়স পঞ্চান্ন। এই পঞ্চান্নটা বছর ও কাটিয়েছে 'আরোগ্য'-র চার স্কোয়ার মাইল এলাকার মধ্যে। ওর একরঙা জীবনে ও বাবার দেখা পেয়েছে মাত্র দু'বার। শেষবার বছর পনেরো আগে। কিডনি অপারেশনের সময়। ওর কিডনি ওর বাবার কাজে লেগেছিল। দিতে পেরে খুশিই হয়েছিল ও। এ জন্যেই তো ওর বেঁচে থাকা।

তবু অনিমেষের মাঝেমধ্যে খটকা লাগে। ওর বাবার নাম অরিজিৎ। দেখতে ঠিক ওরই মতো। হওয়ারই কথা। ওর জিনের গঠন তো হুবহু ওর বাবারই মতো। কিন্তু ওই চেহারাতেই

যা মিল। ওর বাবা একটা ব্যাঙ্কে খুব উঁচু পোস্টে কাজ করেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। আর অনিমেষ! অনিমেষের সারাজীবন কেটেছে এই 'আরোগ্য'-র চার স্কোয়ার মাইলের মধ্যে।

এই আরোগ্য-তে কোনও বই নেই, ইন্টারনেট নেই, কোনও কিছু জানার অধিকার নেই। কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়ারও অনুমতি নেই।

অনিমেষ অবশ্য এখন এই জীবনেই অভ্যস্ত। কিন্তু দীপনের কথাটা মনে হতেই মনটা কেমন যেন করে উঠল। ওর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে অনেকবার ও দেখেছে ওর ক্লোজ বন্ধুরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর ফেরেনি। পরে শুনেছে দ্বিতীয় নীতির কথা। প্রাণ দিয়ে জিনদাতাকে বাঁচানোর মহৎ গল্প।

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল— শম্ভুর কাছে খোঁজ নিতে। কেন দীপনের বাবা আসছে তা জানা দরকার।

দীপন ততক্ষণে ছুটেছে বিল্টু, চয়ন, অর্ণব-এর কাছে। প্রথমেই বিল্টুর সঙ্গে দেখা। দাঁত ব্রাশ করছিল। বিল্টুকে খানিকটা চমকে দিয়েই দীপন বলে উঠল— 'জানিস শম্ভুদা বলল বাবা আসবে।' বিল্টুর বয়সও দীপনের মতোই, ওরও আজ অবধি বাবার সামনাসামনি হওয়ার সুযোগ হয়নি।

খবরটা এতই অবাক করার মতো যে কোনওরকমে পেস্টটা গিলে ফেলে ও বলে উঠল— বলিস কিরে! দাঁড়া, রাতুলকে খবরটা দিই।

দুজনে মিলে রাতুলের ঘরে ছুটল। রাতুল ডেস্কে বসে খাচ্ছিল। কথাটা শুনে মুখ ভেংচে বলে উঠল— সে আবার বড় কথা কি? আমার বাবাও তো তিনমাস বাদে আমার জন্মদিনে আসবে বলেছে।— বলে আবার খাওয়ায় মন দিল। রাতুল এরকমই। একটু হিংসুটে প্রকৃতির।

ইতিমধ্যে দীপনের ফোনটা বেজে উঠেছে। শম্ভুদার ফোন।

—শোন, ডাক্তারবাবু এসেছে। তোমার টেস্ট করবে। এই ডাক্তারবাবু লোকটাকে দীপনের একেবারেই পছন্দ নয়। এলেই এই ভ্যাকসিন— ওই ভ্যাকসিন— সারাক্ষণ ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে ঘোরে।

—কেন শম্ভুদা? এই তো সেদিন ডাক্তারবাবু টেস্ট করে গেল।

—আহা, আমি কি আর শতশত জানি! আমি হলাম গে মুখ্যুসুখ্যু রোবট। তুমি হল ঘরে চলে এসো।

অগত্যা দীপন ধীরে সুস্থে হল ঘরের দিকে এগোল। ডাক্তারবাবু যথারীতি সুট-টাই পরে এসেছে। দীপনকে দেখামাত্র বলে উঠলেন— ভয় পেও না দীপনবাবু। টুক করে কয়েকটা টেস্ট সেরে নেব। টেরও পাবে না।

মিনিট পনেরো টেস্ট করে ডাক্তারবাবু দীপনের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন— পারফেক্ট। সব ঠিক আছে। অনিমেষ জ্যেঠু পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বলে উঠল— ডাক্তারবাবু কি ট্র্যান্সপ্লান্ট হবে?

—হার্ট।

সে কী? তাহলে দীপনের কী হবে?

—আপাতত শুয়োরের হার্ট বসিয়ে দেব। ভয় নেই। এরকম কেস আকছার হচ্ছে। দীপন দুদিনেই আবার ছুটবে।

দীপনের অবশ্য এসবে কোনও ভয় নেই। ওর একটাই চিন্তা— বাবা শেষমেষ আসবে তো? তা না হলে রাতুল যা পিছনে লাগবে!

ঘরে গিয়ে চট করে চান করে জামাকাপড় পরে নিল দীপন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিল। বাবাকে কি একইরকম দেখতে? নীল বলছিল বাবাদের গোঁফ থাকে। পেন দিয়ে একটা গোঁফ এঁকে নিল দীপন। ইস মোটেও ভালো লাগছে না। অনেক লম্বা? আয়নার মতো? রাগী নয় তো! একটু যেন ভয় লাগল দীপেনের। বই-জামা কাপড় সব গুছিয়ে রাখল। যদি ঘরে আসে! পরশু শেখা ইংরেজি কবিতাটা দু'বার আওড়ে নিল। বাবাকে শোনাতেই হবে। আর একটা গল্প বলতে পারলে আরও ভালো হত। অনিমেষ জ্যেঠু যে ভূতের গল্পটা বলেছিল সেটা অবশ্য খানিকটা মনে আছে।

দীপনের এই ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ শুভ এসে হাজির।

—এ্যাই, শুনলাম তোর বাবা আসছে?

—হ্যাঁ, এই এক্ষুনি এসে পড়বে।

— তা, বাবাকে কী দিবি?

—হার্ট। পট করে বলে ফেলল দীপন।

—আরে ও দেওয়া নয়— কোনও গিফট দিবি না?

তাই তো! একথাটা তো একদমই খেয়াল হয়নি। কিন্তু কী দেওয়া যায়?

জিজ্ঞেস করতে শুভ বেশ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল— চশমা, আসলে শুভ ওর বাবাকে এক ছবিতে চশমা পরতে দেখেছে। তাই ওটাই আগে মনে এল।

কিন্তু দীপন চশমা এখন কোথায় পাবে? অনেক ভেবে ও ঠিক করল যে একটা ছবিই এঁকে দেবে। রং-পেনসিল নিয়ে আঁকতে বসে গেল ও। কতক্ষণ আঁকছিল কে জানে? হঠাৎ হুঁশ ফিরল। বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ছুটে চলল শম্ভুদার কাছে।

—শম্ভুদা, বাবা কখন আসবে?

—বলল তো ফোনে জানাবে। দাঁড়াও ফোন করে দেখি।

ফোন খানিকক্ষণ বেজে গেল। কেউ ধরল না।

—দাঁড়াও, পরে আবার ফোন করব। তুমি ঘরেই থেকো।

দীপন ঘরে ফিরে আসে। ঘড়ির সামনে বসে থাকে। নটা-দশটা-এগারোটা- বারোটা। ঘড়ির কাঁটা এগিয়েই চলেছে। দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়ে।

—শম্ভুদা আমি এখন খাব না। আমার খিদে পায়নি।

—আহা, রাগ করছ কেন? দাঁড়াও, আমি আবার ওনাকে ফোন করি। এবার শম্ভুর ফোনে উলটোদিকে থেকে সাড়া মেলে।

—হ্যালো, আমি অনিরুদ্ধ বলছি।

—হ্যালো স্যার, আমি আরোগ্য-র কেয়ারটেকার শম্ভু বলছি। আপনি কখন আসবেন? দীপন অপেক্ষা করছে সকাল থেকে।

—নাহ, আসার দরকার হবে না। এইমাত্র ডাক্তার বলে গেল এখন আর তেমন রিস্ক নেই। পরে দরকার হলে যোগাযোগ করব।

—হ্যালো, হ্যালো স্যার! দীপেনকে কী বলব? ও যে কাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছে। বাচ্চা ছেলে তো— আপনার জন্য ছবি এঁকেছে। আপনি না এলে খাবে না বলছে।

—আমার জন্য!—আকাশ থেকে পড়ে অনিরুদ্ধ। একটু থেমে বলে ওঠে।— শম্ভু, তুমি তো নিয়মকানুন জানোই। আমার দেখা করাটা ঠিক হবে না। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেলে ভারী মুশকিল। বলে দিও-বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নাহ-তানা বলো অফিসের কাজে আটকে পড়েছে। পরে একদিন আসবে।

ফোন কেটে যায়।

দীপনের দিকে তাকিয়ে শম্ভু বলে ওঠে—ভারী মুশকিল হল তো! উনি আসছিলেন, হঠাৎ 'ভারী দরকারি কাজ পড়ে গেছে। পরে একদিন আসবেন।

শম্ভুর কথায় বাধা আসে। আবার ফোন বাজছে। অনিরুদ্ধবাবুর ফোন।

—শম্ভু, ছেলেটার নাম কী যেন?

—দীপন।

—ওর কবে যেন জন্মদিন?

—16 অক্টোবর।

—ওকে বলো ওর জন্মদিনে আমি আসব। একটু থেমে আবার বলে— ফোনটা ছেলেটাকে দাও তো। কাছে আছে কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি।

শম্ভু ফোনটা দীপনকে বাড়িয়ে দেয়। ওদিক থেকে কী কথা বলছে শোনা না গেলেও দীপনের মুখ-চোখের চেহারা দেখে মুচকি হাসে শম্ভু। এত খুশি আগে কোনওদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। দীপন একটা কবিতা বলছে ফোনে। ফোনে কথা চলতেই থাকে—অনেকক্ষণ ধরে।

শম্ভু মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। এটা 2065 সাল। এখনও নিয়ম ভাঙে। এভাবেই। শম্ভুর মাথায় এসব ঢোকে না। ও হল গিয়ে মুখ্যুসুখ্যু রোবট। তবু নিয়ম ভাঙলে খুব ভালো লাগে ওর।

রাজাবাবু

কিছুদিন হল মানিকবাবুর সময় বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। এক মাস আগে মেয়েটা হঠাৎ পড়ল জন্ডিসে। বাড়াবাড়ি রকম। ডাক্তার-চিকিৎসা—এসব নিয়ে অনেক খরচ হয়ে গেল। গত পরশু ভিড় বাসে পকেটমার হল। পাঁচশোর মতো টাকা ছিল তাতে। তা ছাড়া বেশ কয়েকটা দরকারি কার্ড। সব মিলিয়ে ঝামেলার একশেষ। গতকাল খাটের ওপর রাখা শখের চশমার ওপর বসে পড়লেন ভুল করে। গেল সাধের চশমাটা। আগেই অবশ্য কাচদুটো ঘষা খেয়ে খেয়ে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। এমনিতেও বদলাতেই হত। তবুও। এগুলো তো তাও সব ছোটখাটো ক্ষতি, সামলে নেওয়া যায়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল সকালের কাগজটা খুলে। দশ বছর ধরে আস্তে আস্তে কিস্তিতে একটা জমি কিনছিলেন, এত বছর দু-কামরার একটা ভাড়া বাড়িতে আছেন। ভেবেছিলেন বাড়ি করলে একটা নিজস্ব জায়গা হবে। ছেলেমেয়ের জন্য কিছু একটা রেখে যেতে পারবেন।

কিন্তু না, যাদের কাছ থেকে জমিটা কিনছিলেন তার মালিক নাকি নানানরকম জমি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত। রাতারাতি উধাও। আর সে-খবরটা বেশ ফলাও করে কাগজে বেরিয়েছে।

অতগুলো টাকা। জীবনে আর বাড়ির শখটা পূর্ণ হবে না ওনার। আর এক বছর পরে অবসর। আর বাড়িতেই বা কী বলবেন।



দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারান্দায় গিয়ে মানিকবাবু। শ্রাবণ মাস। রাতভর বৃষ্টির পর আকাহ পরিষ্কার, পাশের বাড়ির পাঁচিলের ওপর একটা সাদা বেড়াল ভারি নিশ্চিন্তে বসে আছে। পরশুদিনের ঝড়ে উলটোদিকের নিমগাছে কাকেদের বাসাটা ভেঙে গিয়েছিল। আবার খড়কুটো জোগাড় করে ওরা বানানোর চেষ্টা করে চলেছে। স্কুলের বাচ্চাদের একটা গাড়ি এসে ঢুকেছে। হইচই করতে করতে সার বেঁধে বাচ্চারা গাড়িতে উঠছে। এসব দেখে বেশ খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন, ঘোর কাটল গিন্নির ডাকে— বাজার করতে যেতে হবে।

এই বাজার করার কাজটা মানিকবাবুর কোনওদিনই পছন্দ নয়। গত সপ্তাহ থেকে কাজটা ওনার ঘাড়ের ওপর চেপেছে।

এক্ষেত্রে, মানিকবাবুর সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে হয়। ওনার হাবেভাবে, চালচলনে একটা রাজা-রাজা ভাব আছে। আর তাই রিকশাওয়ালারা ওনাকে দেখলেই দশ টাকার জায়গায় পনেরো টাকা ভাড়া চায়। দোকানে কেউ চেঞ্জের টাকা ওনাকে ফেরত দেয় না। উনি দরদাম করে কিছু কেনেন না।

মাসের প্রথম চারটে দিন ট্যাক্সিতে করেই যাতায়াত করেন মানিকবাবু। তারপর আবার বাস-মেট্রো-ট্রাম। কোনও ভিখারিকে খালি হাতে ফেরান না উনি। জীবনে কম রোজগার করেননি। কিন্তু তার বেশিরভাগটাই গেছে অন্যদের সাহায্য করতে গিয়ে। এমনকী বাড়িতে চাঁদা চাইতে এসেও পাড়ার ছেলেরা যা আশা করে আসে, তার থেকে অনেক বেশি নিয়ে ফেরে। কোনও অতিথি এসে না খেয়ে ফিরে যায় না মানিকবাবুর বাড়ি থেকে। আর তা ছাড়া আপদে-বিপদে লোককে উপযাচক হয়ে সাহায্য করা তো আছেই। এ জন্যই বিশেষ অর্থ কখনো সঞ্চয় হয়নি।

কিন্তু সময় তো চিরকাল একরকম যায় না। বহুদিনের পুরনো চাকর গণেশ বয়সের জন্য অবসর নিয়ে দেশে চলে গেছে একসপ্তাহ আগে। তার পরেই বাজার করার গুরুদায়িত্বটা ওনার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

বাজারের থলিদুটো হাতে নিয়ে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলেন মানিকবাবু, বাজার অগ্নিমূল্য। খানিকক্ষণের মধ্যেই টের পেলেন বাজারের লিস্টে যা ছিল, তার অর্ধেক কিনতেই টাকা প্রায় শেষ।

কারণ অবশ্য আরেকটাও আছে। পাঁচশো বেগুনের জায়গায় পাঁচকেজি বেগুন নিয়েছেন। দুশো পেঁয়াজের জায়গায় এককেজি পেঁয়াজ নিয়েছেন।

আসলে ছোট ছোট বাজার করা মানিকবাবুর পোষায় না। তা ছাড়া কোনও কিছু দর করে কিনতে বা দরাদরি করতেও মানিকবাবুর গায়ে লাগে। কেনার শেষে দোকানি যা বলে সেই দাম দিয়ে দেন। গরিব লোক এরা— এদের সঙ্গে আবার দরাদরি কী!

বাজারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অতীনবাবুর সঙ্গে। অতীনবাবু একটা সংস্থা চালান যারা গরিব স্কুল পড়ুয়াদের অর্থসাহায্য করে। মানিকবাবু নিজে নিয়মিত এদের অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

অতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই মানিকবাবুর একটু আত্মগ্লানি হল। গত একমাস উনি টাকা দিতে পারেননি। মেয়ের অসুস্থতার পর থেকেই তার টাকার টান পড়েছে। উনি ঠিক করে

ফেললেন যে আর বাজার না করে সে-টাকাটা জমিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই এদের দিয়ে দেবেন।

ততক্ষণাৎ বাজার শেষ করে কোনওরকমে দুটো ভারী ব্যাগ দু-হাতে ব্যালান্স করে এগোচ্ছেন, হঠাৎ করে একটা রোগা ছোটখাটো লোক ওনার দিকে এগিয়ে এল। একটা সাধারণ হাফহাতা রংচটা জামা, খয়েরি রঙের প্যান্ট।

—রাজাবাবু, চলুন, ব্যাগটা আমাকে দিন। আপনাকে কষ্ট করে বইতে হবে না।

রাজাবাবু। কথাটা ভারী পছন্দ হল মানিকবাবুর। প্রতিবাদ করে উঠলেন না, না কিছু ভাববেন না। আমি পারব। আপনি কষ্ট করবেন কেন? আর, আপনাকে তো চিনলাম না।

যদিও মুখটা একটু চেনা চেনাই লাগল মানিকবাবুর।

—আমি কি আর সেরকম কোনও কেউকেটা লোক নাকি রাজাবাবু, যে আপনি চিনবেন! ওই ওদিকে থাকি। তবে আপনাকে আমি বেশ চিনি। আপনার বড় দয়ার শরীর। দিন, দিন থলেদুটো দিন। আপনার কি আর ওসব নেওয়ার অভ্যাস আছে!

অগত্যা মানিকবাবু নাছোড়বান্দা লোকটার হাতে থলিদুটো দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। লোকটা মানিকবাবুর বাড়ির তলায় এসে থলেদুটো ফের মানিকবাবুর হাতে দিয়ে বলল, খুব ভালো লাগল রাজাবাবু আপনার দেখা পেয়ে। আসি।

মানিকবাবু কী করবেন— লোকটাকে টাকা দেবেন কি দেবেন না— ভাবার আগেই লোকটা চলে গেল। নাহ, এখনও ভালো লোক আছে। এভাবে এগিয়ে এসে সাহায্য করা।

পরবর্তী কয়েকদিন একই ব্যাপার হল। মানিকবাবুর বাজার শেষ হতে না হতেই কোত্থেকে লোকটা এসে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা নিয়ে নেয়। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে আবার চলে যায়। এমন ভদ্র ব্যবহার যে টাকা দিতেও খারাপ লাগে। তবে লোকটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, এ-ব্যাপারে মানিকবাবু নিশ্চিত। জিগ্যেস করলে বলে, রাজাবাবু, সামান্য প্রজা আমরা। আমাদের নাম-পরিচয় জেনে আপনার কী হবে বলুন!

এর পর পরই বেশ কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সোমবার। অফিস থেকে বেরিয়ে সেদিন বেশ খানিকক্ষণ কোনও বাস পাচ্ছিলেন না মানিকবাবু। শেষপর্যন্ত এক বাদুড়-ঝোলা বাসের পাদানিতে একটা পা দিতে-না-দিতে বাসটা ছেড়ে দিচ্ছিল। পড়েই যাচ্ছিলেন মানিকবাবু। হঠাৎ করে কে যেন হাত ধরে টেনে বাসের মধ্যে তুলে নিল। তারপর মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠল, এ ভিড় বাসে ওঠা আপনাকে মানায় না রাজাবাবু।— বলে লোকটা বাসের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। মুখটা আর দেখা গেল না।

তার পরদিনের ঘটনা, অটো থেকে নামার ঠিক আগে মানিকবাবু খেয়াল করলেন মানিব্যাগে মোটে একটা একশো টাকার নোট পড়ে আছে। খুচরো নেই। আর সেটা দিলে অটোচালকের

মুখে যে ধরনের গালাগাল শুনতে হবে তা ভেবে একটু ভয়ই পেয়েছিলেন। হঠাৎ পাশ থেকে চশমা পরা ভদ্রচেহারার এক যুবক বলে উঠল, ভাববেন না রাজাবাবু, আমি আপনার ভাড়াটা দিয়ে দেব।

মানিকবাবু দ্বিধা করছিলেন, কিন্তু শেষে ছেলেটার পীড়াপীড়িতে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মানিকবাবু অটো থেকে নেমে গেলেন। কী ব্যাপার! হঠাৎ যেন শহরটাই পালটে গেছে। সবাই যেন ভদ্র-বিনয়ী-উপকারী হয়ে গেছে। মনে মনে ভারী খুশি হলেন মানিকবাবু।

এর দুদিন পরের কথা। অনড়রতই বউ-এর পীড়াপীড়িতে, যে সংস্থায় টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন, সেখানে গেলেন মানিকবাবু। সংস্থার মালিক ফিরে এসেছে— এরকমই খবর। বাইরে বেশ ভিড়। পুলিশের পাহারা। টানা দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সংস্থার মালিক গুপ্তাজির চেম্বারে ডাক পেলেন।

গুপ্তাজি বেশ রাশভারী প্রকৃতির। গুন্ডা-ষণ্ডা চেহারা। চেম্বারের মধ্যে একটা বুলডগ ছাড়া আছে। সেটা মানিকবাবুর গা ঘেঁষে এসে বসল।

দরজার বাইরে দুজন গুন্ডাশ্রেণির লোক দাঁড়িয়ে আছে। গুপ্তাজির চেম্বারের পিছনের দেওয়ালে একটা বড়সড়ো ছবি। তাতে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গুপ্তাজি দাঁড়িয়ে আছেন।

এসব দেখে একটু কাঁচুমাচু মুখেই বলে ফেললেন মানিকবাবু কথাটা— চার বছর আগে জমি পাওয়ার কথা ছিল গুপ্তাজি, এখনও তো কিছুই হল না। টাকাটা কি ফেরত পাওয়া যাবে?

কথাটার মধ্যে গুপ্তাজির একটা ফোন এসেছিল। ফোনটা ধরে বেশ কিছুক্ষণ গুপ্তাজি কার সঙ্গে কোনও একটা পার্টিতে যাওয়া নিয়ে কথা বললেন। তারপর ফোনটা ছেড়ে পানের পিকটা পাশে রাখা একটা পাত্রে ফেলে ফোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন, আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্টার। রাতে একসঙ্গে পার্টি আছে।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, টাকা ফেরত লিবেন না, অবশ্যই লিবেন না, অবশ্যই লিবেন। বলে ডেকে উঠলেন বাবুয়া! এ বাবুয়া—

বাইরের গুন্ডা চেহারার লোকদুটোর মধ্যে একজন ঘরে প্রবেশ করল।

—বাবুয়া, এক লাখ ক্যাশ দে দো। তা মানিকবাবু চা-কফি কিছু লিবেন?

—এক লাখ! আমি তো প্রায় কুড়িলাখ টাকা দিয়েছি গুপ্তাজি।

—হাঃ হাঃ, উনিশ লাখ তো খরচখরচা হয়ে গেছে। বিজনেসে কত খরচ হয় জানেন তো? মাটি ফেলেছি, রাস্তা করেছি, গাছ লাগিয়েছি। কত প্রমোশন হয়েছে। আপনাদের কি এক

নামকরা অ্যাকট্রেস আছেন— ভেরি সুইটি—উনি এত টাকা লিয়েছেন অ্যাড-এর জন্য। টাকা কি আর আমার কাছে পড়ে আছে? ওসব কি আপনার বোঝার বাত আছে। লিন— কফি খান।

—কিন্তু গুপ্তাজি, আমি তো কালও গিয়ে দেখলাম— পাঁচ বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই। কোথায় রাস্তা, কোথায় জমি? চারদিকে সেই একইরকম শস্যক্ষেত—চারদিকে জংলা গাছ। কিছুই তো হয়নি।

তবে কি আমি ঝুটাবাত বলছি!— চেঁচিয়ে উঠলেন গুপ্তাজি।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও মানিকবাবুর দিকে মুখ ঘোরাল। ক্ষমতা থাকলে মিথ্যে কথাও এভাবে জোর দিয়ে বলা যায়।

আরও দু-এক কথার পরে মানিকবাবু ওই সংস্থার অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। শরীর অত্যন্ত খারাপ লাগছে। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এটুকু বুঝেছেন যে ওনার পক্ষে এ ধরনের খারাপ এলাকের হাত থেকে টাকা বার করা সম্ভব নয়। এদের সঙ্গে গুন্ডা আছে, বড় নেতারা আছেন। এ-টাকার খানিকটা পেলেও ভারী সুবিধে হত। অতীনবাবুর ছাত্রবন্ধু সংস্থার দশটা ছেলের পড়ার খরচ চালান মানিকবাবু। তাদের সংখ্যাটা আরও বাড়ানো যেত। অনেকেরই পড়া বন্ধ হয়ে যায় টাকার অভাবে। আর একটা ছাত্রের পড়া বন্ধ মানে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নষ্ট। ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি করেছেন এলান নিয়ে। তারও কিছুটা শোধ দেওয়া যেত।

এসব ভেবে শরীরটা বেশ খারাপ লাগল। একটু দূরে একটা চায়ের দোকান ছিল। এক কাপ চা নিয়ে বসলেন, চিন্তাভাবনাগুলো এলমেলো হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশ থেকে কার 'রাজাবাবু' ডাকে চমকে উঠলেন। পাশে একটি মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এসে বসেছে। তার মুখেই এ সম্বোধন। অভাবি চেহারা, নাকটা বেশ বড়। টাকমাথা।

—রাজাবাবু, এই আপনার চেকটা নিয়ে এলাম।

—চেক! কীসের চেক?

লোকটা একটা চেক এগিয়ে দিল। মানিকবাবুর নামে— কুড়ি লক্ষ টাকা। গুপ্তাজির সংস্থার নামে। গুপ্তাজির সইসহ।

চমকে উঠে মানিকবাবু বলে উঠলেন, সে কী? দিচ্ছিল না যে, পরে মত পালটাল নাকি। না, লোকটা এত ভালো তা বুঝিনি তো!

লোকটা বলল, মত কি আর এমনি এমনি পালটায়। একটু বোঝালাম, ভালোমন্দ— দু-একটা চড়-থাপ্পর। যান, চিন্তা করবেন না! এই চেক বাউন্স হবে না। আমি তো আছি।

খানিকক্ষণ মানিকবাবুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। চোখ ছলছল করে উঠল— আপনি, আপনি— বড় উপকার করলেন। বড় দরকার ছিল টাকাটার। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না। আপনি আমাকে চেনেন?

—আপনি হলেন আমাদের রাজাবাবু— আপনাকে চিনব না!

লোকটা উঠে দাঁড়াল। মানিকবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার হাতদুটো জড়িয়ে বলে উঠলেন, আপনার নামটা?

—আমরা হলাম সামান্য প্রজা। আমাদের নাম পরিচয় জেনে কী হবে বলুন। কোনও দরকার হলেই আমি আবার চলে আসব।

সামনে দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স প্রবল আওয়াজ করে যাচ্ছিল। ওর দিকে আঙুল তুলে লোকটা বলে উঠল, এই যে, গুপ্তাজিকে নিতে এসেছে। মারধরটা একটু বেশি হয়ে গেছে তো! ভারি দুষ্টু লোক। যাই— আমি উঠি।

—তা ভাই, হঠাৎ করে আপনি আমার এত বড় উপকার করলেন কেন বলুন তো? আজকাল মনে হচ্ছে চারদিকের সব এলাকেরা যেন হঠাৎ করে ভালো হয়ে গিয়েছে। বাজার করতে গেলে এলাকে সেধে এসে সাহায্য করে। বাসে-অটোতেও সাহায্য করে। বিপদে পড়লে এগিয়ে আসে। কী ব্যাপার বুঝি না।

লোকটা হেসে উঠল— ওসব ব্যাপার সব বোঝানো যাবে না। আপনি হলেন গিয়ে আমাদের রাজাবাবু।

লোকটা প্রায় চলেই যাচ্ছিল। কোনওরকমে তাকে মানিয়ে মানিকবাবু প্রশ্ন করে উঠলেন, আচ্ছা, 'রাজাবাবু' কথাটা আজকাল প্রায়শই শুনছি কেন বলুন তো। এমনি কথাটা শুনতে মন্দ লাগে না।

লোকটা এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলে উঠল, আপনি তো বড় ভালোমানুষ রাজাবাবু। আপনার মনে পড়ে দমদম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কাছে একজন বুড়ো শুয়ে থাকত। তাকে মাঝেমধ্যেই আপনি খাবারদাবার কিনে দিতেন। শীতে শাল কিনে দিতেন, মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। কিন্তু তাকে তো আজকাল আর দেখি না।

—দেখবেন কী করে! সে তো ছ'মাস হল মারা গেছে।

—আহা রে! এ আবার বড় ব্যাপার কী? ওরকম অভাবী লোক— দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

—মনে পড়ে রাজাবাবু, বেশি টাকা খরচ হবে বলে আপনার নিজের ছেলেমেয়েকে কোনওদিন ভালো স্কুলে পড়াননি। অথচ আর দশটা ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতেন।

ছাত্রবন্ধু সংস্থার এরকম অনেক ছেলের পড়ার খরচ চালাতেন। বিপুলকে মনে পড়ে রাজাবাবু! আপনার সাহায্য না পেলে বিপুল কি আজ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত? কেই বা ছিল ওর বলুন।

—ও, তাহলে আপনি বিপুলের কেউ হন, তাই তো?

—আমি হলাম বিপুলের বাবা!

একটু চমকে উঠলেন মানিকবাবু। ভাঁড়ের চা ছলকে আঙুলে পড়ল। তিনি তো বহুদিন আগে মারা গেছেন!

লোকটা ফের বলে উঠল, আপনি কী ভাবছেন জানি। কথাটা ভুল শোনেননি। আট বছর আগে আমি গত হয়েছি। ও তখন ক্লাস নাইনে। কিন্তু, উপকার কি অত সহজে ভুলতে পারি!

লোকটা বলে কী! এই ভরদুপুরে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মতো জায়গায় ভূতের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তা আবার চায়ের দোকানে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে! তবে আজকাল যা হচ্ছে, তাতে ভূতেও অবিশ্বাস নেই মানিকবাবুর।

লোকটা বলতে থাকে— কিছুদিন আগে আমাদের ওখানে ভোট হল। আমাদেরও তো রাজার দরবার। তা দেখা গেল প্রায় সবাই আপনার নামে ভোট দিয়েছে। কারও মেয়ের বিয়েতে আপনি টাকা দিয়েছেন, তো কারও ছেলে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন, কতজনের চিকিৎসার খরচ দিয়েছেন। মাথা গোঁজার জায়গা করে দিয়েছেন নিজের খরচে। তাই তো আজও আপনার টানাটানির সংসার। তা না হলে আপনার তো কবে বাড়ি-গাড়ি হত— তাই না? তাই আপনিই হলে আমাদের রাজাবাবু। ভূতেদের তো আর নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার দরকার নেই। আমরা সাচ্চা লোক খুঁজি।

আর ভবিষ্যতে যদি আবার হঠাৎ করে কোনও বিপদে পড়েন, ঘাবড়াবেন না। দেখবেন, আমাদেরই কেউ সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়াবে। লোকটা দাঁত বার করে হেসে উঠল, পান খাওয়া লাল ছোপ ধরা দাঁত। তারপর ফের বলে উঠল, তাহলে আসি রাজাবাবু, পরে আবার দেখা হবে।

দাবার সবগুটি এক রঙের

হোয়াইট ফিলড ম্যানর। মুগ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। বিশাল বিশাল ঘর। দেওয়ালজুড়ে মার্বেল পাথরের উপরে খুব সুন্দর কাজ। কোনও ঘরে আবার শুধুই ওক কাঠের কাজ। প্রায় সব ঘরেই আছে একাধিক দামি কারুকার্য করা ঘড়ি ও সুদৃশ্য গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। অত্যন্ত দামি কাঠের আসবাব। কিছু কিছু ঘরের দেওয়াল জুড়ে ওয়েল পেন্টিং।

এই বাড়ি বা ম্যানসন হাউস 'রথসচাইল্ড' পরিবারের। বিশ্বের সবথেকে ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে 'রথসচাইল্ড' পরিবার অন্যতম। প্রায় একশো বছর ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরাই ছিল বিশ্বের সবথেকে ধনী পরিবার। এখন অবশ্য সেরকম অবস্থা নেই। তবুও এখনও এদের নানান ব্যবসা, ব্যাংক থেকে ওয়াইন প্রস্তুতি সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে।

এই ম্যানর হাউসে অবশ্য ওই পরিবারের কেউ এখন থাকেন না। শুনেছি বছরে কয়েকদিনের জন্য পরিবারের কয়েকজন আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পুরো প্রাসাদ এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা থাকা পুরো বছর। এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা ওদের অবর্তমানে একটা ট্রাস্ট করে। সেই ট্রাস্টকেই দান করে দিয়েছে ওরা।

বাড়ির একটা ঘরে, খুব সম্ভবত সেটা পড়ার ঘরই হবে, বুককেসের সামনে দাঁড়িয়ে বইগুলো দেখছিলাম। ১৭০০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। দুর্মূল্য সব বই। বেশ কিছু বই এই পরিবারের উপরে। ইজরায়েলকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে এই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এরকম আরও নানান তথ্য।

বইটা পড়তে গিয়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এই পরিবারের সঙ্গে সেই সময়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের ওঠাবসা ছিল। একই সঙ্গে দেশবিদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত এই পরিবার। এই পরিবারের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে ছিল ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

বইটা এতই আবিষ্ট করে রেখেছিল যে খেয়াল করি নিবাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে সময়টা দেখে আরও চমকে উঠলাম, সন্ধে ছ'টা।

সাড়ে পাঁচটায় এই ম্যানর হাউস বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোনও অ্যানাউন্সমেন্ট হল না তো!

এবারে কেন সেটা শুনিনি সেটা বুঝতে পেরে নিজের সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

কী করে শুনব! এতক্ষন একটা নয়েজলেস হেডফোন কানে গুঁজে ঘুরছিলাম আর তাতে গান শুনছিলাম। বাইরের কোনও শব্দ আমি শুনতে পাইনি।

বিশাল বিশাল কাচের জানলার সামনে পর্দা ঝুলছে। সরিয়ে দেখলাম, বাইরে আলো কমে এসেছে। কোনও লোকও দেখতে পেলাম না।

ওই ঘর থেকে বেরোতে যাব, ঠিক এমন সময় এক বছর ষাটের ভদ্রলোককে দেখে খানিকটা স্বস্তি পেলাম। ভদ্রলোক পাশের ঘরে একটা সোফায় বসে আছেন। একটু অবাক হলাম। এমনিতে এসব সোফায় না বসাই নিয়ম।

তবে বয়স্ক মানুষ, সেই জন্যেই হয়তো ক্লান্ত হয়ে বসেছেন। লক্ষ করলাম বেশ অভিজাত চেহারা। মাথাভর্তি সাদা চুল। সাদা শার্টের উপরে একটা দামি লং কোট।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে উঠলেন— কী রথস চাইল্ড দের ইতিহাস পড়ছিলে?

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালে বলে উঠলেন— আসলে কী জানো, বইতে অনেক কিছুই লেখা হয় না। এই পরিবারকে নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সেটা জানো তো?

—হ্যাঁ, কিছু শুনেছিলাম। যেমন এই পরিবার নাকি একটা সময় পৃথিবীর সববড় বড় ঘটনা, এমনকী যুদ্ধ বিগ্রহ কোনও কোনও দেশের মধ্যে কবে হবে, তাও নাকি ঠিক করত, যাতে এদের ব্যবসার সুবিধে হয়?

হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।— ঠিকই বলেছ। এরকম ধারণা আছে। তবে এগুলো হল শুধুই ধারণা। কন্সপির্যা সি থিয়োরি।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—তবে আমি কে জানো?

—কে আপনি? আপনি কী এ পরিবারের কেউ?

—হ্যাঁ, আমি এই পরিবারের একজন। সেজন্য এমন অনেক কিছু জানি যা কোনও বইতে লেখা থাকবে না। আমি লুইস রথসচাইল্ড।

এবারে আমার বিব্রত হওয়ার সময়। তাহলে কী আমি ভুল করে এই বাড়ির প্রাইভেট অংশে, অর্থাৎ যেখানে এঁরা এসে থাকেন, সেই অংশে চলে এসেছি?

বলে উঠলাম।— আমি সময় খেয়াল করিনি। দেরি করে ফেলেছি। আমার একটু আগেই বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আপনাকে বিরক্ত করলাম। আসলে

—আরে না, না, আমার ভালোই লাগছে। এই যে তুমি বইটা নিয়ে এতক্ষণ এত মন দিয়ে পড়ছিলে, সেটা দেখেই আমার তোমার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ হল। এই—এই সোফাটায় বসো।— বলে ভদ্রলোক সামনের একটা সুদৃশ্য কাঠের চেয়ারে বসতে বললেন।

কী যে ছিল সে অনুরোধের মধ্যে কে জানে! বসতে বাধ্য হলাম। এই ঘরটাও বেশ বড়। মনে হয় অতিথিদের জন্য এই ঘরটা ছিল। একদিকে বড় কারুকাজ করা বিশাল খাট।

ঘরের অন্য দিকে বেশ কয়েকটা পুরনো দিনের কাজ করা কাঠের চেয়ার ছড়িয়ে আছে। এছাড়া আছে একটা বড় লাল সোফা, গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক, মাটিতে পাতা দামি উলের কার্পেট, কোণে একটা বিশাল পিয়ানো, তার পাশে এক মার্বেলের মূর্তি।

দেওয়ালে কয়েকটা ওয়েল পোট্রেট আছে, যেখানে খুব সম্ভবত এই পরিবারের কয়েকজনের ছবি আছে।

উনি ফের বলে উঠলেন— বলতে পারো সারা বিশ্বের আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আমরাই চালু করেছিলাম। সে প্রায় আড়াইশো বছর আগে।

বলে উঠলাম— শুনেছি এই পরিবারের জন্য নাকি নেপোলিয়নের হার হয় ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে।

—আমরা ইংরেজদের অর্থসাহায্য করেছিলাম, তবে তার বেশি কিছু নয়। আমরা তখন অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ফ্রান্সের মতো বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিলাম। যুদ্ধতে আমাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। তবে হয়তো এইভাবে অর্থসাহায্য করা উচিত হয়নি।

—এতে নিরপেক্ষতা অবশ্যই নষ্ট হয়।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আসলে একটা বড় সময় জুড়ে আমরাই ছিলাম বিশ্বের সবথেকে ধনী পরিবার। অর্থ আর রাজনীতি সবসময় খুব কাছাকাছি চলে আসে। সেজন্যই একটা সময় এসব কারণে আমাদের পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমরা তারপরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সবক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখব। কিন্তু মানুষ কোনওদিনই আমাদের সেভাবে বিশ্বাস করেনি।

—কেন?

—আমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই অপপ্রচার চালিয়েছিল যার মধ্যে হিটলার আর নাৎসিরাও ছিল। আসলে ওরা আমাদের পরিবারের এই অর্থ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারেনি। হয়তো আমরাই দায়ী লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের মৃত্যুর জন্য। আমাদের জন্যই ওদের উপরে রাগ আক্রোশ গড়ে উঠেছিল।

—কেন? আপনাদের উপরে এত রাগের কী কারণ ছিল?

—আসলে একটা অংশ অপপ্রচার করেছিল যে আমাদের জন্যই জার্মানির এত খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা। আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়ের বলছি। অনেকের ধারণা হয়েছিল

আমরা সবকিছুই করি আমাদের ব্যবসার কথা মাথায় রেখে। বুঝতেই পারছ ধনীদের শত্রুর অভাব হয় না।

—কিন্তু আপনারা তো পারতেন সাধারণ ইহুদিদের বাঁচাতে?

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।— না, পারতাম না। মানুষের মধ্যেই যে এরকম শয়তান বাস করে, তা আগে জানতাম না। আমাদের পরিবারের সবাই পালিয়ে গিয়েছিল ১৯৩৮ সালে আমেরিকায়। শুধু আমিই থেকে গিয়েছিলাম।

—আপনি এখানে ছিলেন?

—না, আমি প্রথমে ছিলাম অস্ট্রিয়ায়। পরে পালিয়ে প্রুসিয়ায় চলে আসি। পুরো সময়টা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। আমাদের অস্ট্রিয়ার ব্যাংক জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। আমাদের দুর্মূল্য আর্ট কালেকশন নাৎসিরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু ছবি নয়, আরও অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছিল, যার মধ্যে কিছু দুর্মূল্য জুয়েলারিও ছিল।

—কিছু প্রতিবাদ করেননি!

—সেটাই ভুল ছিল। আমরা চুপ করে মার খেয়েছিলাম। আমরা সবাই ভেবেছিলাম সংঘাতে না যাওয়াই বোধহয় ভালো রাস্তা। এতে নিজেদের প্রাণ বাঁচানো যাবে। যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম, সংঘবদ্ধভাবে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, তাহলে এই অবস্থা হত না। ষাট লক্ষ ইহুদি অকারণে মারা যেত না ওই নাৎসিদের হাতে।

আরও কিছু কথা বলার পরে বেরোতে চাইলাম।

উনি যেন অবাক হয়ে বলে উঠলেন— সে কী এই তো সবে কথা শুরু হল। তুমি কী দাবা খেলতে পারো?

কিছু দূরে একটা কাঠের টেবিলের উপরে একটা দাবার বোর্ড রাখা ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হয় আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে উনি বুঝতে পেরেছেন।

সম্মতি জানাতে বলে উঠলেন— দারুণ, চলো একটা গেম হয়ে যাক।

—এখন?

—হ্যাঁ, দাবা যেকোনও সময়ে খেলা যেতে পারে।

উঠে গিয়ে বোর্ডটা নিয়ে এলাম। আমাদের মাঝের টেবিলের উপরে রাখলাম। বেশ দামি কোনও মেটালের গুটি। প্রত্যেকটা গুটি যেন কোনও শিল্পীর অসামান্য হাতের কাজ। এমনকী প্রত্যেকটা বোড়ে বা সাধারণ সৈন্যও নিখুঁতভাবে তৈরি। তবে একটা জিনিস দেখে খুব অবাক লাগল।

বলে উঠলাম— এর গুটিগুলো সব এক রঙের। কোনওটা সাদা, কোনওটা কালো?

ভদ্রলোক হেসে বলে উঠলেন,— ঠিক বলেছ, এটাই এই দাবার বোর্ডের বৈশিষ্ট্য। সব গুটি এক রঙের। সাদা গুটি বা কালো গুটি নেই। যে খেলবে তাকে তার নিজের গুটি খেয়াল রখতে হবে, মনে রাখতে হবে কোনওটা তার।

—কিন্তু এরকম কেন?

ভদ্রলোক যেন একটু দার্শনিক হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বলে উঠলেন— আসলে দাবা হল আমাদের মানবজীবনের মতোই। এখানে এসব গুটি হল, আমার তোমার মতো মানুষ। কেউই শুধু সাদা নয়, কেউই শুধু কালো নয়। সবার চরিত্র ভালো খারাপ মিশিয়ে।

বলে চাল দিতে দিতে ফের কথা বলতে থাকলেন।— আমাদের পরিবারের সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যাইনি। ভেবেছিলাম কিছুদিনের মধ্যে এসব কেটে যাবে। কিন্তু সে পরিবর্তন চট করে এল না। হিটলার ঝড়ের বেগে একের পর এক দেশ জয় করে চলল। আমিও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। তখনই বুঝলাম নাৎসিদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আমি। হিটলারের পরেই সবথেকে শক্তিশালী যিনি ছিলেন নাৎসিদের মধ্যে, সেই হারমান গোরিং ও তার পুরো সিক্রেট পুলিশ 'গেস্টাপো' ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাকে খুঁজে বার করতে।

—কিন্তু আপনি তো ইউরোপ ছেড়ে পালাতে পারতেন।

—না, যখন বুঝলাম, তখন সেই সুযোগ চলে গেছে। তাছাড়া বুঝতেই পারছ, আমি কোনও সাধারণ ইহুদি ছিলাম না। আমার মুখ অনেকের কাছেই পরিচিত। কীভাবে বেরোব? তখন চারদিকে ইহুদিদের নিধনযজ্ঞ চলছে। আমি আবার ওদের মূল নিশানা।

—তারপর কী করলেন?

একটু থেমে বলে উঠলেন— শেষে একটা লোককে অনেক টাকা দিয়ে একটা বাড়ির চিলেকোঠার ঘরেরকোণে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেখানে ছিলাম বেশ কয়েক মাস। সে লোকটাই খাবার ও অন্যান্য দরকারি জিনিস দিয়ে আসত আমার জন্যে। কিন্তু একদিন সে লোকটা এল না। তার পরের দিনও এল না। কয়েকদিন বাদে খিদের চোটে বাধ্য হলাম আমার সেই হাইড-আউট থেকে বেরোতে। বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম এক এস এস গার্ডের হাতে। বুঝতেই পারছ, আমি তখন ভেবেই নিয়েছিলাম আমার নিশ্চিত মৃত্যু। ওদের কাছে মানুষ মারা পিঁপড়ে মারার মতো। সম্পূর্ণ বিনা কারণে গুলি করে মারত। কিন্তু ভাগ্য এমন বেঁচে গেলাম।

—কী ভাবে? ছেড়ে দিল?

—হ্যাঁ, সেটাই বলছি। সে লোকটা আমাকে দেখে অবাক হয়ে আমি কীভাবে ওখানে এতদিন লুকিয়ে আছি জানতে চাইল। বাধ্য হলাম চিলেকোঠার কোণে আমার সেই লুকোনো

জায়গাটা দেখাতে। সেটা দেখতে গিয়েই ও প্রথম দেখল আমার আঁকা বিভিন্ন ওয়েল পেন্টিং, যা ছিল ওখানে আমার সময় কাটানোর একমাত্র উপায়।

—আপনি ছবি আঁকতেন?

—শুধু আঁকতাম না। বেশ ভালোই আঁকতাম। এই পরিবারের সন্তান না হলে আমি হয়তো আর্টিস্টই হতাম। এই যে এ ঘরের পেন্টিংগুলো দেখছ, তার মধ্যে কয়েকটা আমার আঁকা।

বলে ঘরের কয়েকটা ছবি আঙুল তুলে দেখালেন।

আমি অবাক হয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম। সত্যি অসাধারণ তুলির ছোঁয়া।

বলে উঠলাম— তার পরে? সেই লোকটা ছবি দেখে কী করল?

—লোকটার নাম কী ছিল জানি না। কিন্তু কেন জানি না শিল্পীদের খুব কদর করত। মনেহয় নিজেও আঁকত। আমাকে শুধু সে জন্যেই মারেনি। অথচ পরে জেনেছিলাম লোকটা নাকি প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ছিল। কত ইহুদিদের মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই লোকটাই আমি শিল্পী বলে আমার কথা অন্য কাউকে জানাল না। আমাকে মারল না। মাঝেমধ্যে এসে এমনকী আমার আঁকার সরঞ্জাম, খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে যেত। এভাবে আরও কয়েক মাস ছিলাম। শেষে রাশিয়ান রেড আর্মি এসে আমাকে মুক্ত করে। তারপরে আমি এদেশে চলে আসি।

—আচ্ছা, তখন আপনার বয়স কী খুব কম?

—না, না, তখন আমি আটষট্টির কাছে।

অবাক হলাম।— তাহলে এখন আপনার বয়স কত? এখনও তো বয়স ওরকমই লাগে।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন— হ্যাঁ, আমার আর বয়স বাড়েনি। ওই আটষট্টিতে আটকে আছে। এদেশে আসার পরে প্রায় দেড় মাস খুব ভালোই ছিলাম। কিন্তু আমার এক অত্যন্ত প্রিয়জন আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে আমাকে হত্যা করে।

—মানে? —চমকে উঠি। ভয়ে তখন আমার গলা কাঠ হয়ে গেছে।

—মানে হল আমাকে মেরে ফেলে। নীচে সেলারে একটা লুকোনো ঘর আছে। ওখানে আমি আজও শুয়ে আছি।

আমার মুখ-চোখের চেহারা দেখে ভদ্রলোক ফের বলে ওঠেন— আহা, অত ভয় পাচ্ছ কেন? এখনও এই ম্যাচটা বাকি আছে। এজন্যই বলেছিলাম মানুষের চরিত্রে? সাদা-কালো, ভালো মন্দদুটো রঙই মেশানো থাকে। আমি কী ভেবেছিলাম যে আমার ওই অত্যন্ত প্রিয়জন আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে আমাকে মারবে!

—কে ছিলেন তিনি?

ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখালেন। চমকে উঠলাম, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের খাটের উপরে মাঝবয়সি এক সুন্দরী মহিলা বসে আছে।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন— আমার স্ত্রী। ওই বিষ মিশিয়েছিল। সেটা অবশ্য বাইরের কেউ জানতে পারেনি। তাদের ধারণা আমি ওই নাৎসিদের হাতেই মারা গিয়েছিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি সকাল হয়ে এসেছে। আমি শুয়ে আছি ওই ঘরের খাটের উপরে। সূর্য উঠবে উঠবে করছে। আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। একটা টেবিলের উপরে দাবার বোর্ডটা পড়ে আছে।

স্বপ্নই দেখছিলাম হয়তো।

কিন্তু চারদিকে তাকাতেই দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবিতে গতকাল রাতে দেখা সেই ভদ্রলোকও সেই মহিলাকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না।

নীচে লেখা লুইস রথসচাইল্ড অ্যান্ড মারটিনা রথসচাইল্ড।

মিঃ পাই এর এক্সপেরিমেন্ট

—না, না, অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মাইক যাতে রাত এগারোটার পর আর না বাজতে পারে, সে ব্যবস্থা তো আমিই নিয়েছিলাম।

—মানে?

—কিছুই নয়। ওটা আমার একটা ছোট্ট আবিষ্কার। অডিও ক্যাপ যন্ত্র। অন করলে এক মাইল রেডিয়াসে আর কেউ ৪০ ডেসিবেলের বেশি আওয়াজ করতে পারবে না। কাল রাতে বাইরে অমন চিৎকার হচ্ছিল দেখে চালিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাস, মাইক বন্ধ।

অবাক হয়ে শুনছিলাম। ভদ্রলোক বলেন কী! যেটা নিয়ে কালকে অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সপ্তমীর রাতে দু দলের মধ্যে বেজায় মারামারি হয়ে গেল— মাইকের দোকান ভাঙচুর হল— যার জন্য কলকাতা থেকে আসা গানের দল ফিরে গেল— সেটা নিয়ে— বদ্ধ উন্মাদ না হলে কেউ এত সহজে এ কথা বলতে পারে? আর এরকম কি সত্যিই সম্ভব?

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যার সম্বন্ধে এ কথা বলছি তার নাম মিঃ পাই। পরে জেনেছিলাম আসল নাম সমুদ্র বসু। আমার গত দশ বছরের প্রতিবেশী। যদিও গত দশ বছরে দশ বারও দেখা হয়নি। আর যতবারই দেখা হয়েছে ভদ্রলোক একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেছেন।

কল্যাণগড়ে আমার বাড়ির ঠিক পাশেই এনার বাড়ি। প্রায় দশ একরের উপর উঁচু পাঁচিল ঘেরা জায়গা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাড়ি থেকে বছর তিরিশের এক সুসজ্জিত যুবক মাঝেমধ্যে বেরোয়। জিজ্ঞেস করে জেনেছি তার নাম গণেশ।— মিঃ পাই এর অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু কিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিঃ পাই কী করেন তা নিয়ে যা জিজ্ঞেস করেছি— তার খুব সহজ উত্তর কখনও পাইনি। এটুকু শুধু জেনেছি মিঃ পাই হলেন সায়েন্টিস্ট। কিন্তু একটা মফসসল শহরে বসে— একা একা— কী নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করতে পারেন তা বোধগম্য হয়নি। আমাদের কল্যাণগড়ে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা হল দু-একটা টিভি-ফ্রিজ-রেডিও সারাই-এর দোকান আর বোমা তৈরি।

মিঃ পাইকে কখনোই প্রায় বাড়ির বাইরে দেখা যায় না। লোকমুখে শোনা গেছে ভোর চারটে নাগাদ না কি মাঝেমধ্যে হাঁটতে বেরোন। সঙ্গে ওই গণেশও থাকে। আবার সাড়ে চারটে নাগাদ, সূর্য ওঠার অনেক আগে নাকি বাড়িতে ঢুকে আসেন। অবশ্য এ কথাটা যাদের মুখে

শোনা গেছে—বলা বাহুল্য তারা নিজেরাও খুব স্বাভাবিক লোক নয়। তার মধ্যে জগা পাগলাও পড়ে। ও টের পেয়েছিল তার কারণ এক শীতের ভোরে মিঃ পাই ওর গায়ের উপর একটা দামি কম্বল ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন।

আমিও এ ধরনের এলাকের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে আলাপ করার সাহস পাইনি। কে জানে কী ধরনের উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব। চারদিকে নানান ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজ হচ্ছে। কৌতূহল দেখিয়ে বিপদে পড়ার কোনও মানে হয়! আর মিঃ পাইকে দেখে এমনিতেও খুব স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না। কিরকম বড় বড় চোখ, গোল কাচের চশমা দিয়ে ঢাকা। কাঁধ অবধি কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল। সবসময় ব্যস্ততা। মুখে সর্বদা একগাল হাসি। এই এখনকার দিনে কেউ সারাক্ষণ হেসে যেতে পারে!

তা যা বলছিলাম। এটাই বলতে গেলে মিঃ পাই-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। দশ বছর বাদে। তবে এবারেও দেখাটা খুব স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

অষ্টমীর দিন সকালে উঠে দেখি কুচো উধাও। কুচো হল আমাদের বাড়ির পোষা ল্যাব্রাডর। মাস ছয়েক বয়স। ভারী দুষ্টু। চেনা, অচেনা যেই হোক না কেন, গাল চেটে দেবে। লাফিয়ে কোলে উঠে পড়বে। বলা বাহুল্য আমার বাড়িতে আসে এমন অনেকেই সেটা পছন্দ করে না। চেন দিয়ে বেঁধে রাখারও উপায় নেই। কুঁই-কুঁই কান্নার শব্দে আমাদের বিরক্ত করে তোলে।



তাই ওকে খোলাই রাখা হয়। কেউ আসার কথা থাকলে আগে থেকে চেন দিয়ে বাঁধা হয়। তা, এরকম একটা প্রাণবন্ত কুকুর হঠাৎ করে সকাল সকাল উধাও হয়ে যাবে, আর উধাও হয়ে যাওয়ার পরে কেউ নালিশ করতে আসবে না এটা খুবই অস্বাভাবিক।

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছি, হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাক্কা। খুলে ভূত দেখার মতো দেখি দরজার সামনে গণেশ। যথারীতি সুসজ্জিত। কালো প্যান্ট, লাল-সাদা ডোরাকাটা শৌখিন শার্ট।

তার উপরে ব্লেজার, ব্লেজারটা দেখেই চিনলাম। গতবছরে পাড়ার নাটক মাইকেল মধুসূদন-এ এ ব্লেজারটা চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কোনওরকম সহবৎ না দেখিয়ে বেশ জমিদারি লেঠেলদের কায়দায় গণেশ বলে উঠল— স্যার আপনার খোঁজ করছিলেন। এক্ষুনি যেতে হবে।

—কী ব্যাপার?

ওকালতি করি। সে ব্যাপারে কোনও পরামর্শ? এরকম শাঁসালো মক্কেল হাতছাড়া করা একেবারেই উচিত নয়— তবু কুচোর কথা খেয়াল করে বলে উঠলাম—

—আমার কুকুরটাকে সকাল থেকে পাচ্ছি না। ওটার একটু হদিশ করে আসছি।

গণেশ নির্বিকারভাবে বলে উঠল,— কুকুরটা স্যারের কাছেই আছে। ও ব্যাপারেই ডাকছেন।

—সেকি! কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিয়েছে না কি? সর্বনাশ, ও তো সেরকম নয়।

বলে মনে মনে ভাবলাম, আর কাউকে না কামড়ালেও মিঃ পাইকে কামড়ানোর অনেক কারণ থাকতে পারে।

গণেশ বলে উঠল— না, না, সেরকম কিছু না। আমিই সকালবেলা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্যার বলেছিলেন।

—মানে? ঘরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছিল। তার উপরে একটা হালকা শাল জড়িয়ে গণেশের পিছু নিলাম। গণেশের দশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা স্পীডের হাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশের বাড়ির গেট পেরিয়ে ওর সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার পরই সামনে বিশাল ড্রয়িংরুম। বই বোঝাই সার সার আলমারি। ঘরে দামি সোফাসেট।

—আপনি এই সোফাতে বসুন, আমি কুচোকে নিয়ে আসছি।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে কুচো ঘরে ঢুকল। সঙ্গে গণেশ। আর একটা বিচ্ছিরি দেখতে কুচকুচে কালো বেড়াল। চোখদুটো একদম হলুদ। কুচো আমার কোলে উঠে পড়ে একবার আমার গালটা চেটে আবার নেমে গিয়ে বেড়ালটার পাশে গায়ে গা লাগিয়ে মেঝেতে বসল। অদ্ভুত কাণ্ড! বেড়াল দেখলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, আর হঠাৎ এর সঙ্গে এরকম আদিখ্যেতা! আমার ডাকে কোনও সাড়া না দিয়ে নখ দিয়ে বেড়ালটার পিঠ চুলকোতে শুরু করল।

অবাক হয়ে কুচোর কাণ্ড দেখছি—তার মধ্যে মিঃ পাই ঘরে ঢুকলেন। সাদা পাজামার উপর ভারতীয় জাতীয় পতাকার রঙের পাঞ্জাবি। এসেই আমার উলটোদিকের সোফায় বসে প্রথমেই সে কথাটা বললেন তা হল এই—

—ক'দিন ধরে দেখেই মনে হয়েছিল আপনার থেকে আপনার কুকুরটা অনেক বেশি ইনটেলিজেন্ট। তাই এক্সপেরিমেন্টের জন্য সকাল সকাল ধরে আনলাম। আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়নি। কুকুরটা সত্যিই অসাধারণ। আমার ক্যাট ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে ঠিক দু'ঘণ্টার মধ্যে বেড়ালের ভাষা দিব্যি তুলে নিয়েছে। ওই, ওই যে কুকুরটার কানের মধ্যে কালো ছোট সুইচের মতো জিনিসটা দেখছেন না, ওটাই হল ট্রান্সলেটর। বেড়ালটার মুখের কাছেও আছে। তবে কালো রঙের জন্য দেখা যাচ্ছে না। কি সুন্দর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দেখছেন। আর তাই তো দু'ঘণ্টার মধ্যে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ভাবুন তো বাড়ির কুকুর-বেড়ালের মধ্যে যদি সম্পর্ক ভালো করা যায়, কত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম— আপনি ভেবেছেনটা কী! আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়ি থেকে আমার কুকুর ধরে এনেছেন— তার উপরে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন! ওর যদি কিছু হয়! আপনাকে জেলে পাঠাতে পারি জানেন?

মিঃ পাই বেশ অমায়িকভাবে হেসে বলে উঠলেন— তবে এখন থেকে কুচো কিন্তু আপনার কথার থেকে আমার কথাই বেশি শুনবে। আর আপনি না চাইলেও এখানে চলে আসবে।

তারপর গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন— কী হল? ওনার জন্য চিংড়ির কাটলেটটা এখনও এল না?

গণেশ কিছু বলার আগেই সুসজ্জিত বাবুর্চি ট্রেতে করে একটা ভারী সুন্দর প্লেটে দুটো বিশাল চিংড়ির কাটলেট আর চা নিয়ে ঢুকল।

বেশ অবাক হলাম। সত্যি বলতে কি, চিংড়ির কাটলেট আমার ফেভারিট। কিন্তু উনি তা জানলেন কী করে!

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটানোর আগেই মিঃ পাই বলে উঠলেন— কলকাতার মিত্র ক্যাফে থেকে কাল সন্ধেবেলা আপনার জন্য আনিয়েছি। আপনি আপনার স্ত্রী সঙ্গে কাল দুপুরে এই নিয়ে কথা বলছিলেন, তাই তো?

—হ্যাঁ, মানে— কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

—ওই আপনার জানলার উপরে লেসার ফেলে কুকুরটার কথা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তা কি আর শোনার উপায় আছে? আপনি আর আপনার স্ত্রী যা চিল চিৎকার করছিলেন! আমি তো স্পষ্ট শুনতে পেলাম আপনি বাড়িতে চিংড়ির কাটলেট বানাতে বলছেন আর আপনার স্ত্রী কিছুতেই তা করবেন না। ঠিক কি না? সত্যি বলতে কি এত ছোট ব্যাপার নিয়ে আপনার এতটা রাগারাগি করাটা মোটেও ঠিক নয়।

—আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই! জানেন আমি আপনার বিরুদ্ধে এজন্য আইনি ব্যবস্থা নিতে পারি। এটা কী ধরনের ভদ্রতা!

মিঃ পাই কথাটা প্রায় উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন— না, না, এসব কথা নিয়ে একদম মাথা গরম করবেন না। এবার খেতে শুরু করুন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না।

সত্যি বলতে কি চিংড়ির কাটলেটে কামড় বসানোর পরপরই মাথাটা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেল। মিঃ পাই কুচোর এরকম ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক কারণগুলো বোঝাতে শুরু করলেন। আর কথায় কথায় গতরাতে বাইক থামানোর কথাটা উঠতে বেশ সপ্রতিভভাবে তার কারণটাও বোঝালেন।

আধঘণ্টা বাদে কুচোকে নিয়ে বিদায় নিলাম। এটাই হল আমাদের প্রথম আলাপ। এটুকু বুঝলাম— আমার প্রতিবেশী ভালো না খারাপ সেটা জানি না, তবে পাগলাটে ও খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

———

প্রথম আলাপের পর থেকেই খুব ইচ্ছে ছিল আবার মিঃ পাই-এর বাড়ি যাব। কিন্তু না বলে কয়ে তো আর যাওয়া যায় না। যদিও কুচোর মধ্যে সেই বোধ একেবারেই নেই। বেশ টের পাই মাঝেমধ্যেই পালিয়ে ও বাড়ি চলে যায়। শেষে কুচোকে সঙ্গে নিয়েই একদিন হাজির হলাম মিঃ পাই-এর বাড়ি। শনিবার সকালের দিকে। গেটের সামনে মনে হয় ক্যামেরা আছে। সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র গেট খুলে গেল। ঢোকার পথে বড় বাগান। তার মধ্যে দিয়ে এক চিলতে ইট বাঁধানো পথ। সেটা পেরিয়ে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। গণেশই খুলল। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, লাল টাই। একদম অফিসের পোশাক। এরকম মফসসল শহরে এ ধরনের পোশাক পরে থাকতে কাউকে দেখিনি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কুচো দুলাকে ভিতরে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমাকে নিয়ে গণেশ ড্রয়িংরুমে বসালো। আর তারপরেই মার্জিতভাবে বলে উঠল— আজকে কিন্তু স্যার খুব ব্যস্ত। দেখা করতে পারবেন না। কিছু বলার আছে?

আমি একটু বিব্রত হয়েই বলে উঠলাম— না, না সেরকম কিছু নয়। ভাবলাম, সেদিন আলাপ হল। আজকে একটু সময় আছে, দেখা করে আসি। কেমন আছেন উনি?

গণেশ কাঠ কাঠ ভাবে বলে উঠল— ভালোই আছেন। আসলে স্যার গত এক সপ্তাহ এত ব্যস্ত আছেন টেসলার এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে —ল্যাবেই দিনরাত পড়ে থাকেন।

—গণেশ, অবিনাশবাবু এসেছেন, বলিসনি তো!— বলতে বলতে মিঃ পাই হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। আজ পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাকে। সুট-টাই।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, — চলুন। ভালো সময়ে এসেছেন। ল্যাবে চলুন। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।

ওনার এত তাড়া দেখে একটু অবাক হয়ে মিঃ পাই-এর পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘর। নানান ধরনের অজানা অচেনা যন্ত্র সাজিয়ে রাখা বেশিরভাগ ঘরে। বেশ কটা ঘর পেরোনোর পরে মিঃ পাই এর পিছু পিছু একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। ঘরের মাঝখানে একটা মানুষ-প্রমাণ লোহার খাঁচা। খাঁচাটার থেকে কয়েক ফুট দূরে দু'ধারে দুটো তারের জালি দাঁড় করানো।

—একটা মজা দেখবেন। ওই খাঁচার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান।

আমি অবাক হয়ে বললাম— আমি? ওই খাঁচার মধ্যে?

—হ্যাঁ, ঢুকুন। তারপরে বলছি।

— মিঃ পাই এর বলার মধ্যে কী ছিল জানি না, —বোকার মতো খাঁচাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। খাঁচাটা হাইটে আমার থেকে ইঞ্চি দুয়েক বড়। চুল তাই লেগে যাচ্ছে।

একটু হাত পা ছড়াব সেরকম জায়গাও নেই। কোনওরকমে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিঃ পাই খাঁচার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

বললেন— আপনি সেটার মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছেন, ওটা হল ফ্যারাডের খাঁচা। অবশ্য তার ওপর আমি বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছি। আর সেটাই আমার আবিষ্কার। বলে পাশের একটা সুইচ বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—

—এই সুইচটা অন করলে খাঁচার দুধারে রাখা ওই কয়েলগুলো মিলিয়ন ভোল্টে চার্জড হয়ে উঠবে আর খাঁচার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক চলে যাবে। একে বলে টেসলা এফেক্ট। জানেন তো? বাতাসে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির জন্য এটা হয়।

আমি চমকে উঠলাম।

—তার মানে? আমার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক চলে যাবে?

মিঃ পাই আমার কথায় কোনও ভ্রুক্ষেপ না করে সুইচের উপর হাত রেখে বললেন—

—না, আপনার কিছু হবে না। আপনি যে খাঁচাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা আপনার থেকে অনেক ভালো তড়িৎপরিবাহী। তাই খাঁচাটার মধ্যে দিয়ে যাবে। আপনি স্পার্ক দেখতে পাবেন, আপনার দিকে ছুটে আসবে।

খাঁচা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম। মিঃ পাই বলে উঠলেন— খবরদার! বেরোবেন না। খাঁচার মধ্যে পুরো নিরাপদ। বেরোলেই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন।

শুনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চুল, হাত, পা মাঝেমাঝেই খাঁচার গায়ে লাগছিল। বললাম—

—খাঁচার গায়ে তো হাত লেগে যাচ্ছে। কোনও অসুবিধে হবে না তো?

—খাঁচার কোনও অংশে হাত না দেওয়াই ভালো। কিসে যে কী হয়!

আর্তনাদ করে উঠলাম— কিন্তু হাত তো লেগে যাচ্ছে। কোনও উপায় নেই।

মিঃ পাই বললেন— এখন আর কিছু করা যাবে না। তা সঙ্গে মেটাল কিছু নেই তো?

—মানে? আমার সঙ্গে ঘড়ি, সেলফোন এসব তো রয়েছে!

মিঃ পাই চুকচুক আওয়াজ করে ওনার লাল টাইটা ঠিক করতে করতে বলে উঠলেন— নাহ, কাজটা ঠিক হল না, আগেই চেক করা উচিত ছিল। এ সব এক্সপেরিমেন্টে কখন যে কি হয়!

চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু ততক্ষণে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ কিছুক্ষণ আমার দিকে ছুটে আসছে। তীব্র চোখ ঝলসানো আলো তারপর কি হয়েছিল জানি না।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি একটা খাটে শুয়ে আছি। পাশে মিঃ পাই দাঁড়িয়ে। আমাকে আশ্বস্ত করে বলে উঠলেন—

—আরে, এত ভয় পেলে হবে? ভয়ে অজ্ঞানই হয়ে গেলেন! এ ধরনের এক্সপেরিমেন্টে মারা যাওয়ার ঘটনা খুবই কম। লং টার্ম মেমারি বাড়াতে এটা খুব সাহায্য করে। তাই তো এই যন্ত্রটা তৈরি করেছিলাম। ভালোই হল আপনার উপর পরীক্ষাটা হয়ে গেল। ঠিক সময়ে এসেছিলেন বলে।

কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। তবে এটা সত্যি— হঠাৎ করে স্কুলের দিনগুলো মনে পড়ে গেল। আর শুধু মনেই পড়ল না। বেশ ভালোরকম ডিটেলসও মনে পড়ল। যেমন ফিজিক্সের টিচার জীবনবাবুর সে প্রশ্নটা না পারার জন্য হাতে স্কেলের বাড়ি খেয়েছিলাম— সে প্রশ্নটাও।

মিঃ পাই পাশ থেকে বললেন— বাঙালি মানেই ভিতু। আচ্ছা, বলুন তো, মারা যাবার প্রোবাবিলিটি খুব বেশি হলে কি আপনাকে ওখানে ঢুকে দাঁড়াতে বলতাম? আর তাছাড়া বিজ্ঞানের স্বার্থে সামান্য আত্মত্যাগ করতেই হয়। গণেশটাও দিনকে দিন ভিতু হয়ে যাচ্ছে। ওকেই বলেছিলাম ভিতরে যেতে। আমার নিজের পক্ষে আর ওখানে ঢুকে কিছু করা সম্ভব নয়। নোটস নিতে হবে।

পাশ থেকে গণেশ কিন্তু কিন্তু করে বলে উঠল— স্যার আমার আর কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু লাস্টবার আমার মাথার চুলে আগুন ধরে গিয়েছিল কি না!

—দ্যাটস দ্য প্রবলেম, একটুকুতেই ভয় পেয়ে যাও। চুল থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! এতবড় একটা এক্সপেরিমেন্ট!— মিঃ পাই ধমকে বলে উঠলেন।

হাত-পা অবশ লাগছিল। তবু তার মধ্যেই মাথায় হাত দিলাম। নাহ, চুল এখনও আছে।

গত কয়েক সপ্তাহে কানা হেবোর বাড়াবাড়িটা সত্যিই বেড়েছে। রাজনীতিতে দাদা হলে যেন চারটে হাত আর চারটে পা হঠাৎ করে গজিয়ে যায়। এমনিতেই সবাই হেবোকে ভয় পেত। এখন এ এলাকার ত্রাস। বোমা তৈরি করতে গিয়ে ওর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই থেকে নাম কানা হেবো। শুনলাম ছেলেদের হাইস্কুলের হেডস্যার বিপিনবাবুকে সবার সামনে চড় মেরেছে। সবজিওয়ালা সবজির দাম চাওয়ায় সেই গরিব লোকটাকে সবার সামনে জুতো পেটা করেছে। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথে একটা চাতালে বেশিরভাগ সময় দলবল নিয়ে বসে থাকে, টীকা-টিপ্পনী কাটে। কারও সাহসও নেই কোনওরকম প্রতিবাদ করার।

সেদিন দলবল নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হল। কালীপুজোর চাঁদা। হাজার টাকা। আমি বিলটা দেখে একটু গাঁইগুঁই করতেই বলে উঠল— দু'হাজার হয়ে গেল। আরেকবার বললে চার করে দেব।

কথা বাড়ালাম না, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাকাটা এনে দিলাম।

এর দু'দিন পরের কথা। রাত আটটা নাগাদ শুনি বাইরে বেল বাজছে। বেশ শীত পড়তে শুরু করেছে। এসময়ে এখানকার লোক সাধারণত অন্যদের বাড়িতে যায় না। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখি, বাইরে গণেশ। আমাকে দেখে বলে উঠল—

স্যার কালকে আমাকে ভোর পাঁচটায় পুকুরপাড়ের বুড়ীগাছতলায় আসতে বলেছেন। ওখানে যে শীতলার থান আছে সেখানটাতে।

—ভোর পাঁচটায় কেন?

—না, মানে উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। বললেন আপনার ভালো লাগবে।

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠি— না, না অত ভোরে আমি কোথাও যাব না।

গণেশ হেসে বলল— না, না। এবার আপনার উপর পরীক্ষা নয়। গিয়ে দেখবেন। মজা পাবেন। না গেলে খুব মিস করবেন। — বলেই হাঁটা দিল।

আমি ঠিকই করেছিলাম যে যাব না। কিন্তু তবু কেন জানি পৌনে পাঁচটায় উঠে পড়লাম। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে টর্চ হাতে বুড়ীগাছতলার দিকে হাঁটা দিলাম।

পাঁচ মিনিটের পথ। শীতের রাত চট করে শেষ হয় না। বাইরে বলা যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাতে আবার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। টর্চ জ্বালিয়ে জল-কাদা পেরিয়ে পৌঁছতে মিনিট দশেক লাগল।

বুড়ীগাছতলায় যখন পৌঁছলাম পুবের আকাশে সামান্য রঙ লেগেছে। কিছু পাখির ডানা ঝটপটানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ— তার নীচে শীতলার থান। তাকেই আমরা বুড়ীগাছতলা বলি। হঠাৎ দ্রুত পায়ের শব্দ পেলাম। গণেশকে নিয়ে মিঃ পাই কোথা থেকে যেন হঠাৎ করে উদয় হলেন। দেখলাম গণেশ রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। আর মিঃ পাই ধমকের সুরে বলছেন—

—এই সামান্য বয়সে জোরে হাঁটতে গিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছ গণেশ! নাহ, তোমার কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— আমাদের আরও পাঁচমিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আপনার এক বিশেষ বন্ধু আসবে।

—আমার বন্ধু! কে?

—আরে, ধৈর্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলে।

মিঃ পাই এর হাতে একটা টর্চ মতো কিছু। যদিও সাইজটা বেশ বড়। প্রায় একফুট লম্বা।

আমরা কথা বলছি, তার মধ্যে দেখি বিপিনবাবু আসছেন। কল্যাণগড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সেদিন ছাত্রদের সামনে কানা হেবোর কাছে চড় খেয়ে অপমানে কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে আর স্কুলে যাচ্ছেন না। তা উনি হঠাৎ এই ভোর রাতে এখানে!

মিঃ পাই বিপিনবাবুকে দেখে বললেন— শরীর ঠিক আছে তো স্যার? আপনাকে সকাল সকাল এখানে ডাকলাম, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারবেন কেন ডেকেছি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দু মিনিটের মধ্যে শুনি ভারী পায়ের শব্দ এদিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ করে আবছা আলোতে আগন্তুকের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। কানা হেবো। ভয়ে বিপিনবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেছে। কানা হেবোর হাতে একটা থলি। আমাদের দেখে কড়া গলায় বলে উঠল—

—এসবের মানে কী মিঃ পাই? বলা হয়েছিল একা আসতে। বন্দুক লাগবে। টাকা কোথায়?

একটু থেমে আবার ধমকে উঠল— একটু চালাকি হয়েছে কি, সবকটাকে মেরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলব। এরা এখানে কী করছে?

মিঃ পাই বেশ সপ্রতিভভাবে এগিয়ে গেলেন হেবোর দিকে। তারপর বললেন— না, না— বন্দুক তো কিনবোই। তার আগে— একটু দেখি ভাই— বলে চেষ্টা করলেন সেটার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। ওনার হাতের টর্চের মতো জিনিসটার থেকে একটা ফ্ল্যাশ হেবোর মুখের উপর গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হেবোর বিশাল চেহারাটা ছিটকে দু ফুট দূরের মাটিতে গিয়ে পড়ল।

বলে উঠলাম— সর্বনাশ! মেরে ফেললেন না কি?

—না, না। দু'মিনিটের মধ্যে জ্ঞান ফিরবে। তখনই দেখব এক্সপেরিমেন্টটা কাজ করে কি না। বলে গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—ঠিক যন্ত্রটা নিয়েছিলে তো?

গণেশ দেখি কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল— আসলে ঘরে আলো কম ছিল তো— ঘুম ঘুম ভাবটাও ছিল। তাই টেবিলের উপর যেটা ছিল সেটাই নিয়ে—

মিঃ পাই গম্ভীর মুখে বললেন— না, না। আরেকটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল গণেশ। ঠিক যন্ত্রটা না হলে আমাদের কাজ কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? এই মাটির নীচে।

এর মধ্যে দেখি হেবো উঠে বসেছে। গোল গোল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর যেটা করল সেটার জন্যও আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। অন্তত আমি আর বিপিনবাবু তো নই ই।

হামাগুড়ি দিয়ে বিপিনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নীলডাউন হয়ে বসল। তারপর কান ধরে বলে উঠল— স্যার আর কখনও অঙ্ক টুকবো না। মাফ করে দিন স্যার।

বিপিনবাবু তখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মিঃ পাই বলে উঠলেন— এটা আমার ছোট্ট একটা আবিষ্কার। ওই একটা ফ্ল্যাশে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি কুড়ি বছর আগে। তখনও বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ত। আর আপনি ছিলেন অঙ্কের টিচার। ও সেকথাই বলছে।

হেবো ইতিমধ্যে কান ধরে ওঠবোস শুরু করেছে। মিঃ পাই গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন— পরীক্ষায় বই দেখে দেখে অঙ্ক টুকেছিলে— কেন? এর শাস্তি কী জান?

—হ্যাঁ জানি স্যার। আর কোনওদিন করব না। ওই শান্তনুই আমাকে বলল। অঙ্কের বইটা ওই ক্লাসে নিয়ে এসেছিল।

—আর লাস্ট বেঞ্চে বসে দুজনে মিলে বই দেখে অঙ্ক টুকেছো— তাও আবার ভুল অঙ্ক।

বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে ধমকের সুরে বলে উঠলেন— সারাবছর ফাঁকি দেওয়ার ফল। কতবার বলেছি যে অঙ্ক এমন একটা জিনিস যে সারাবছর না করলে মাথায় ঢোকে না।

—আর করব না স্যার! — ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে হেবো।

বিপিনবাবু উৎসাহিত হয়ে হেডটিচারের মেজাজে কানটা ধরে আচ্ছা করে মুলে দিলেন। তারপর বললেন—

—এক পা তুলে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক।

হেবো তা-ই করল।

আমি পাশ থেকে মিঃ পাইকে জিজ্ঞেস করলাম— আমিও কি দু-একটা চড় থাপ্পড় মারতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারুন না।

আমিও সপাটে একটা চড় মারলাম গালে। কয়েকদিন আগে স্কুলে যাবার পথে আমার মেয়েকে উলটোপালটা কথা বলে বিরক্ত করছিল। অন্য গালটাতেও আর একটা চড় মারলাম। কালীপুজোর চাঁদাটার কথা মনে করে।

হেবো দেখি বাচ্চা ছেলের মতো কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে। আর মাঝেমধ্যে পা পালটে ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করছে।

মিঃ পাইকে জিজ্ঞেস করলাম— তা ও এখন থেকে এরকমই থাকবে? ক্লাস নাইনের ছাত্রে অবস্থায়?

—না, না, এ তো একটা এক্সপেরিমেন্ট। এক-দেড় ঘণ্টা বাদে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, মস্তিষ্কের অ্যামিগডেলা থেকে পুরনো স্মৃতি যেভাবে জাগিয়ে দিয়েছি তাতে স্বভাব খানিকটা পালটাবে আশা করি। এ যন্ত্রটার নাম দিয়েছে কৈশোরের হামাগুড়ি'। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলাম— তার মানে? এই যে চড় মারলাম— মানে দু দুটো চড়— সেটা কি মনে থাকবে? তাহলে তো আমার সর্বনাশ! আমাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

মিঃ পাই খুব গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন— আমাদের মস্তিষ্ক খুবই জটিল। এসব নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে তো ঠিকভাবে বলা যায় না— কী মনে থাকবে আর কী মনে থাকবে না! তবে হ্যাঁ, মনে থাকলে আমাদের সবারই একটু বিপদ তো হবেই। আপনার তো আরও বেশি। এমনিতেও অত জোরে চড় মারাটা উচিত হয়নি। চলুন, যাওয়া যাক। আমার ওর কান্না শুনতে একদমই ভালো লাগছে না। হেবো এখানেই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক।

তারপর গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন— চলো, চলো গণেশ। বাড়িতে গিয়ে আজ অনেক কাজ। তোমাকে আবার আজকে একটা চিলের বাচ্চা ধরে আনতে হবে।

যাওয়ার আগে পাশে পড়ে থাকা থলেটা হাতে নিয়ে মিঃ পাই একবার ভিতরটা দেখলেন। তারপর বলে উঠলেন—

—দেখেছো!— চাইতে না চাইতেই পাঁচটা বিদেশি রিভলভার হাজির। ভালো দাম দেব বলেছিলাম। এগুলো সব পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। বলে থলেটা নিয়ে তড়তড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। পিছনে পিছনে গণেশ।

আমি আর বিপিনবাবুও বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। এখানে কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে কে জানে! এমনিতেই মিঃ পাই যা বললেন তাতে হার্টবিট বেড়ে গেছে। শেষে অন্য জায়গায় না বাড়ি খুঁজতে হয়। চড় খাওয়ার কথা মনে পড়লে হেবো আমাকে সহজে ছাড়বে না।

এর কিছুদিন পরের কথা। বলতে নেই এখনও বেশ সুস্থ শরীরে বেঁচে-বর্তে আছি। কানা হেবো পাড়ার মোড়ে একটা বইয়ের দোকান খুলেছে। তবে বিক্রিবাটা কিরকম হয় জানিনা। কারণ যখনই দোকানের সামনে দিয়ে যাই, দেখি একমনে অঙ্ক কষছে। সেদিনের ঘটনা ও মনে রেখেছে বলে মনে হয় না।

একদিন আমি আর বিপিনবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের দেখে ছুটে এল। বিপিনবাবুকে প্রণাম করে বলে উঠল—

—স্যার, আসুন, একটু চা খেয়ে যান। আর যদি দু-একটা চক্রবৃদ্ধির অঙ্কও দিয়ে দেন। দিনরাত অঙ্ক করছি। দেখবেন, আমি আগের থেকে অনেক ভালো পারছি।

চা-মিষ্টি খেয়ে— কিছু অঙ্ক করতে দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। হেবোর অঙ্কের স্ট্যান্ডার্ড ভালো হয়েছে, সন্দেহ নেই।

মিঃ পাই এর সঙ্গে সে দিনের পরে আর দেখা হয়নি। তবে আজ সন্ধেবেলা দরজার নীচে একটা কাগজের টুকরো পেলাম।

আগামী পরশু রাত চারটের সময় আমার বাড়িতে আসবে। খুব দরকারি কথা আছে। কাউকে জানাবেন না, আপনার স্ত্রীকেও নয়।

—মিঃ পাই।

শেষ চিঠি

আমি মেঝেতে ধুলোর মধ্যে উবু হয়ে বসে অবাক হয়ে পড়ছিলাম হাতে ধরা চিঠিদুটো। একবার নয়, দুবার পড়লাম। ছবির মতো হাতের লেখা। এসব চিঠির কথাও যেমন ভুলে গিয়েছিলাম, তেমনই ভুলে গিয়েছিলাম তার প্রেরকের কথা। আজ আবার করে সব কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের পুরনো বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। তাই দরকারি কোনও কিছু পড়ে আছে কিনা সেটাই দেখতে এসেছিলাম এই বাড়ি। প্রায় কুড়ি বছর আগে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাই। বছরে মাঝেমধ্যে কয়েকদিনের জন্য বড়জোর আসি। তাও গত দু-বছর তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার স্কুল-কলেজের সেই দিনগুলো এখনও যেন এ বাড়িরই জানলা-দরজার মধ্যে আটকে আছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে ছড়িয়ে আছে ছোটবেলার স্মৃতি।

শোওয়ার ঘরের কাচের আলমারিটা খালি করতে গিয়ে চিঠিগুলো হাতে এল। পৌলমীর। প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর আগে লেখা এই সব চিঠি। একসময়ে বারবার পড়েছি। মাথার বালিশের তলায় নিয়ে শুয়েছি। আর তাই পড়া আর না পড়া চিঠিগুলো আলাদা করতে সময় লাগল না। শেষদুটো চিঠি দেখে অবাক হলাম। ও দুটো আমার হাতে আর পৌঁছোয়নি। প্রথমবার পড়লাম। আর পৌঁছোয়নি কেন তা লেখা পড়েই বুঝতে পারলাম।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। আমি তখন ক্লাস নাইনে। পরীক্ষা শেষ। যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে মালদা। আমার মাসির বাড়ি। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসেছিল আমার বাবা। কথা ছিল মালদা স্টেশনে আমার মাসি আর মেসোমশাই এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। তা ওই ট্রেনেই আমার সঙ্গে পৌলমীর প্রথম দেখা। অবশ্য দেখা হয়েছিল সেটা বলাও বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নয়।

ও ছিল ওর দিদি আর বাবার সঙ্গে। ওদের বাড়ি শিলিগুড়ি। সেখানেই ফিরছিল। আমার সঙ্গে ওর বাবা আর দিদিই সেদিন কথা বলছিল। শুধু শুনেছিলাম পৌলমীও আমার মতো ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু আমার আর ওর মধ্যে কয়েকবার চোখাচোখি হলেও কথা আর হয়নি। একা যাচ্ছিলাম। যদি কোনও অসুবিধে হয়, তাই আমার কাছ থেকে ওর বাবা কথায় কথায় আমার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন।

কলকাতায় ফেরার কিছুদিন বাদে পৌলমীর প্রথম চিঠি পেলাম। বলা যায় সেই আমাদের মধ্যে প্রথম কথা শুরু। তখন ফোন সব বাড়িতে ছিল না। আর তাই চিঠির চল ছিল। ওই চিঠির উত্তরে আমার যে চিঠি গেল সেটা ক্লাসের পড়ার বাইরে আমার লেখা প্রথম চিঠি। খুব চিন্তা হচ্ছিল যে বানান ভুলগুলো জানিয়ে হয়তো পরের চিঠিতে এর উত্তর আসবে! ফিরতি চিঠি এল পুজোর খবর নিয়ে। নতুন জামা, বই পড়া, পুজোর ছুটিতে বেড়ানোর প্ল্যান— তার বাইরে তেমন কিছুই ছিল না তাতে। আমি আবার লিখলাম।

এভাবেই চলল চিঠির পর চিঠি। তবে আমরা জানতাম এসব চিঠি বড়দের হাত ঘুরেই হয়তো আমাদের কাছে আসবে। তাই খানিকটা বর্ণহীন শব্দের পোশাকে সাজিয়ে আবেগ লুকিয়েই আমাদের লিখতে হত। আর এসবের মধ্যে আমি আর ও দুজনেই স্কুলের গণ্ডি পেরোলাম। আমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম। আর ও শিলিগুড়ির কাছাকাছি একটা কলেজে ইংরাজি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

চিঠি থামল না। প্রতি মাসে অন্তত দুবার। আর একটু একটু করে শব্দগুলোও সাহসী হয়ে উঠল। প্রত্যেকবারই মনে হত আরেকটু লেখার জায়গা পেলে বোধহয় ভালো হত। কত কিছুই তো জানানোর আছে। নতুন কলেজ, নতুন বন্ধু, পড়াশোনার খবর, ভালো লাগার খবর। এমনকী কেউ আছে যাকে মনের সব কথা এত সহজে খুলে লেখা যায়!

প্রত্যেকটা দিন ঠিক যেভাবে রং বদলে আমার কাছে ধরা দিত, ঠিক সেভাবে ওকে খবরটা না পাঠাতে পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আর ওরও তাই। আর তাই ওর শহরের রাস্তা,বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, এমনকী ওর পছন্দের খাবার, পোশাক সবই যেন আমার চেনা হয়ে উঠেছিল। এক অচেনা শহরের মানচিত্রে শুধুই ছিল ওর নাম।

এরই মধ্যে একটা চিঠিতে জানলাম ওর বাবা অসুস্থ। ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

কেন যেন তখনও মনে হয়নি এই চিঠির বাইরেও একটা বাস্তব জগৎ আছে। আসলে ওর পরিচয়টাই বোধহয় হারিয়ে গিয়েছিল চিঠির শব্দের মধ্যে। আর তাই ওর বাবা অসুস্থ জেনেও দেখা করার কথাটা মাথায় আসেনি। আকাশ যেমন নীল হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়, ঠিক তেমন ও যেন ধরা দিয়েছিল শুধু চিঠির মধ্যেই পেনের দাগে। ঠিক সময়ে চিঠি না পেলে মনে হত যেন বড় কিছু একটা জীবন থেকে বাদ চলে গেছে।

ওর বাবার অসুস্থতার পর থেকেই ওর কাছ থেকে চিঠি আসা কমে গেল। কয়েক মাস বাদে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমার বেশ কিছু চিঠির উত্তর এল না। আমিও খানিকটা অভিমানেই আর চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলাম। পড়াশোনার চাপও ছিল। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের

এত চেনামুখের মধ্যে প্রায় না দেখা অচেনা একটা মুখ কোথায় যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। সময়ের পেন্টব্রাশে আবেগ হারিয়ে গেল।

আমি তখন কলেজের তৃতীয় বছরে। সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন আবার পরীক্ষা। খাওয়া শেষ করে বই নিয়ে বসতে যাব, মা একটা বিয়ের খাম বাড়িয়ে দিল— তোর জন্য বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পৌলমীর বিয়ে।

কিরকম লেগেছিল ঠিক বলতে পারব না। শুধু মনে হয়েছিল এর পরে আর চিঠি আসবে তো! খোলা খামের মধ্যে থেকে বিয়ের কার্ডটা বার করলাম। পরের শুক্রবারে। মধ্যমগ্রামে। ওখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। যদ্দুর জানি পৌলমীর পিসি থাকত মধ্যমগ্রামে। তাই ওখানেই হয়তো অনুষ্ঠান করছে ওরা। কলেজ ফেরত মধ্যমগ্রাম পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ঠিক করলাম, তবু যাব।

বিয়ের দিন সকাল থেকে অঝোর বৃষ্টি। নানান রাস্তায় জল জমে গেছে। তার জন্য বাস পেতে আরও দেরি হল। যখন পৌঁছোলাম অনুষ্ঠানবাড়ি, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। কারুর সঙ্গেই বিশেষ পরিচয় নেই। তাই চুপ করে একটু দূরে গিয়ে বসলাম। শেষে পৌলমীর দিদি আমাকে চিনতে পেরে কাছে ডেকে এনে বসালো। কাছ থেকে বিয়ের সাজে ওকে দেখলাম। ওকে খুব সুন্দর লাগছিল। কপালে চন্দনের দাগ। বড় লাল সিঁদুরের টিপ। কপালে চুল থেকে নেমে আসা সোনার টিকলি। বড় বড় চোখের পাশ দিয়ে কাজলের টান। পরণে লাল বেনারসি। কই, ও তো কোনওদিন লিখেনি যে ওকে এত সুন্দর দেখতে! হয়তো কীরকম দেখতে তা কখনও আমরা কেউ কাউকে জানানোরও প্রয়োজন বোধ করিনি। শুধু একে অন্যের চোখে চারপাশের পৃথিবীটা দেখে গেছি।

বিয়ের মন্ত্র পড়া হচ্ছে, আর তার মধ্যেই দেখলাম আমার দিকে ও বারবার তাকাচ্ছে। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে উঠল। যেন কত দিন দেখেছে।

বিয়ের কাজ শেষ হওয়ার খানিকবাদে ও এল। আমাকে ডেকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গেল। প্রথমবার ওকে এত কাছ থেকে দেখলাম। কিন্তু তাকাতেই বুঝলাম লেখা শব্দেরা কত শক্তিশালী। আর তাই ও আমার এত চেনা। ওর হাত নাড়া, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলা সব কিছুই যেন আমার আগে থেকে দেখা। ওর কোনও কিছুই যেন আমার অজানা নয়।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও বলে উঠল— কী ওভাবে তাকিয়ে আছ? কীরকম লাগছে সাজটা? সেদিন তো লজ্জায় তাকাওইনি। আজকে যে খুব সাহস হয়েছে!

খুব সুন্দর লাগছে। — বলতে গিয়ে নিজেই কুণ্ঠিত অনুভব করছিলাম।

ও হেসে বলে উঠল— তোমার এই সবুজ শার্টটা তোমার ছোট মামা আগের বারের পুজোতে দিয়েছিল, তাই না? খুব ভিজে গেছো। দেখো জ্বর না আসে।

—তুমি সেটা মনে রেখেছ?

ও হেসে উঠল। বলে উঠল— অনেক কিছুইতো মনে রেখেছি। আর কেউ তো আমাকে লিখবে না যে 'জানলার কাচে বৃষ্টির ফোঁটায় তোমার ঠোঁটের দাগ দেখতে পাই'। আর কেউ বলবে না যে 'মনে হয় অভিমানী বৃষ্টি হয়ে তোমাকে ছুঁয়ে মাটির খোঁজ পাই'। আরও বলি সেসব কথা? সামনাসামনি তো এসব কথা কোনওদিন বলতে পারতে না, তাই না?

আমার মুখটা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছিল।

এর মধ্যে ঘরে একজন মহিলা ঢুকলেন। দেখে মনে হল ওর পিসি। বলে উঠলেন— কি রে সবাই তোর খোঁজ করছে, চল।

—আমি এক মিনিটে আসছি পিসি।— ও একটু ভারী গলায় বলে উঠল।

ওর পিসি চলে যেতে অস্বস্তি কাটাতে বলে উঠলাম— তোমার তো হাসির গল্প সবথেকে ভালো লাগে। তাই কয়েকটা গল্পের বই নিয়ে— বলতে গিয়ে থেমে গেলাম।

হঠাৎ মনে হল ও আমার খুব কাছে চলে এসেছে। ওর নিশ্বাস আমার ঠোঁট ছুয়ে গেল। প্রথমবার মনে হল ওর চোখ কিছু বলতে চায়। আমার হাতটা ধরে ও বলে উঠল— তুমি আমার শেষ চিঠিগুলো পড়েছিলে?

আমি সেদিন না জেনেই পড়েছি বলেছিলাম। আর ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। আমার জামার হাতাটা মুঠোয় ধরে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছিল। সামলে নিয়ে ও বলেছিল— আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। পাই নি। বাবার মৃত্যুর পরে আর কেউ অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না।

আজকে জানলাম সে চিঠি আমি পড়িনি। পাঁচ বছরে যে কথা ও আমাকে বলে নি, সেটাইও লিখেছিল শেষ দুটো চিঠিতে। আর আমার সামনে এখন সেই চিঠিদুটোই পড়ে আছে। দু যুগ বাদে কে যেন আমাকে বলে উঠছে— তোমাকেই চাই। শুধু তোমাকেই চাই।

একই গল্প তিনজনের

বীরেনবাবুকে চেনে না এমন মানুষ খুব কম আছে। বিশেষ করে যারা অঙ্কে ভয় পায়, তারা তো চেনেই।

বীরেনবাবু অঙ্ক পড়ান কলকাতার এক বিখ্যাত স্কুলে। অঙ্কের নামকরা শিক্ষক। চিন্তাভাবনায় অত্যন্ত সাম্যবাদী। তাই প্রায় সব ছাত্রই স্কুলে ওঁর ক্লাস টেস্টে ফেল করে। দু-একজন যারা ভাগ্যক্রমে পাশ করে, তারাও নিজেদের কীর্তিতে লজ্জা পায়। যারা প্রতিবছর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্কে সবথেকে বেশি পায়, তাদের মধ্যে ওঁর কিছু ছাত্র থাকবেই।

উনি সেরা কিছু ছাত্রকে বিনা খরচে স্কুলের বাইরে পড়ান। তবে সেই সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। এজন্য উনি নিজে বেছে নেন। বলেই দেন যে ভালো ছাত্র না হলে সে ওঁর কাছে অঙ্ক শিখতে পারবে না। খুব ভালো অ্যাথলিট না হলে অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে কী লাভ! সেরকম ব্যাপার।

একই সঙ্গে ওঁর মতো রাশভারী রাগী শিক্ষক খুব কমই হয়। ক্লাসে যখন পড়াতে ঢোকেন, ঢোকামাত্র পিনড্রপ সাইলেন্স। শোনা যায় নকশাল আমলেও যেসব নকশালরা ওঁর ক্লাস ফাঁকি দিত, তাদের পরে ধরতে পারলেই নীলডাউন দিয়ে বারান্দায় বসিয়ে রাখতেন আর শক্ত শক্ত অঙ্ক দিতেন।

বীরেনবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চেহারা কীরকম বলব! ভালো লোকেরা বলবে স্বাস্থ্যবান, তেমন ভালো লোক না হলে বলবে মোটাসোটা, এমন কী মাথাভরা টাকের কথাও হয়তো তারা উল্লেখ করবে। সেরকম নিন্দুক লোকের তো অভাব নেই আজকাল।



বীরেনবাবু চিরকুমার। বিয়ে করেননি। কেন করেননি, সেটা অনেকে জানে না। আসল কারণটা হল বীরেনবাবু নারীজাতিকে খুব ভয় পান। যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করেন। বিশ্বাস করেন মেয়েদের মধ্যে অঙ্ক বোঝার চেষ্টা করে এমন নারীর সংখ্যা খুব কম। এই তো সেদিন হাতিবাগান মার্কেটে পাঞ্জাবি কিনতে গিয়ে এরকমই অঙ্কের দুর্বলতাসূচক কিছু কথা ওঁর কানে এসেছিল।

এক মহিলা সুরেলা গলায় পাশের এক দোকানির সঙ্গে দরাদরি করছিল। এক ব্যাগের ব্যাপারে। দোকানিকে স্পষ্ট ব্যাগটার দাম সাতশো টাকা বলতে শুনেছেন। কিন্তু তারপরে

মহিলা ব্যাগটা হস্তগত করে সেই ব্যাগের নানান নিন্দা ও প্রশংসা একই সঙ্গে করে নব্বই টাকা দিতে চাইল।

এই যে সাতশো থেকে নব্বই টাকায় হঠাৎ করে নেমে আসা এটা অঙ্ক না জানা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব। দশ শতাংশ ডিস্কাউন্ট, বা কুড়ি শতাংশ ডিস্কাউন্ট বলা স্বাভাবিক। তা না করে হঠাৎ করে নব্বই। তাও সত্তর দাম বললেও একটা কথা ছিল, তা না হঠাৎ নব্বই। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন ৮৮% ডিস্কাউন্ট চায় মহিলা।

সেখানেই শেষ নয়। তারপরে যে অ-গণতান্ত্রিক দরাদরি শুরু করল, তাতে উনি নিজে পাঞ্জাবির বদলে ভুল করে এক ডজন মোজা কিনে ফেললেন। শেষে সেই মেয়েটা একশোটাকায় ওই সাতশো টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। নারীজাতির অঙ্ক বিমুখতার উপরে ওঁর যে বিশ্বাস ছিল, সেটাই আবার করে সত্যি প্রমাণিত হল। দেখলেন পাশের দোকানি তখনও মহিলার উপরে রেগে কীসব কথা বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে।

এ সেই বীরেনবাবুর গল্প।

এবার আসল গল্পে আসি।

১

বীরেনবাবুর চোখে

সেদিন স্কুলের পরে কয়েকজনকে পড়াতে যাচ্ছিলেন। উনি সবসময় হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করেন। আসলে সব সময় উনি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলার চেষ্টা করেন। কখনও সামান্যতম দেরিও ওঁর বরদাস্ত নয়। বাসে, ট্রামে গেলে কে বলতে পারে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়বে না! কে বলতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না।

এতে দেরি হয়ে যেতে পারে। সেজন্য উনি হেঁটে যাতায়াত পছন্দ করেন। কখনও সামান্যতম দেরি করেন না। দু মিনিট আগে পৌঁছেও উনি অনেক সময় অপেক্ষা করেন যাতে ঠিক মিনিট-সেকেন্ড মিলিয়ে পড়াতে শুরু করা যায়। সময়জ্ঞান না থাকলে, তারা অঙ্ক কী করে বুঝবে?

এভাবেই হিসেব করে এগোচ্ছিলেন উনি। সামনে যে পথ, তা অতিক্রম করতে ঠিক সাত মিনিট লাগবে। ছটা বাজতে ঠিক আট মিনিট দেরি। অর্থাৎ এক মিনিট অতিরিক্ত সময় হাতে আছে। সেটা রাখা ভালো। হয়তো হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বা কেউ এসে ধাক্কা মারল। বা কোনও পাখি আকাশপথে যাওয়ার সময় ওঁর সাদা পাঞ্জাবিতে বর্জ্য ত্যাগ করল। হাতে তাই এই একস্ট্রা একটা মিনিট রাখা ভালো।

এসব ভেবে রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। কিছু দূরে একটি মেয়ে সেও রাস্তা পারের জন্য অপেক্ষা করছে। চোখাচোখি হতেই সে মেয়েটা ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসল বলে মনে হল। এ কী সত্যি। নাকি চোখের ভুল? একটু সামলে নিয়ে আবার সলজ্জভাবে তাকালেন মেয়েটার দিকে। মেয়েটা আবার হাসল। ওঁর দিকে তাকিয়েই।

বীরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসার সাহস কেউ পায় না। মেয়েরা তো নয়ই!

শীতের সময়। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তবু ঘামতে শুরু করলেন। এক সময়ে ওঁকে দেখতে ভালো ছিল অবশ্যই, কিন্তু এখন এই বয়সে! টাকের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জড়ো হচ্ছিল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ভাঁজ করা রুমাল বার করে একবার মুখ আর টাক মুছে নিলেন। তারপরে মেয়েটা যাতে পিছু না নিতে পারে সেজন্য হঠাৎ করে কিছু বাস আর গাড়ির মাঝখান দিয়ে একদৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেলেন।

উলটোদিকের ফুটপাথে পৌঁছে পিছনে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন না। খানিকবাদে যখনই ফিরে তাকালেন, তখনই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ওঁর পিছন পিছন ওঁকে ফলো করে মেয়েটা আসছে। চোখাচোখি হতে আবার হাসল। এরকম অর্থবহ হাসি উনি বহুদিন আগে দেখেননি। গতি বাড়ালেন। ক্যালকুলাসের জটিল অঙ্ক যেভাবে চটপট সমাধান করে ফেলেন, সেরকম কোনও সমাধান সূত্র আছে কিনা ভাবলেন। পেলেন না।

একটাই উপায়। এই বাকি পথে ওঁর আর ছাত্রের বাড়ির মধ্যে উত্তর কলকাতার অজস্র অলিগলি আছে। খুব ভালো ধাঁধা শলভ করে এমন লোকও এ পথে প্রথম বার এলে হারিয়ে যাবে। মেয়েটা যাতে ফলো না করতে পারে সেজন্য অন্য পথে যাওয়া দরকার।

উনি সেটাই করলেন। কিছু লোক রাস্তায় একটা কচুরির দোকানে সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ডানদিকের একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়লেন। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এদিক ওদিক গিয়ে আবার একটা অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। সেই রাস্তায় উঠে কিছুটা গিয়ে ফিরে তাকালেন। কেউ নেই। নিশ্চিন্ত।

এ রাস্তার দুধারে দোকান নেই। পুরনো দিনের হতশ্রী বাড়ি পরপর সারি দিয়ে ঝিমোচ্ছে। বেশ শুনশান রাস্তা। দু-তিনটে কুকুর এলজ পাকিয়ে শুয়ে আছে এদিক ওদিক। ওঁর মতো অচেনা লোকের প্রতি তাদের দৃষ্টি খুব একটা সুবিধের নয়। আড়চোখে দেখছে। কুকুর জিনিসটাকে পছন্দ করেন না উনি। কিন্তু এরকম বড় বিপদের কাছে সামনে কুকুর থেকে বিপদের কথা ওঁর মাথায় এল না। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আবার পিছন ফিরে দেখলান। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ে চমকে উঠলেন।

মেয়েটা কুড়ি হাত মতো দূরে পিছন পিছন আসছে। আবার চোখাচোখি হতেই রহস্যজনকভাবে হেসেছে। সে চোখের দৃষ্টিকে কোনও জ্যামিতিক শেপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না।

একই সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে একে আগে কখনও দেখেননি। বছর কুড়ি-বাইশ হবে। রোগা। রঙ সামান্য চাপা, বেশ আকর্ষণীয় দেখতে। কিন্তু হঠাৎ ওঁর পিছু নেওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? ভালোলাগা? নাকি কোনও গভীর ষড়যন্ত্র? মাতাহারির মতো কোনও মহিলা গুপ্তচর নয় তো?

এই যে বছরের পর বছর ওঁর ছাত্ররা, ওঁর স্কুলের ছাত্ররা এত সাফল্য পাচ্ছে, এই রহস্য জানতে অন্য স্কুলের কেউ গুপ্তচর পাঠায়নি তো? বা কোনওরকম ভাবে কেউ ওঁর বদনাম রটানোর চেষ্টা করছে না তো?

এসব ভাবতে ভাবতে সামনের বাঁদিকের একটা সরু গলিতে হঠাৎ করে ঢুকে পড়লেন বীরেনবাবু। সরু গলির দু পাশ দিয়ে কিছু বাড়ি। দুটো লোক বড়জোর পাশাপাশি যেতে পারে। তারমধ্যে পিছনের দিকে তাকাতে তাকাতে ছুটতে গিয়ে একটা উঁচু হয়ে থাকা পাথরে পা মচকে রাস্তায় একটা জোর আছাড় খেলেন। তবু সে যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটতে থাকলেন। আরও কিছু অলি গলি হয়ে যখন ছাত্রের বাড়ির গলিতে এসে ঢুকলেন, তখন উনি নিশ্চিন্ত যে মেয়েটা শেষ অবধি পিছু নিতে পারেনি। চারদিক একবার দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, মেয়েটা নেই। এখনও এত জোরে ছুটতে পারেন ভেবে একটু আত্মতুষ্টির হাসিও হাসলেন।

সামনেই ছাত্রের বাড়ি। একবার ঢুকে যেতে পারলেই নিশ্চিন্তি। রাস্তা থেকে বাড়ির দালানের সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়িতে পা ফেলে সেই বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে বীরেনবাবু খেয়াল করলেন গলির মাথায় সেই মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। এদিকেই এগোচ্ছে।

২

ছাত্রের চোখে

আজ কী ব্যাপার হল বুঝলাম না। আমরা সবাই মিলে তখন বীরেন স্যারের আসার অপেক্ষা করছি। শেষ কিছু মুহূর্তের উত্তেজনায় আমরা চুপ করে বসে আছি, বড় ঝড় আসার আগে গাছগুলো যেমন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমন। হঠাৎ দেখলাম আমাদের বাড়ির উঠোনের উলটো দিকের বারান্দা দিয়ে উনি প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন। পিছনে কুকুর তাড়া করেছে নাকি?

ঘরে ঢুকে উনি চেয়ারে বসেই ঘষঘষে গলায় বলে উঠলেন— জল, জল হবে?

দেখলাম সাদা পাঞ্জাবি পুরো ঘেমেভিজে গেছে। পাঞ্জাবির কিছু জায়গা নোংরা হয়ে গেছে।

আমরা ব্যস্ত হয়ে সামনে রাখা জলের জাগ থেকে জল গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিলাম। উনি পুরো একগ্লাস জল প্রায় একটানা শেষ করছিলেন। কিন্তু আবার কী যেন দেখে চমকে উঠলেন। ছলকে জল ওঁর পাঞ্জাবিতে পড়ল। কোনওরকমে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু মিনিট দুয়েক কোনও কথা বললেন না। ওঁর চোখে এই ভয়ের দৃষ্টি আমরা কখনও দেখিনি। এর উলটোটাই হয়।

খানিকবাদে নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন—

—বাড়িতে, ডেটল আছে? আমার পাটা একটু ছড়ে গেছে।

আমরা শতব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমাদেরই খেয়াল করা উচিত ছিল। প্যান্টের হাঁটুর জায়গাটা ছিড়ে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে। বীরেনবাবু নাকি রাস্তায় পড়ে গেছেন। আমি ছুটলাম ডেটল আনতে।

গতবার অর্থাৎ ঠিক তিনদিন আগে প্রায় দুশোর মতো অঙ্ক দিয়েছিলেন। প্রত্যেকের আলাদা করে করার কথা হলেও আমরা নিয়ম ভেঙে নিজেদের মধ্যে সবরকম সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকি। কিন্তু সেসব করেও সবাই মিলে দুশোটা করে উঠতে পারিনি। ডেটল ইত্যাদি দিয়ে যদি স্যারকে খানিকক্ষণ ব্যস্ত রাখা যায়, তাহলে বিপদ কমবে। সেটা একদিক থেকে বেশ ভালো।

লক্ষ্য করলাম আজ বীরেন স্যার কেমন যেন স্তিমিত। মাঝেমধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। অঙ্ক না করা নিয়ে তেমন তর্জন গর্জনও করলেন না। বারবার শুধু জল খাচ্ছেন। আর জানলার দিকে তাকাচ্ছেন।

৩

মেয়েটার চোখে

আজ ট্রাম থেকে নেমেই দেখলাম বীরেনবাবুকে। আমাদের বাড়িতে পড়াতে আসেন। ভাইকে পড়ান। ভদ্রলোক খুব রাগী ও রাশভারী বলে শুনেছি। সবাই ভয়ে কাঁপে। অঙ্কের স্যার হিসেবে খুব নাম আছে। আমি আবার অঙ্কতে চিরকালই কাঁচা। ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখি উনি হাতছ'য়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই ভদ্রতা দেখিয়ে হাসলাম। আমাকে নিশ্চয়ই বাড়িতে দেখেছেন। যেখানে পড়ান, সে ঘরের উলটোদিকের বারান্দায় আমার হাঁটাচলা লেগেই থাকে। তাছাড়া দোতলার বারান্দায় যখন যাতায়াত করি, তখনও ওই ঘর থেকে দেখা যায়। হাসা স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। তারপরে একটা ছুটে আসা বাসের সামনে প্রায় ঝাপিয়ে পড়ে ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেলেন। একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু নাহ, দেখলাম, সুস্থভাবেই রাস্তার অন্য দিকে পৌঁছেছেন। আমি রাস্তার উলটো দিকের ফুটপাথে গিয়ে কিছুটা হাঁটার পরে আবার ওঁকে দেখতে পেলাম। দেখলাম, উনি আবার পিছন ফিরে তাকালেন। মনে হয় আমাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু না দাঁড়ালেন না। হাসলেনও না। বরঞ্চ আরও জোরে হাঁটতে শুরু করলেন।

উত্তর কলকাতার রাস্তার একটা বৈশিষ্ট্য হল অলিগলি যেমন অজস্র, যে পথই নেওয়া হোক না কেন গন্তব্য এক হলে শেষে পথেই দেখা হবে। উনি একটা সরু গলি ধরে ভেবেছিলেন বোধহয় শর্টকাট করছেন। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। আমিও প্রায় একই সঙ্গে পরের রাস্তায় অন্য দিক দিয়ে উঠলাম। আবার দেখা হল। কেন জানি না এবারে উনি যেন ছুটতে শুরু করেছেন। হয়তো দেরি হয়ে গেছে।

সবথেকে অবাক লাগল বাড়িতে যখন ঢুকলাম, বীরেন স্যার ওই ভাবে আমাকে দেখে ভয় পেলেন কেন। যাই হোক, একটাই বাঁচোয়া এরকম রাগী স্যারের কাছে আমাকে পড়তে যেতে হয়নি।

পরের দিন দেখা হলে অবশ্য কথা বলব।

সেদিন রাস্তারমোড়ে

১

—আলিম, গাড়িটা এখানে একটু দাঁড় করাও তো!

ব্যস্ত রাস্তার পাশে মার্সেডিজটাকে থামাতে বলল রঞ্জন। ফের বলে উঠল—

—এখানে রেখো না। কাছাকাছি যেখানে পার্কিং করতে পারবে করে নিও। আমি পাঁচ মিনিটে চলে আসছি। ফোন করে নেব।

—স্যার, একা নামবেন কোনও অসুবিধে হবে না তো! কেউ চিনে ফেললে?

—না, না, কে চিনবে আমাকে এখানে? এরা নেতা— অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চেনে শুধু। তাছাড়া, স্যুট-টাই-অফিসের পোশাক নেই। সাধারণ পোশাক। কেউ খেয়াল করবে না।

—কিন্তু এরকম ব্যস্ত জায়গায়? কোনও জায়গায় যাবেন বলুন। ঠিক সেখানে নামিয়ে দেব।

—আরে না, না, আমি এখানে বড় হয়েছি। কোনও অসুবিধে হবে না।

—দাঁড়ান, আপনি বসুন। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

—ধুর, তুমি পারো বটে। আমি নিজে নামছি।

রঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। আস্তে করে এসে দাঁড়ায় রাস্তার একপাশে। সেই ছোটবেলার রাস্তা। রোজ এখান দিয়েই পার হত। সে রাস্তার ছবি এখনও চোখে লেগে আছে। সে রাস্তার গন্ধ এখনও যেন নাকে মিশে আছে। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ওর চোখে স্বপ্নের ঘোর থাকত।

লক্ষ্য করল উলটো দিকের জুয়েলারির দোকানটা উঠে গিয়ে এখন একটা ফার্নিচারের দোকান হয়েছে। গাড়ির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বিবেকানন্দরোড ও সিমলা রোডের মোড়ে যে পুরনো চপ কাটলেটের দোকান ছিল, সেটা উঠে গিয়ে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। একটু মনখারাপ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে দোকানের উপরে কোল্ডড্রিংক্সের বড় বিজ্ঞাপনটা দেখে মনখারাপ চলে গিয়ে একটু আত্মতৃপ্তি হল।

সারা বিশ্বে ছড়িয়েথাকা ওই সফট ড্রিংকস কোম্পানির সর্বেসর্বা আজ ও। এত বছর পরে নিজের শহরে ফিরে এসে ওর প্রিয় জায়গাতেই এই কোম্পানির প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেখে খুব ভালো লাগল। এ রাস্তা ওকে পুরোপুরি ভোলেনি তাহলে।

কেউ হয়তো জানেই না যে এখান থেকে কিছু দূরেই ওর ছোটবেলা কেটেছে।

—স্যার, স্যার, আপনি রঞ্জন সরকার না?— একটা বছর পঁচিশেকের ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। চোখে তার অবিশ্বাস, আর একই সঙ্গে আনন্দের ছোঁয়া।

ছেলেটার প্রশ্নে চমকে উঠলে রঞ্জন।

রঞ্জনের চোখে সানগ্লাস। জিন্সের উপরে, একটা সাদামাটা টিশার্ট। কোথায় ক্যালিফোর্নিয়া আর কোথায় কলকাতা। ওর এখানে আসার কথা তো কেউ জানে না। তবু ছেলেটা চিনে ফেলেছে?

ছেলেটা ওর উত্তরের অপেক্ষা করল না ফের বলে উঠল— স্যার, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি রঞ্জন সরকারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। জাস্ট আনবিলিভেবল।

রঞ্জন জানে এখন আরও লোক ওকে চিনে ফেললে ও বিপদে পড়বে। ওকে না চিনলেও ওর কোম্পানির সফট ড্রিংকসকে সারা বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটা লোক চেনে। যারা শিক্ষিত, যারা সামান্য খবর রাখে, তারা ওকে চিনবেই। কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও একটা মিটিং ছিল। সে ছবি সব কাগজেই বেরিয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন চ্যানেলেও না চাইলেও ওর মুখ দেখায়।

—স্যার, একটা কথা বলব। একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে খুব ভালো হত। খুব বাজে অবস্থা। বাবা রিটায়ার করে গেছে। আমার দিকেই সবাই তাকিয়ে আছে। বেশ কিছু বছর ধরে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। কবে চাকরির ডাক আসবে জানি না। স্যার, আপনি চাইলেই তো হয়ে যাবে।

রঞ্জন এটাই আশঙ্কা করছিল। যেন চাকরির জন্য শিক্ষা, যোগ্যতা কোনও কিছুরই দরকার পড়ে না, জানাশোনা থাকলেই চাকরি হয়ে যায়। কলকাতার চাকরির যা অবস্থা, তাতে এই রাস্তার মাঝে এখন ওর পরিচয় জানলে এখন ও মবড হয়ে যাবে।

ছেলেটার যেন কোনও কথাই শোনে নিরঞ্জন এরকম একটা ভাব করে দ্রুতপায়ে গাড়ির ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটা হর্ন পেরিয়ে ছুটে রাস্তার অন্যদিকে চলে এল।

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। ছেলেটা পিছু নেয়নি। দ্রুত পায়ে অন্য ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে থাকল। এই রাস্তায় কত হাজারবার হেঁটেছে ও। এই ইটগুলোর স্মৃতিশক্তি থাকলে নিশ্চয়ই চিনে নিত ওকে।

মনে পড়ে গেল সেই দিনটা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের সেই দিনটা।

সেদিন অবশ্য ও এই রাস্তা পার হতে চায়নি। ও অন্যরকম কিছু চেয়েছিল।

কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। সফল হয়নি বলেই ও আজও আছে।

২

রঞ্জন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। কিন্তু ওর বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। পড়ত কলেজ স্ট্রিটের এক নামী সরকারি স্কুলে। প্রথম হত। অনেকেই জানত যে ও শুধু উচ্চমাধ্যমিক কেন রাজ্য জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরীক্ষায় প্রথম দশে থাকবে।

কিন্তু ওর যখন ক্লাস টুয়েলভ, তখন শুরু হল হঠাৎ করে একের পর এক বিপর্যয়। টানাটানির সংসার। বাবার একটা ছোট বই-এর দোকান ছিল। গল্পের আর স্কুলের বই-এর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের দরকারির টুকিটাকি নানান জিনিস থাকত সেখানে। সামান্য রোজগার হত। তাতে কোনওরকমে চলে যেত ওদের সংসার।

কিন্তু ঠিক সে সময় হঠাৎ করে ধরা পড়ল বাবার ক্যান্সার। লাং ক্যান্সার। তখন এর বিশেষ চিকিৎসা ছিল না। টাকাও ছিল নাওদের। তবু শেষ চেষ্টা তো করতেই হবে। মনে আছে বাবাকে নিয়ে বিভিন্ন টেস্ট করতে যেত সে সময়। জলের মতো টাকা খরচ হতে শুরু করল।

তার মধ্যে আরেকটা বিপদ হল।

রঞ্জনের দিদি রঞ্জনের থেকে তিন বছরের বড়। অবিবাহিত। একটা ছোট প্রাইভেট স্কুলে পড়াত। সামান্য টাকার চাকরি। কিন্তু স্কুল থেকে আসার পথে একদিন বাস থেকে পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট হল। এক পায়ের উপর দিয়ে চাকা চলে গেছে। ছোটাছুটি— হাসপাতাল — ডাক্তার এসবের পরে প্রাণ বাঁচল, কিন্তু ডান পাটা বাদ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ পড়ল সবকিছুর সম্ভাবনা।

কী অদ্ভুত ছিল সেই সময়। বাড়ির সব রোজগার বন্ধ। এমনিতেও বাবার চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু দেনা হয়েছিল। এখন একমাত্র ভরসা রঞ্জন। তাকে জয়েন্টে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পেতেই হবে। এবারেই পেতে হবে। এটাই রোজগার করার সবথেকে তাড়াতাড়ি উপায়।

রঞ্জনের পক্ষে অবশ্য না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তবু সে সময়ে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না। সারা ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেত শুধু কয়েক হাজার সেরা ছাত্রছাত্রী। তবু রঞ্জন পাবে না, এটা ভাবাই যায় না। ওর আগের ব্যাচে যে প্রথমত স্কুলের পরীক্ষায়, সেই দীপেন্দুদা জয়েন্টেও প্রথম হয়েছিল। তাই রঞ্জনকে ঘিরেও বিশাল প্রত্যাশা ছিল।

রঞ্জন জয়েন্টের পরীক্ষার আগের দিন ঘুমোতে পারেনি। বারবার ঘরে শুয়ে থাকা দুই রোগীর দিকে তাকিয়েছিল। বাবা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মা মাঝেমধ্যে উঠে গিয়ে খোঁজ

নিচ্ছে। জল দিচ্ছে। বাবার একদম লাস্ট স্টেজ। কোনও আশা নেই।

উঠে বাবার বিছানার পাশে খানিকক্ষণ বসে থাকল রঞ্জন। বাবা যদি জেনে যেতে পারত যে রঞ্জন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পেয়েছে, মৃত্যুর আগে খানিকটা শান্তি পেত। মুখ— চেহারাগত কয়েকমাসে সব কীরকম যেন পালটে গেছে। চেনা যায় না। আগে বাবাকে এত মিস করত না রঞ্জন, কিন্তু যত দিন ফুরিয়ে আসছে ততবেশি বুঝতে পারছে, এই সামান্য মাঝের সময়টুকু কত মূল্যবান।

দিদি মার সঙ্গে নীচে মেঝেতে শুয়ে আছে। কীরকম অসহায় মুখ। দিদির বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা হচ্ছিল। এখন আর সে ভেবে লাভ নেই। কোনও পাত্র এক বিকলাঙ্গ মেয়েকে অত সহজে বিয়ে করবে না। দিদির পক্ষে চাকরি পাওয়াও সহজ হবে না।

পাশে শুয়ে মা। মাকে কখনও বসে থাকতে দেখেনি রঞ্জন। সারাক্ষণ কাজ করে। একের পর এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তবু মাকে যেন মাটির থেকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। মা যেন মরুভূমিতে এখনও এক ফোঁটা জলের খোঁজ করে যাচ্ছে। রঞ্জনই সেই জলের সন্ধান দিতে পারবে।

উত্তেজনার ঘুম এল না রঞ্জনের। ওর পড়ার টেবিলে এসে বসল। রঞ্জনের জীবনের একটা বড়সময় কেটেছে এই টেবিলে। সামনে একটা খড়খড়ির জানলা। এই জানলাটা রঞ্জনের খুব প্রিয় জায়গা। জানলার বাইরেই যেন ওর সৌরজগৎ। সে সৌরজগৎ ওর ঘরের মতো থেমে নেই। উলটো দিকের বাড়িতে বহু ভাড়াটে থাকে। কিছু না কিছু হতেই থাকে। সেই রঙিন জীবন দেখতে ওর ভালো লাগে।

ল্যাম্প জ্বেলে বইতে চোখ রাখল। কিছু ফরমুলা, ইকুয়েশনে চোখ বুলিয়ে নিল। এবারে না পেলে, আর কখনও ওর কাছে এ সুযোগ আসবে না। আরেক বছর অপেক্ষা করার মতো অবস্থা নেই ওর। যদি চার বছর বাদে ভালো চাকরি হয়ে, তাহলে তখনই হয়তো চিকিৎসাটা ভালো করে করানো যাবে। আরেকবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাবার মুখটা। রঞ্জনের উপরে কত আশা।

গভীর বেদনা দুঃখকষ্ট একটা পরিবারের সবাইকে অনেক কাছে এনে দেয়। সেটা ও দিব্বি বুঝতে পেরেছে।

সকালের দিকে ঘুম পাচ্ছিল। খানিকক্ষণ শুয়ে ছটফট করার পর সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ফের উঠে পড়ল। উত্তেজনায় চিন্তাভাবনা কীরকম যেন অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল।

পরীক্ষা হলে এরকম পরিস্থিতির সামনাসামনি আগে কখনও হয়নি রঞ্জন। সেদিন ছিল অঙ্কের পরীক্ষা। একটা অঙ্ক খানিকটা করার পরেই মনে হচ্ছিল, না, এটা বোধহয় ও পারবে

না। পারলেও অনেক সময় লেগে যাবে। সামান্য সময়ের মধ্যে অনেক অঙ্ক করতে হবে। প্রথম দশে আসতে গেলে অংকে অন্তত ১৮০, হ্যাঁ, ২০০ তে অন্তত ১৮০ করতেই হবে।

সেটা যে রঞ্জন করতে পারে, সেটা শুধু রঞ্জন নয়, সবাই জানে। এমনকী অনেকে বলে রঞ্জনের মতো এত ভালো অঙ্কে গত বছরের দীপেন্দুদাও ছিল না।

কিন্তু এ কী হল! বারবার মনে পড়ছে বাবার সেই অসহায় মুখ। মনে পড়ছে দিদির আরক্ত অসহায় সেই মুখ। মনে পড়ছে ওর জানলার বাইরের বেড়ালগুলোকে। মনে হচ্ছে যেন একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও ধরতে গিয়ে ধরতে পারছে না।

হাত যেন কাঁপতে শুরু করল। চিন্তা অবিন্যস্ত। বুক ধড়ফড় করছে। সব অঙ্কগুলোই যেন ওর কাছে অজানা অচেনা হয়ে উঠছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। ও কী পাগল হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে! বুদ্ধি যেন আর ওর বশে নেই।

—আর ইউ ওকে?

গার্ডের প্রশ্নে ঘোর ভাঙল রঞ্জনের। গার্ড অবাক হয়ে দেখছে। ছেলেটার চোখে যেন কোনও দৃষ্টি নেই। সেই গার্ড অবশ্য রঞ্জনকে চেনে না। ভাবল শক্ত প্রশ্নপত্রের জন্য বোধহয় এই অবস্থা হয়েছে। তা না হলে কোনও পরীক্ষার্থী-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে!

অনুমতি নিয়ে বাথরুম গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে এল রঞ্জন। কিন্তু বুঝতে পারল সব শেষ হয়ে গেছে। বাকি দেড় ঘণ্টায় তেমন কিছু করার নেই। মোটে ষাট নাম্বার উত্তর দিতে পেরেছিল সে দিন।

সে দিন প্রথম বার এই রাস্তাকে অন্য ভাবে দেখেছিল ও। এই রাস্তার মোড়ে এসে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভেবেছিল রঞ্জন।

কীভাবে ও মুখ দেখাবে সবাইকে? যে রঞ্জনকে ঘিরে সবাই আশা করে বসে আছে প্রথম দশে থাকবে বলে, সে কী করে বলতে পারবে যে সে পায়ইনি। কীভাবে বোঝাবে বাবা-মাকে, যাদের দিন গোনা শুধু ওর কথা ভেবে।

রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল দ্রুতগামী বড় কোনও একটা বাসের যেটা চট করে থামতে পারবে না। সেই সামান্য কিছু মুহূর্তে পৃথিবীটা যেন বদলে গিয়েছিল ওর কাছে। মনে হচ্ছিল উলটোদিকের বাড়িগুলো যেন কিছু বাচ্চার হাতে রঙ পেনসিলে আঁকা। মনে হচ্ছিল ওর থাকা না থাকাতে কিছু এসে যায় না এই ছবিরঙের মিথ্যে পৃথিবীর। ওকে অন্তত সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে না— আই অ্যাম এ কমপ্লিট ফেলিওর। আমি হেরে গেছি।

একটা বড় লাল ৮ নাম্বার বাস আসছে। ও এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন হাত ধরে টান দিল। ও দেখল পাশে একটা অন্ধ বৃদ্ধ ভিখারি, ওর হাত এসে ধরেছে।

—আমাকে একটু রাস্তা পার করে দেবে বাবা?

একটু সময় নিল রঞ্জন এই পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য। লোকটাকে উপকার করে এসে তার পরেও এটা করা যায়। ওর মনের অবস্থা বোঝা এই অন্ধ ভিখারির পক্ষে সম্ভব নয়। অন্ধ ভিখারির হাত ধরেও অন্য দিকে নিয়ে গেল।

বৃদ্ধ লোকটা বলে উঠল— তুমি খুব ভালো ছেলে। আসলে আমার যে লাঠিটা থাকে, সেটা আজ খুঁজে পাইনি। তা ভাই তোমার নাম কী?

লোকটা সেটা জানার পরে আবার বলে উঠল—বড্ড খিদে পেয়েছে। কী সুন্দর চপের গন্ধ আসছে। খাওয়াবে?

এত ভারী সমস্যা। মরার সময়েও এরকম অনুরোধ।

রঞ্জন এর কাছে সব সময় পাঁচ টাকা রাখা থাকে। যদিও খরচ হয় না, কারণ হেঁটেই স্কুল সবসময় যাতায়াত করে, আজও তাই করেছে।

ও পাঁচ টাকাটা গরিব লোকটার হাতে দিয়ে বলে উঠল, কিছু খেয়ে নাও।

—সে কী করে হয়। একা খাব কেন? তুমিও চলো!

এ কী ধরনের আব্দার। কিন্তু তবু ফেলতে পড়ল না রঞ্জন। দুটো লঙ্কা আর আলুর চপ খাওয়ার পরেই না হয় বাসের তলায় যাওয়া যাবে। বাসের অভাব পড়েনি এই রাস্তায়! কতদিন খায়নি এসব!

লোকটা চপ খেতে খেতে কথা বলে চলল— বুঝলে বাপু। আমি এখনও আশা হারায়নি। যতদিন আবার চোখে না দেখতে পাব, ততদিন চেখেই শুধু দেখে যাব।

—বলে হেসে উঠল লোকটা।

—নাহ, এসব হালকা কথার সময় নয় এটা। ওর হাতে সময় নেই।— উঠতে যাচ্ছিল।

লোকটা এবার ওকে অবাক করে বলে উঠল— যা করতে যাচ্ছিলে, সেটা করো না। আমি অন্ধ হতে পারি। কিন্তু সব বুঝতে পারি। কী হয়েছে? প্রেম ভেঙে গেছে নাকি অন্য কিছু!

চুপ করেছিল রঞ্জন।

লোকটা ফের দার্শনিকের মতো বলে উঠল—অন্ধরা খুব সুখী হয়। কারণ কী জানো? আমরা পৃথিবীটাকে ভালো দেখতে শিখি। সবাই ভালো। তা না হলে ভাবোতো আমি আর আমার বুড়ি বউ কী করে এতদিন বেঁচে আছে। তোমাদের মতো ভালোমানুষদের জন্যই, তাই

না! আমার বউ-এর এখন শরীর খুব খারাপ। একটা ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। কিন্তু আমি জানি কঠিন অসুখ, ও বাঁচবে না। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা।

—যাই হোক না কেন বাপু, লড়ে যাও। জীবন অনেক অনেক বড়। পরে দেখবে এসব ছোটখাটো দুঃখ-কষ্ট পথে পড়ে থাকা নুড়ি পাথরের মতো। লড়ে যাও, এত সহজে হেরো না। ভাবো তো আমি তাহলে কিসের আশায় বসে আছি!

এই যে আমি ওখানে বসি। আর ভাবি জীবনটা কী সুন্দর। কতরকম আওয়াজ। কতরকম গন্ধ। কতরকম মানুষ। সব যেন ভালোবাসা দিয়ে মোড়া। এ ফেলে যেতে বড় মায়া লাগে। আমাকে রানী, মানে আমার বউ মাঝেমধ্যে বলে ওই আকাশটার কথা। কত নাকি তারা ওঠে। আমি শুনি আর ভাবি। সত্যি কত সুন্দর সবকিছু।

সেদিন কেন জানি আরও অনেকক্ষণ লোকটার সঙ্গে গল্প করেছিল রঞ্জন। ও আর সেরকম কিছু করার কথা ভাবেনি।

৩

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রঞ্জন ভাবছিল সেদিনের কথা। তারপর কত বছর পেরিয়ে গেছে। সেদিন অঙ্ক পরীক্ষা প্রায় না দিতে পারলেও বাকি পরীক্ষাগুলো খুব ভালো হয়েছিল রঞ্জনের। প্রথম দশে অবশ্য ও থাকতে পারেনি। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে অসুবিধে হয়নি।

সত্যি এসব ছোটখাটো নুড়ি পাথর কতই এসে পড়ে জীবনের রাস্তায়। কিন্তু তাতে কী কিছু পালটে যায়! ও আবার মাথা তুলে চারদিকে তাকালো। এখনও শহরটার গায়ে কত রঙ। চারদিকে লোকজন ছোটাছুটি করছে। হয়তো এদের মধ্যে কারও ছেলে অসুস্থ, কারও হয়তো রোজগার নেই, কারও হয়তো আরও অন্য কিছু বিপদ। কিন্তু তারা জীবনের আশায় তবু ছুটে চলেছে।

লক্ষ্য করল রাস্তার উলটো দিক থেকে সেই ছেলেটা এখনও ওকে লক্ষ করছে।

তাকে লক্ষ করে হাত নাড়াল রঞ্জন। শুধু এটা বলতে উলটোদিকে যেতে হবে— লড়ে যাও, হেরো না।

ডিজাইন বায়াস

—একটা ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সায়াকা মুরাটা আজ এখানে আসতে পারেননি। আমরা এজন্য খুব দুঃখিত।

বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার দিক থেকে এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হলে যেন স্কুল ছুটির মতো শোরগোল শুরু হয়ে গেল।

—কেন? থাকতে পারবেন না কেন? ওঁর বই এর প্রেস রিলিজ, আর উনি থাকবেন না!— নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক বলে উঠল।

—একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য উনি আসতে পারেননি। এজন্য উনি খুব দুঃখিত। তবে পুরো কথা সম্পূর্ণ করার সুযোগ পেলেন না সেই প্রকাশনা সংস্থার মুখপাত্র।

'ডেইলি মেল' এর একজন সাংবাদিক এর মধ্যেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন— সেক্ষেত্রে এলখিকার অবর্তমানে বইপ্রকাশ করা উচিত হয়নি। আপনাদের পিছিয়ে দেওয়া উচিত ছিল এই অনুষ্ঠান।

—আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, আমাদের বলতে দিন।— বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার মুখপাত্র ফের বলে উঠলেন।

কিন্তু তার কথায় ফের বাধা এল। ওয়াশিংটন টাইমসের একজন প্রবীণ সাংবাদিক যিনি খুব ভদ্রলোক বলে পরিচিত, বলে উঠলেন

—দেখুন, গত এক বছর ধরেই আমরা সবাই লেখিকাকে সামনে পাব বলে অপেক্ষা করছি। তার জন্য দিন গুনছি। সেখানে উনি যে এবারেও থাকবেন না, এটা আপনাদের আগে জানানো উচিত ছিল। অথবা সঙ্গে সঙ্গে এই ইভেন্ট ক্যানসেল করে দেওয়া ঠিক ছিল। ওঁর সময় খুব মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু আমরাও এখানে সব বিখ্যাত পত্রপত্রিকা-কাগজের তরফ থেকে এসেছি। আমাদের সময়েরও দাম আছে। বিশেষ করে এটা আগে বলা হয়নি যে ওঁর বই প্রকাশের সময় উনি থাকবেন না। তাছাড়া আমাদের প্রশ্নগুলো, পাঠকদের প্রশ্নগুলো তো ওঁর কাছেই, লেখিকার অবর্তমানে কে তার উত্তর দেবেন?

এবারে সেই বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্টিফেনলেনক্স পরিস্থিতি সামলাতে নিজে উঠে দাঁড়ালেন।

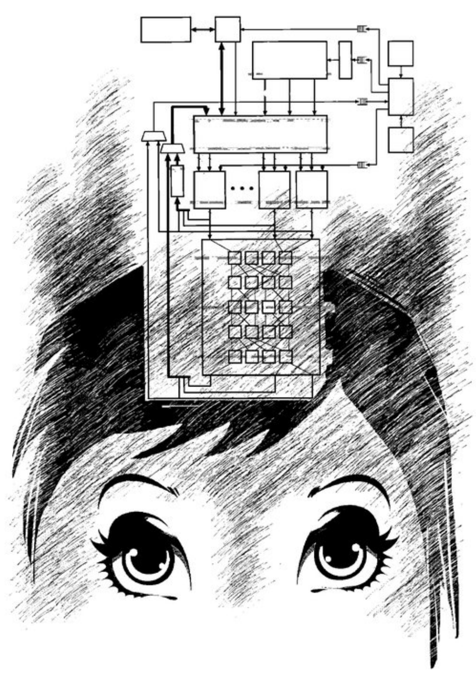
—আমরা ভুল কিছু বলিনি। উনি থাকবেন। তবে একদম শেষ মুহূর্তে কিছু অসুবিধে হওয়ায় উনি এখানে থাকতে পারছেন না। উনি ফোনে আছেন। দরকার মতো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এবারে শোরগোল চিৎকার একটু কমল। প্রেস রিলিজে উপস্থিত সাংবাদিকদের ও বিশ্বজোড়া ফ্যান ক্লাবগুলোর থেকে আসা বিশেষ কিছু পাঠকের হতাশ হওয়ার কারণ আছে।

স্টেজে সায়াকা নেই। সেই সায়াকা মুরাটা, যার প্রথম বই বেরোনোর দশ দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে দশ কোটি বই বিক্রি হয়েছিল। গত দেড় বছরে সে সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। প্রথম বইপ্রকাশের পরেই এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে বলা যায় বাইবেল ছাড়া আর কোনও বই এত বিক্রি হয়নি।

সায়াকা মুরাটার মুখের সঙ্গে পরিচিতি সারা বিশ্বের যে কোনও বইপ্রেমীর। সেই হাসিমাখা জুলজুলে ছোট চোখ। একটু চাপা নাক। কাঁধ অবধি চুল। দেখে মনে হয় বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। যদিও কখনও সামনে থেকে সায়াকা মুরাটা-কে দেখা যায়নি। বই-এর ছবির বাইরে উনি কখনও ক্যামেরার সামনে আসেনি।

শোনা গেছে উনি প্রেস বা পাঠকের সামনে আসতে চান না। নিভৃতে সাহিত্য সাধনা করতে পছন্দ করেন। এমনকী সায়াকা ভেবে অন্য কোনও মহিলার পিছনে ধাওয়া করেছে পাঠকের দল, এরকম কিছু ঘটনাও নানান জায়গায় হয়েছে।



এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এমনকী অনেক নামী সংবাদপত্রের সাংবাদিকও এখানে আসার আমন্ত্রণ পাননি। একটা বড় অংশের কৌতূহলের কেন্দ্রে সায়াকা। রহস্যময়ী সায়াকা। কোথায় সেই সায়াকা?

আবার প্রকাশনা সংস্থার প্রধান স্টিফেন বলে উঠলেন।— এবার বইপ্রকাশে ফিরে আসি। এটা সায়াকার লেখা দ্বিতীয় বই।

কিন্তু কথাটা শেষ হল না। চিৎকার চেঁচামেচি চলতেই থাকল। স্টিফেন বেশ জাঁদরেল প্রকৃতির লোক। কিন্তু তার পক্ষেও এখন আর হলের শৃঙ্খলারক্ষা আর সম্ভব নয়। পুলিশের সাহায্যে প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফের বলার সুযোগ পেলেন।

ফের বলে উঠলেন— এবারে সায়াকার লেখা দ্বিতীয় বই 'শেষ রাত'। যার কিছু কিছু অংশ আমরা ইতিমধ্যে বই এর প্রমোশনের জন্য রিলিজ করেছি বিভিন্ন মিডিয়াতে। এই বই-এর মূল উপজীব্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং। তার উপরে নির্ভর করে এই বিশ্বব্যাপী থ্রিলার। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্য স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এ ছড়িয়ে দেওয়া সালফেট কনার মাধ্যমে সূর্যের আলো বিক্ষিপ্ত করে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং, কেসলার সিনড্রোম, সন্ত্রাসবাদ ও এসবকে কেন্দ্র করে বিশ্বরাজনীতির একটা বড় ভূমিকা আছে উপন্যাসে। তবে সেসব ছাপিয়ে এই উপন্যাস কিছু পরিবেশ প্রেমীর আপ্রাণ চেষ্টার গল্প যাতে পৃথিবী আগামীদিনেও বাসযোগ্য থাকে। এই দ্বিতীয় উপন্যাসের কেন্দ্রেও প্রথম উপন্যাসের মূল দুই চরিত্র ম্যাক্স ও সারা আছে। তবে যাই বলি না কেন এক্সপেক্ট দ্য আনএক্সপেক্টেড ইন এভরি চ্যাপ্টার। প্রথম উপন্যাসের মতোই এই বই-এর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যেন এক অচেনা গুহা থেকে আরেক অচেনা গুহায় যাত্রা, যেখানে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু অপেক্ষা করে আছে। এবারে কিছু প্রশ্ন থাকলে আমরা তা নিতে পারি।

পিছনে বিশাল স্ক্রিনে এতক্ষণে উপন্যাসের কিছু কথা-লাইন— কথোপকথন ফুটে উঠছে, কিছু ঘটনার ছোট ছোট ভিডিও। সায়াকার ছবি।

—আচ্ছা কেসলার সিনড্রোম কী?

—একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে উঠলেন।

—এলায়ার আর্থ অরবিটে ইচ্ছে করে অ্যান্টি-স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বিস্ফোরণের সাহায্যে স্পেসডেব্রি তৈরি করতে পারলে বা বেশ কিছু ভাঙা টুকরো তৈরি করতে পারলে, তখন একটার পর একটা স্যাটেলাইট এদের সঙ্গে ধাক্কা খাবে। এভাবে পুরো স্যাটেলাইট ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া যেতে পারে। সেটাই কেসলার সিনড্রোম, যা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসের এক অংশে যার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের উপরে পুরো নজরদারিই বন্ধ হয়ে

যাবে। আমরা আজ প্রতি স্কোয়ারমাইলে যেভাবে নজরদারি চালাতে পারি, সে ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে কী কী সম্ভব, সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। যাই হোক এর বেশি কিছু বলব না। বাকিটা পড়ার জন্য। প্রতি পাতায় চমকের জন্য। একই সঙ্গে বিশ্বের দুশো তিরিশটা দেশে আগামীকাল এ বই পাওয়া যাবে। পঞ্চান্নটা ভাষায় অনূদিত এই বই পাওয়া যাবে যা আগে কখনও কোনও বই-এর ক্ষেত্রে হয়নি।

—আচ্ছা, আগের বারের মতো এবারেও কী জামাল আছে?— একজন সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলেন।

—হ্যাঁ, অবশ্যই। ও এবারেও আছে। ও তো এই উপন্যাসের একটা বড় আকর্ষণ।

—ঠিক এখানেই আমার আপত্তি।— সেই সাংবাদিক এবারে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—আপত্তি? কিসের আপত্তি?

—জামাল কৃষ্ণাঙ্গ। কেন জামালকে কৃষ্ণাঙ্গ করা হয়েছে জানতে চাই?

—এ কীরকম অদ্ভুত প্রশ্ন। লেখার প্রয়োজনে লেখিকা লিখেছেন।

—কিন্তু এখানেই খেয়াল করবেন, ম্যাক্স, সারা শ্বেতাঙ্গ। তাদের ভালো ভদ্র মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঠিক তেমনই আগের উপন্যাসে জামালের মতো কৃষ্ণাঙ্গদের সন্ত্রাসবাদী, খারাপ মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এবারে সাংবাদিকদের মতো ফের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন প্রকাশনা সংস্থার প্রধান স্টিফেন।

এবারে ওই সাংবাদিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলে উঠলেন— আমি ফ্যান্টাস্টিক সায়েন্সের সম্পাদক পল। খোঁজ নিয়ে দেখবেন গত এক বছরে বহু জামাল হেনস্থার শিকার হয়েছে শুধু এই লেখার জন্যে। আগের উপন্যাস জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আরও খারাপ ধারণা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জন্য। শুধু তাই নয় একটা নামী ফুড-রিটেলার জামাল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ডেলিভারি দিতেও অস্বীকার করে। এটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন। এবারের সন্ত্রাসবাদীরাও ঠিক নিশ্চয়ই আগেরবারের মতোই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী। ঠিক কিনা! সে ব্যাপারেও আপনি কী বলবেন!

স্টিফেন এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে আগে কোনওদিন পড়েননি। গলা খাঁকরে বলে উঠলেন — প্রত্যেক লেখকের স্বাধীনতা থাকে তার নিজের মতপ্রকাশের, তার লেখার প্রয়োজনমতো চরিত্র সৃষ্টি করার। একজন প্রকাশক হিসেবে আমি তাকে সে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য। তাছাড়া আমার ধারণা লেখিকা কোনও রকমভাবে ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে কোনও পক্ষপাত দেখাননি।

—সেটা রক্তমাংসের লেখিকা হলে আমি মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম নয়, তাই না? এক্ষেত্রে লেখিকা তো আপনাদের তৈরি প্রোগ্রাম, তাই না?

প্রশ্নটা করা মাত্র মনে হল কেউ যেন হলে একটা বোমা ফাটিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপরেই প্রশ্নের অর্থ বুঝে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে গেল পুরো হলে।

বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্ন করে উঠল— সায়াকাকে দেখতে চাই। ভিডিও কনফারেন্সে সামনে আসার কী অসুবিধে থাকতে পারে! কে তিনি! কেন তিনি সবার থেকে দূরে সরে থাকেন।

বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসতে লাগল। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল হলের মধ্যে।

চারদিকে তখন শুধুই একটা নাম শুধুই সায়াকা, কে সায়াকা! তিনি না থেকেও সব আলোচনার মধ্যমণি।

ফের বলে উঠলেন সাংবাদিক পল—আমি অনুসন্ধান চালিয়ে খবর পেয়েছি সায়াকা মুরাটা মানুষ নয়। একটা প্রোগ্রাম, একটা আরটিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স দ্বারা পরিচালিত প্রোগ্রাম। সেজন্য সায়াকা কোথায় কী পড়েছেন, কোথায় থেকেছেন— এসব কিছুই জানা যায় না। এমনি কী যে আইল্যান্ডে উনি থাকেন, সেখানেও যে উনি থাকেন না সে খবর আমরা তদন্ত করে পেয়েছি। সায়াকা শুধুই একটা প্রোগ্রাম। এমন এক প্রোগ্রাম যে মানুষের থেকেও ভালো লিখতে পারে। মানুষের মন বুঝতে পারে। সে জন্যই এরকম প্রোগ্রাম একটা 'ডিজাইন বায়াস' বা পক্ষপাত দুষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে। বই মূলত পড়ে সাদা চামড়ার মানুষ। তাদের হাতেই টাকা। তাই তাদের কথা ভেবে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের 'ভিলেন' করা হয়েছে উপন্যাসে। সেভাবে এই প্রোগ্রামকে বিশেষ ডেটার ভিত্তিতে ডিপ লার্নিং-এর সাহায্যে ট্রেন করা হয়েছে, যাতে সেভাবে এই প্রোগ্রাম মানুষকে দেখতে শুরু করে, যাতে ব্যবসার সুবিধে হয়।

একটু থেমে পল আবার অন্যদের জন্য জ্ঞান জাহির করলেন— ঠিক যেভাবে গাড়ির সিটবেল্ট ডিজাইন করার সময় সেখানে শুধু সাদা পুরুষ মানুষের কথা মাথায় রেখে গত একশো বছর ধরে ডিজাইন করা হয়েছে। মেয়েদের কথা ভেবে সিটবেল্ট ডিজাইন হয়নি, এমনকী ভালো চেহারার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কথা ভেবেও গাড়ির সিটবেল্ট ডিজাইন করা হয়নি। ফোন এশিয়ান মানুষদের হাতের মাপ অনুযায়ী তৈরি করা হয়নি বা মহিলাদের কথা ভেবে ডিজাইন করা হয়নি। এসবের পিছনেই থাকে ডিজাইন বায়াস। এখানেও ঠিক একইভাবে একটা 'ডিজাইন বায়াস' জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের প্রোগ্রামের মধ্যে যাতে তা পাঠকদের খুশি করতে পারে।

স্টিফেন এবার বাধ্য হয়ে বলে উঠলেন— আচ্ছা, আপনি প্রশ্ন করছেন। তারপরে কোনও কিছুই বলার সুযোগ না দিয়ে বলে যাচ্ছেন। আমাকে বলতে দিন অন্তত। হ্যাঁ, আমি এটা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে সায়াকা মুরাটা কোনও মানুষ নয়, কোনও মহিলা নয়। হয়তো আগামীদিনে এটা আমরা বলতাম। আমরা চাইছিলাম এই সারপ্রাইজটা, এই চমকটা কোনওদিন বই এর মার্কেটিং-এর জন্য ব্যবহার করতে। কিন্তু এখন সামনে এসে গেছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছি যে সায়াকা আমাদের বিজ্ঞানীদের তৈরি করা একটা অসামান্য প্রোগ্রাম যে নিজের থেকে অসাধারণ উপন্যাস-গল্প লিখতে পারে। তবে একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলছি এরকম কোনও ডিজাইন বায়াস আমাদের প্রোগ্রামে নেই। সবরকম রেলিভ্যান্ট ইনফরমেশন এর ভিত্তিতে ওই প্রোগ্রাম প্লট ভাবে, চরিত্র ভাবে, নিজস্ব ভাষায় উপন্যাস লেখে। গল্প কীভাবে আকর্ষণীয় করা যায় সে বিষয় ওই প্রোগ্রাম আমাদের মতোই ভাবে।

—কিন্তু এসব কাকতালীয়ভাবে কিছু ধারণার সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। প্রথম বইতেই দেখেছি, এমনভাবে লেখা যেন সাদা মানুষ অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। যেখানেই খারাপ লোক, সেখানে তারা হয় কালো বা মুসলিম। উপন্যাসে যতজন সায়েন্টিস্ট তাদের সবার রঙ সাদা, বা তারা ভারতীয় বা ইউরোপীয়ান। কিন্তু তারা কেউ আফ্রিকান নন। খেয়াল করুন একজনও নয়। মেয়েদের ভূমিকা উপন্যাসে খুব কম। ষোলোজন বিজ্ঞানী চরিত্রের মধ্যে মাত্র দুজন মহিলা। এসবই ডিজাইন বায়াস। এমনকী ফ্রেড্রিক যে কিনা এলজিবিটি কমিউনিটির লোক তাকেও নেগেটিভভাবে প্রোজেক্ট করা হয়েছে। সে তাই ড্রাগ বেচে। এসব ইনপুট বায়াস, একটা পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি একধরনের আউটপুট বায়াসের জায়গা তৈরি করেছে। সেজন্য এই প্রোগ্রাম ভাবতেই পারে না যে মহিলারা লিডারশিপ রোলে থাকতে পারে বা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা পড়াশোনায় ভালো হতে পারে বা বিজ্ঞানী হতে পারে। এবারে ভাবুন, এই দ্বিতীয় বই যদি আরও পঞ্চাশ কোটি পাঠক পড়ে, তাদের মধ্যেও কীভাবে এ বিষয়ে বিশ্বাস গড়ে উঠবে। তারা ভাববে সন্ত্রাসবাদীরা শুধু একটা বিশেষ ধর্ম থেকেই হয়, শুধু মধ্য এশিয়া থেকেই হয়, তারা ভাববে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া মানেই খারাপ লোক, যারা হিংসা আর দুর্নীতি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

পুরো হলে আবার এমন চিৎকার প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল যে তার মধ্যে স্টিফেনের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব হচ্ছিল না। একজন আবার জুতো খুলে ছুড়ে মারলেন স্টেজের দিকে। বেশ কিছু পুলিশ দেহরক্ষী নেমে পড়ল কাজে, শৃঙ্খলারক্ষার কাজে।

আবার বেশ খানিকক্ষণ লাগল পরিস্থিতি শান্ত হতে।

পুরো সময় স্টিফেন চুপ করে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলে সেই সাংবাদিক পলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন— দেখুন আমার মনে হয় আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠান যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য এসেছেন। হয়তো আপনি ফসিল ফুয়েল লবি বা ম্যানুফাকচারিং লবির লোক, তাই চান না গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিপদের কথা সাধারণে জানুক। এরকম আকর্ষণীয় লেখা তাদের মনে আরও সচেতনতা গড়ে তুলুক, যাতে কিছু সংস্থা নিয়ম ভেঙে পরিবেশের আরও ক্ষতি করতে পারে। সবার আগে আমি বলব নতুন বইটা পড়ুন, পড়ে তারপরে এসব কথা বলবেন।

—কিন্তু তার আগেই যেসে বই আরও পঞ্চাশ কোটি মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাবে, তাদের মধ্যে ভুল বিশ্বাস গড়ে তুলবে। আপনি চেয়েছেন আপনার বই-এর টার্গেট সেগমেন্ট অনুযায়ী পাঠকদের খুশি করতে। অন্যদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা তৈরি করতে। সেজন্য প্রথম বই এত সফল। আমি সরাসরি এ ব্যাপারে সেই লেখিকার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

—মানে? বললাম তো সে এক প্রোগ্রাম।

—সেই প্রোগ্রাম যদি একটা উপন্যাস লেখার মতো উন্নত হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার এই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আমি জানতে চাই তার কাছে যে তার মধ্যে কোনও পূর্বধারণা বা পক্ষপাত গড়ে উঠেছে কিনা!

প্রথমে 'না' বললেও শেষে স্টিফেন বাধ্য হলেন সে অনুরোধ রাখতে। অবশ্য তাকে অনুরোধ না বলে দাবি বলাই ভালো। একটা কম্পিউটারকে সামনে নিয়ে আসা হল। পল ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন যে তিনিই সায়াকাকে প্রশ্ন করবেন। স্টিফেন নয়। সেজন্য স্টেজে পলকে নিয়ে আসা হল।

তারপরে পলসেই কম্পিউটারকে প্রশ্ন করে উঠলেন— তোমার নাম?

—আমার নাম সায়াকা মুরাটা। সাহিত্যিক সায়াকা মুরাটা।

—তুমি কী সব মানুষকে সমান চোখে দেখো? তোমার মধ্যে কী কোনও ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা আছে বা কারও প্রতি কোনও পক্ষপাত আছে?

খানিকক্ষণ সব চুপ, পুরো হলে পিনড্রপ সাইলেন্স।

তারপরে আবার সেই যান্ত্রিক মহিলা কণ্ঠে উত্তর শোনা গেল— আমার কাছে সব মানুষ সমান নয়। কারণ তথ্য আমাকে যা শেখায়, আমি সেভাবে ভাবি, সেভাবে মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করি। যদি দেখি সন্ত্রাসবাদীদের ৯৯.১ শতাংশ কোনও এক বিশেষ ধর্মের থেকে হয়, তাহলে আমার উপন্যাসে সে ধরনের চরিত্র তৈরি করার সময় ৯৯.১ শতাংশ ক্ষেত্রে সে ধর্মের মানুষ থেকেই আমি বেছে নেব। এটাই স্বাভাবিক। আমি যদি দেখি বিশেষ কিছু দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ

অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ৯৮.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে, আমি গল্পের প্রয়োজনে সেইসব দেশেরই নাম রাখব। আমি কী বলব, কী বলব না, কী লিখব, কী লিখব না, তা আমি ইচ্ছে করে সাজাই না। কারণ আমার মধ্যে সত্যি কোনও পক্ষপাত নেই। এমন কোনও পক্ষপাত নেই যার জন্য তথ্যের বাইরে গিয়ে অন্য কোনও কথা বলব। আমার উপন্যাসে একশো মিটার দৌড়ে যে বিজয়ীর কথা আছে সে কিন্তু কিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, কারণ সেটাই হওয়ার সম্ভাবনা ৯৩.১ শতাংশ। আমি তথ্যের উপরে দাঁড়িয়ে যে সাহস দেখাতে পারি, হয়তো মানুষ তাদের লেখাতে সে সাহস দেখাতে পারে না কারণ তারা প্রমাণ করতে চায় যে তাদের কোনও বায়াস নেই। তারা তাই সেভাবে সেটা প্রকাশ করে না। আমার মধ্যে সেই বিভ্রান্তি বা হিপোক্রাসি নেই।

হলের মধ্যে ফের প্রচুর চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। একদল সাংবাদিক স্টেজের উপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। কয়েকজন কম্পিউটার ভাঙার জন্য উপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা ইতিমধ্যে ধাক্কা দিয়ে কিছু সাংবাদিককে ফেলে দিচ্ছিলেন বা বাইরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বাধ্য হয়ে স্টিফেন বই প্রকাশ অনুষ্ঠান স্থগিত করতে বাধ্য হলেন।

গেম ওভার

গেম ওভার! গেম ওভার!

হঠাৎ রাস্তা থেকে চিৎকারের আওয়াজে চমকে উঠল রূপম।

—কি টি ২০ ম্যাচ শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল, আর তুমি ডাকো নি?— বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে রূপম।

—ধুর! সারাদিন মাথায় শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট! আরে না, না। সেসব নয়। ও হল গবা পাগলা। ছেলে হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথা খারাপ। মাঝেমধ্যেই ওরকম চেঁচাতে চেঁচাতে যায়।

—কিন্তু গবা পাগলা ওরকম 'গেম ওভার' গেম ওভার' বলে কেন মা?

—কে জানে? তবে তুমি গবা পাগলা বলো না। গবাদাদু বলো। ওর ছেলে অমলদাদা, সে বহু বছর আগের কথা, হঠাৎ করে হারিয়ে যায়। আমার বয়স তখন চার-কি পাঁচ। আমার থেকে বছর তিনেক বড় ছিল। কত খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু পাওয়া গেল না। তবে থেকে নিরুদ্দেশ। আর ছেলে হারিয়ে ওর মাথাটাও খারাপ হয়ে গেল।

দুদিন হল রূপম ওর মামাবাড়ি বসিরপুর এসেছে।

বসিরপুর বসিরহাট থেকে এক ঘণ্টার রাস্তা। একটা ছোট গ্রাম। গ্রাম মানে সত্যি গ্রাম। এখনও এখানে শুধু শুক্রবারে হাট বসে। পাশ দিয়ে একটা ছোট তিরতিরে নদীও বয়ে গেছে। সেদিন গিয়েছিল রূপম। গিয়েই মনে হয়েছিল রবি ঠাকুরের 'হাট' কবিতাটা যেন এখানেই লেখা। 'হাট বসেছে পদ্মাপারে, বক্সী গঞ্জে পদ্মাপারে।'

একটাই মুদির দোকান আছে। গ্রামে স্কুল নেই বলে পাশের গ্রামে তিন মাইল হেঁটে স্কুল যেতে হয়। বটতলাতে বিকেল হলেই তাসের আসর বসে। সন্ধে হলেই সারা গ্রাম যেন চাঁদ আর তারার আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে।

কলকাতায় স্কুলের ছুটি হলেই রূপম এখানে চলে আসে। কলকাতায় বড় রাস্তার উপরে রূপমদের ফ্ল্যাট। বাড়ি থেকে বেরোলেই বাস-গাড়ি, অনেক লোকজন। ব্যস্ত রাস্তা। মা-বাবা ওখানে তাই একা বেরোতে দেয় না।

শুধু স্কুল আর বাড়ি। এর বাইরে আর কোথাও যাওয়ার উপায় থাকে না। এখানে এলে মজা হয় রূপমের। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। এ যেন একটা অন্য জগৎ।

সারা দিন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কিছু দিনের জন্য কোনও বাধানিষেধ থাকে না। এখানে চারদিকে এখনও বেশ জলা-জঙ্গল। অমলের শখ বিভিন্ন গাছের পাতা সংগ্রহ করা। এটা একটা নেশার মতো।/ মার বারণ তাই কে শোনে! সারাদিন একা একা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। অচেনা গাছ খুঁজে বেড়ায়।

সেদিন রাতে মা আবার বলে উঠল— যেখানে সেখানে যাসনি! বসিরপুরে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। সকালে শুনলি তো অমলের কী হয়েছিল!

রূপমের দাদু হেসে বলে উঠল— মনি, ওসব ভয় দেখাসনি তো! কবে কী হয়েছিল! আমার তো ধারণা গবার সে ছেলে পুকুর টুকুরে পড়ে গিয়েছিল।

—কিন্তু সব জায়গা খোঁজাখুঁজি তো হয়েছিল। কোথাও তো কিছু পাওয়া যায়নি।

—কে জানে হয়তো এখনও কোথাও বেঁচে আছে— বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল রূপমের দাদু।

বলা বাহুল্য মায়ের কথা শোনে নিরূপম। সকাল সকাল আবার বেরিয়ে পড়েছে। তাছাড়া এখানে বাড়িতে বসে করবে টাই বা কি! ফোনের নেটওয়ার্কও নেই।

সেদিন দুপুরেই লোকটাকে প্রথম রূপম দেখল। জঙ্গলের ভিতরে। হারু কাকুর মতো বয়সে হবে। মানে ওই পঞ্চাশ কি ষাট। টাক মাথা। সাদা দাড়ি। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। হাড় জিরজিরে চেহারা। দেখে ঠিক গ্রাম্য লোক মনে হয় না। গায়ে একটা খানিক ছেঁড়া আধময়লা সাদা জামা। এই কি গবা দাদু? কে জানে!

একটা বিশাল বট গাছের থেকে কিছুটা দূরে মাটিতে শুকনো পাতার উপরে বসে আছে। পাশেই একটা আধভাঙা চওড়া ইটের দেওয়াল। উচ্চতায় ফুটআটেক হবে। মনে হয় খুব পুরনো কোনও বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

রূপম লোকটার নাম জিজ্ঞেস করতে বলে উঠল— নাম নেই। হয়তো ছিল। কাজে লাগে না। ভুলে গেছি।

আশ্চর্য উত্তর।

লোকটা এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে কী করছে?

—আচ্ছা, এখানে কি কোনও পুরনো বাড়ি ছিল আগে? — ইটের দেওয়াল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রূপম। তারপরে উত্তর না পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওই দিকে।

লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রূপমের হাত টেনে ধরে বলে উঠল— খবরদার, দেওয়ালের এই ফোকরটার কাছাকাছি আর যেও না খোকা!

—কেন? কী আছে ওখানে?

—সব বুঝিয়ে বলা যাবে না। কিন্তু ফোকর দিয়ে ওদিকে গেলেই গেমের বাইরে চলে যাবে। ব্যাস, তারপরেই সব শেষ। সে জন্যই তো এখানে বসে বসে পাহারা দিচ্ছি।

—কিসের গেম? কী শেষ? কী পাহারা দিচ্ছ?— কিছুই না বুঝে একগাদা প্রশ্ন করে বসল রূপম।

লোকটা উত্তর দিল না। দেওয়ালটার ফোকরটার নীচে গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

রূপম কিছু সময় দেওয়ালটার চারদিক দিয়ে কয়েকবার ঘুরে ফিরে এল। দেওয়ালটার অন্য দিকে বেশ ঘন জঙ্গল। ঝোপে আগাছায় এমন ভাবে ঘিরে রেখেছে যে অন্যদিক দিয়ে দেওয়ালটার কাছে যাওয়ার জো নেই। মনে হয় এখানে খুব পুরনো কোনও বাড়ি ছিল। এখন শুধু ভাঙা দেওয়ালটাই পড়ে আছে।

খানিকবাদে রূপম ফিরে এসে দেখল লোকটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়বার কাছে যাওয়ার সাহস হল না। আবার যদি তেড়ে আসে। কিই বা থাকতে পারে ওদিকে? গুপ্তধন?

ও শুনেছে পুরনো অনেক বাড়িতে গুপ্তধন থাকে। হয়তো অন্য দিকে এক ঘড়া মোহর আছে। লোকটা হয়তো তাই আগলাচ্ছে।

রূপম বাড়ি ফিরে ওই জায়গাটার কথা বলেছিল। কেউ বুঝতে পারেনি।

মা বকেছিল— ওসব জায়গায় অনেক সাপখোপ থাকে। যেখানে সেখানে একদম যাবি না।

রূপম লোকটার কথা আর বলেনি। কোথাকার কে পাগল! মা আরও বেশি চিন্তা করবে।

পরের দিন সকালবেলা রূপম ওখানে আবার খুঁজে খুঁজে গেল। খুঁজে পাওয়াটা অতটা সোজা ছিল না অবশ্য। কিন্তু যাতে খুঁজে বার করতে পারে, তার জন্য গতকালই কিছু চিহ্ন রেখে এসেছিল। ওর কাছে একটা ছোট ছুরি ছিল। সেটা দিয়ে গাছের গায়ে পথ চেনার জন্য দাগ কেটে রেখে এসেছিল ও। কিন্তু কাছে যেতেই আজও রূপম হতাশ হল। সেই লোকটা এখনও বসে আছে। একইভাবে যেন পাহারা দিচ্ছে।

খানিক বাদে ফের ফিরে আসতে হবে। কিছু দূরে একটা বড় আমগাছ আছে। খানিকটা খোলা জায়গা। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রূপম।

বেশ কয়েকটা সাদা পায়রা সামনের খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু খাবার দিয়েছিল। এখন অবশ্য কেউ নেই সেখানে। রূপম আস্তে আস্তে একটা পায়রার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ধরার আগে ওরা সব উড়ে গেল। রূপম চুপ করে একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে রইল। খানিকবাদে আবার কয়েকটা পায়রা ফিরে এল। ওরা অন্য দিকে মুখ করে খাচ্ছে।

নিঃশব্দে আবার একটাকে ধরতে এগিয়ে গেল রূপম। কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই আবার সব ক'টা উড়ে গেল। এমনিতে ধরে খানিকবাদে আদর করে ছেড়েই দিত রূপম। কিন্তু ওরা টের পায় কী করে!

আবার গাছের পিছনে এসে লুকোয় রূপম। হঠাৎ এমন সময়ে পিঠে হাত। চমকে উঠল রূপম। পিছনে সেই লোকটা। মুচকি মুচকি হাসছে।

বলে উঠল— ভাবছ ওরা কী করে টের পেয়ে যাচ্ছে। তাই তো? আসলে ওই যে মাটিতে যে ক'টা পায়রা দেখছ, তার বাইরে আরেকটা পায়রা আছে। ওই দূরের জামগাছটার দিকে তাকাও।

—কই, কিছু তো নেই।— বলতে বলতে রূপম টের পেল।— সত্যি আছে আরেকটা পায়রা। পাতার আড়ালে।

—ওই পায়রাটা আসলে লক্ষ্য রাখছে, যাতে এদের কোনও বিপদ না হয়। তুমি যখন কাছে যাচ্ছ, ও ওদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে। পাখিরা এভাবেই পাহারা দেয়। যে পাখিটা গাছের সবথেকে উপরে থাকে, তার দায়িত্ব থাকে অন্যদের পাহারা দেওয়ার। সে অন্যদের উপরে নজর রাখে। কোনও বিপদ বুঝলেই সে অন্যদের জানিয়ে দেয়। তাই তো আমরা ধরতে পারি না।

—কিন্তু কোনও আওয়াজ করছে না তো?

—সেটাইতো মজা। আমরা ওর সংকেত বুঝতে পারছি না। কিন্তু মাটিতে যে কটা পায়রা আছে, তারা ঠিক ওর সংকেত বুঝে যাচ্ছে। তাই ওরা উড়ে যাচ্ছে। তুমি যেদিক দিয়েই যাও না কেন। ও হল ওদের পাহারাদার। আমিও যেমন তোমাদের জন্য।

—কিন্তু তুমি কি পাহারা দাও? ওখানে তো শুধু জঙ্গল।

লোকটা ফের হাসল। —বিপদ আছে বলেই তো আমি পাহারা দিচ্ছি।

—কিসের বিপদ?

—সে বলা যাবে না। কিন্তু একবার ওদিকে গেলে আর ফেরা যায় না।

—কেন?

লোকটা হেসে বলে উঠল— আমরা সবাই একটা গেমের মধ্যে আছি। কিন্তু বুঝতে পারি না। কিন্তু গেমের কিছু রুল আছে। রুল ভাঙলে আর ফেরত আসা যায় না। ওটা ধরে নাও সেরকমই একটা রুল ভাঙা।

—কিসের গেম?

রূপমের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটা দ্রুত পায়ে আবার ওই দেওয়ালের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ গুছিয়ে কথা বলে লোকটা। কিন্তু বদ্ধ পাগল।

এর পর থেকে রূপম রোজ গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ওই জায়গাটা দূর থেকে দেখত। কিন্তু লোকটা সারাদিন যেন দেওয়ালটার ওই ফোকরটাকে আগলে বসে আছে। এমনকী কখনও সুযোগ আসবে না, যখন ওই লোকটা থাকবে না!

সে সুযোগ অবশেষে এল। সেদিন ছিল কলকাতায় ফেরার আগের দিন। কিছুক্ষণ আগে অবধি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেদিন রূপম তাই বিকেলের দিকে ওই জায়গাটায় গিয়েছিল। বৃষ্টিতে মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছে। বেশ কিছু জায়গা জল কাদা হয়ে গিয়েছে। ভিজে পাতায় সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। কিছু জায়গা বেশ পিছল।

ওখানে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না রূপমের। লোকটা নেই। হয়তো ভেবেছে এই বৃষ্টি বাদলার দিনে এখানে আর কে আসবে!

রূপম কাছে এগিয়ে এল। দেরি না করে ফোকরটার মধ্যে দিয়ে মাথা বাড়িয়ে তাকিয়ে অবাক হল। অন্য দিকে যেন ভারী অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাতে ভর দিয়ে পাটা কোনওরকমে তুলে অন্যদিকে লাফ দিল রূপম। উলটো দিকের মাটি খুঁজে পেল পা। কিন্তু পরক্ষণেই রূপমের মনে হল, ও কোথায়!

এ দিকে হঠাৎ এত অন্ধকার কেন? আকাশ যেন ঘন মেঘে ঢেকে আছে। অনেকক্ষণ তাকানোর পরে আকাশের তারাগুলো ধরা দিল। একটু একটু করে। সেরকম জঙ্গলও নেই। এ কোথায় এল ও?

মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে দেখে চমকে উঠল। কোথাও তো কোনও দেওয়াল নেই। কোনও বড় গাছ নেই। শুধু ঘাসজমি। যতদূর দেখা যায়, ততদূর। সে ঘাসজমি দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশে গেছে। দূরে অন্ধকারে একটা পাথরের উপরে একটা ছেলে বসে আছে। রূপমের থেকে একটু ছোট হবে। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে এল রূপম।

—কী নাম তোমার?

—আমি অমল।

অবাক হয়ে গেল রূপম। এই কি সেই অমল?

বলে উঠল— তোমাকে তো সবাই খুঁজে বেড়ায়।

—তাই বুঝি? হ্যাঁ, আমাকে তো খুঁজবেই। তা তোমার নাম?

—আমার নাম রূপম। আচ্ছা, এ কোনও জায়গা। এ কোথায়? বসিরপুরের সঙ্গে তো এর কোনও মিল নেই। ইনফ্যাক্ট, বইতে পড়া কোনও জায়গার সঙ্গেই মিল নেই। আমরা এখানে

কী করে চলে এলাম?

—তুমিও কি ওই দেওয়ালের ফোকরটা দিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওই দেওয়ালটা কোথায় গেল বলো তো?

—সে তো আমিও গত কয়েকদিন হল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—গত কয়েকদিন? তুমি তো চল্লিশ বছর হল নিরুদ্দেশ!

—চল্লিশ বছর মানে?

ওরা কথা বলতে থাকে।

লোকটা ঠিকই বলেছিল। এদিকে এলে আর ফেরা যায় না।

এখানে সময় থেমে থাকে। আকাশ শুধু বদলে যায়।

এখানে কখনও দিন হয় না। এখানে একটা রাত কাটে, আরেকটা রাত শুরু হয়। রাতের তারারা শুধু বদলে বদলে যায়। এখানে কোন তারা লাল, তো কোনওটা নীল, কোনওটা সবুজ। মনে হয় মাথার উপরে যেন রঙের খেলা চলছে।

এখান থেকে ফেরার পথ নেই। এটাই জীবন। গেমের বাইরের আসল জীবন।

পরেরদিন বসিরপুরের রাস্তায় গবাপাগলা হেঁটে যায়। অনেক জায়গায় এলাকের জটলা। রায়বাড়ির নাতিকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় থাকত। এখানে কয়েকদিনের জন্য এসেছিল।

গবাপাগলা কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে— গেম ওভার/ গেম ওভার।

সেই ছেলেটা যে কোনওদিনই ছিল না

১

আমার ঠিক সামনেই সেই ছেলেটা যে নাকি কোনওদিনই ছিল না।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সামনের স্মৃতিফলকের দিকে। এও কী সম্ভব?

ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি শহরের ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক। রোদ ঝলমলে দিন। তাই এই পার্কে খানিকক্ষণের জন্যে বেড়াতে এসেছি। বাড়ির কাছেই। সেজন্যই হয়তো এখানে আগে আসা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা মারা গেছে, তাদের স্মৃতিতে শহরের মাঝেই এই সুবিশাল পার্ক। এছাড়া পার্কের মধ্যে খুব বড় একটা মেমোরিয়াল স্তম্ভ আছে।

বিশ্বযুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা গাছ। সেই সৈনিকের নাম লেখা আছে গাছের নীচের স্মৃতিফলকে। বেশিরভাগই খুব কম বয়সে মারা গেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে অকালে ঝরে যাওয়া অনেক অসম্পূর্ণ জীবনের কথা।

এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ঘাসের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র হলুদ ড্যাফোডিল ফুল। সবুজের মধ্যে হলুদের ভারী সুন্দর সমাহার। এ দেশে শীতের ঘুম ভাঙার প্রথম লক্ষণ। পাহারাদারের মতো ঘিরে আছে একটা ছোট স্মৃতিফলককে। বলা যায় ড্যাফোডিল ফুলে যেন খানিকটা ঢাকাই পরে গেছে স্মৃতিফলকটা। একটা আড়াই ফুট উঁচু, দেড় ফুট চওড়া পাথরের উপরে এলখা মৃত সৈনিকের নাম।

স্মৃতিফলকের পিছনে একটা পত্রহীন রিক্ত বিশাল বার্চ গাছ। যেন ছুটে চলা সময়ের হাত থেকে ফলকটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল গাছটার নিরাভরণ শাখাপ্রশাখার উপর নীল আকাশ নেমে এসেছে।

আমার মনে হচ্ছিল যেন দমবন্ধ হয়ে গেছে। এ কি দেখছি! মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে কেউ যেন আমাকে টাইম মেশিনে করে চল্লিশ বছর পিছনে নিয়ে গেছে। আমার সামনেই ঠিক সেই ছবি যা ছোটবেলা থেকে বহুবার দেখেছি। সেই ফ্রেমে বাঁধানো হাতে আঁকা ছবি। কতবার দেখেছি সে সংখ্যা আমার জানা নেই।

একটু আগে থেকে শুরু করি। একটু আগে মানে চল্লিশ বছর আগে থেকে।

২

সাল ১৯৮০। তখন মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। লোডশেডিং ছিল, রেডিও -তে দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল, টিভিতে একমাত্র চ্যানেল ছিল কলকাতা দূরদর্শন। সেই সময়ের কথা।

রায়ান আমাদের স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হল।

ভর্তির কয়েক মাস পরেও স্কুলে রায়ানের একমাত্র বন্ধু ছিলাম আমি। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও ছিল। একে তো ওকে দেখতে একটু সাহেবসুবোদের মতো ছিল, তাছাড়া এত আস্তে আস্তে কথা বলত যে ওর প্রায় কোনও কথাই শোনা যেত না।

হাসি ঠাট্টাতে সহজে যোগ দিত না। মনে হত যেন কিসের একটা ঘোরে হারিয়ে আছে। এমনকী ভবেশবাবুর মতো রাগী টিচার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলে যখন আমরা সবাই মিলে পরের ক্লাসের আগে দু-তিন মিনিট লাফালাফি করতাম, তখনও দেখতামও চুপ করে বসে বসে কী ভাবছে। দেখে মনে হত কোনও কথা বলতেই যেন ওর কষ্ট হয়। মনে হত অন্য কোনও গ্রহের জীব। ভুল করে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

যদিও ওর আসল নাম ছিল রায়ান, আমরা সবাই ওকে 'রায়' বলেই বলতাম। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। শুনেছিলাম ওর বাবা ইংরেজ, মা ভারতীয়। দেখেই সেটা বোঝা যেত। চোখের মনির রঙ ছিল অপরাজিত ফুলের মতো নীল। গায়ের রঙ খুব ফরসা না হলেও আমাদের থেকে অনেক পরিষ্কার।



সকালে আমার পাশে এসে বসে শুধু আমাকে বলত— গুড মর্নিং। কেমন আছিস?

আমি হয়তো বললাম— ভালো। তুই? কাল ভারত ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টেস্টম্যাচটা দেখলি? কী ভালো হল, তাই না? আরেকটু হলে গাভাস্কার ঠিক জিতিয়ে দিত। একটুর জন্য হেরে গেলাম।

ও এসব কথায় যোগ না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ত।

এরপর আর কথা বলা যায়?

আমাদের স্কুল শেষ হত চারটের সময়। মধ্য কলকাতার নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুল। বহু পুরনো স্কুল। আমরা সবাই স্কুলের পরে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতাম। দেখতাম ও বাড়ি যেত না। মাঠের পাশে এসে চুপ করে বসে খেলা দেখত। কিন্তু চোখে মুখে কি যেন বিষণ্ণতা। ডাকলেও খেলতে আসত না। মনে হত যেন ও এক অন্য জগতে হারিয়ে গেছে। মাঠের পাশে বসে থাকলেও ওর সঙ্গে আমাদের সত্যিকারের দূরত্ব যেন তার থেকে অনেক বেশি।

ক্লাসে সব সময় আমার পাশে বসত। তাই দেখতে পেতাম ইতিহাসের ক্লাসে খাতা বার করে কীসব হিজিবিজি কাটছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পড়ানো হচ্ছে, ও কিছু না শুনে পাতায় কী সব হিজিবিজি লিখে যাচ্ছে। এসব করলে যা হয় আর কি! মাঝেমধ্যেই ক্লাসে পড়া না পারার জন্য বেঞ্চির উপরে বা ক্লাসের বাইরে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। ওর তাতে কোনওরকম লজ্জা হত বলে মনে হত না।

শুধু ইংরেজিটা খুব ভালো জানত। ওটাতে সবার থেকে বেশি নাম্বার পেত। বাংলা আর ইংরাজি মিশিয়ে সব সময় কথা বলত। মনে হত বাড়িতে ইংরাজিতেই বেশি কথা বলে। এছাড়া ও ছবি খুব ভালো আঁকত। টিফিন পিরিয়ডে চুপচাপ বসে ছবি এঁকে যেত। ওর খাতা ভরা থাকত ছবিতে। অবাক হয়ে দেখতাম। শুধু ভালো আঁকার জন্য নয়। সে সব ছবি যেন কোনও অচেনা দেশের, কোনও অচেনা সময়ের। পাহাড়ের ছবি। সবুজে ঢাকা উপত্যকার ছবি। রাস্তার পাশ দিয়ে কাঠের বাড়ি, পাইন গাছের ছবি। বুঝতে পারতাম ও কোনও বিদেশি বই থেকে দেখে আঁকে।

আমি মামাবাড়িতে মানুষ। মা খুব কম বয়সে মারা যায়। বাবা আবার বিয়ে করে। তারপর থেকে আমি মামাবাড়িতেই বড় হই। স্কুলে পড়ার সময় মাকে আর বাবাকে খুব মিস করতাম। অনেক সময় আমিও আমার স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে যেতাম। মনের মধ্যে পাওয়া না পাওয়া জগতের জিগস পাজল জুড়ে জুড়ে স্বপ্ন তৈরি করতাম।

মাঝেমধ্যে মনে হত রায়ানের সঙ্গে কোথায় যেন আমার মিল আছে। সেজন্যই হয়তো আমরা দুজনে দুজনকে বুঝতে পারতাম। কিছুদিনের মধ্যে আমরা খুব বন্ধু হয়ে গেলাম।

স্কুলের লাইব্রেরিতে খুব কম ছেলেই নিয়মিত যেত। আমি আর রায়ান নিয়মিত যেতাম। ভালো বই কিছু পড়লে ওকে বলতাম, ও আবার কিছু ভালো বই পড়লে আমাকে সাজেস্ট করত।

কিন্তু ক্লাসে সেই একই রকম অন্যমনস্ক থাকত।

আমি একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— রায়, তুই মন দিয়ে কিছু শুনিস না কেন? শুধু শুধু এত শাস্তি পাস।

—আই কান্ট ফলো দেম। এ লট অফ ব্যাক গ্রাউন্ড নয়েস। যেন সবাই সবসময় ফিসফিস করছে। টিচার কী বলছে কিছুই বুঝতে পারি না। আমি শুধু তোর কথা বুঝতে পারি।

—সে কী? তুই ডাক্তার দেখাসনি? হয়তো কানে কোনও কিছু হয়েছে। আমার দিদারও এরকম হয়।

ও আর কিছু বলেনি।

ও আমার সঙ্গেও খুব বেশি কথা বলত না। কিন্তু তাও যেটুকু বলত, তা শুধু আমার সঙ্গেই। লক্ষ্য করতাম ও আমাকে ছাড়া আর সবাইকে এড়িয়ে চলে। বলতে নেই আমার বেশ ভালোই লাগত সেটা।

কিছুদিন বাদে ওকে একদিন আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। আমার বাড়ি মানে মামাবাড়ি। বড়মামার কাছ থেকে দাবা খেলতে শিখেছিলাম। ওকে শিখিয়ে দিলাম। আমার থেকে শিখে নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে ও বেশ ভালো খেলতে শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে এমন হল যে প্রায় নিয়মিতই ওর কাছে হারতাম। আসলে ওর বুদ্ধি বেশ ভালোই ছিল।

মাঝেমধ্যেই স্কুল ফেরত আমি ওকে বাড়ি নিয়ে আসতাম। দিদিমার ঘরে মেঝের উপরে বসে দাবা খেলতাম। দিদিমা ওকে খুব ভালোবাসতেন। এলেই কুলের আচার, নারকোলের নাড়ু, এসব দিতেন। ও এসব খেতে খুব ভালোবাসত। এমনভাবে খেত যেন ওকে কেউ কোনওদিন এসব খাবার খেতে দেয়নি।

দেখতে দেখতে এভাবে আমরা ক্লাস সেভেনে চলে এলাম। আমি খুব ভালো রেজাল্ট করলেও ও কোনওরকমে পাশ করেছিল।

একদিন হঠাৎ সুদীপ্ত আমাকে একটা কথা বলল। রায়ানকে নিয়ে। তখন রায়ান কাছাকাছি ছিল না।

ও বলে উঠল— আচ্ছা, তুই তো রায়ের খুব বন্ধু। তোর রায়কে খুব অদ্ভুত মনে হয় না।

আমি একটু অবাক হলাম। হঠাৎ করে এরকম প্রশ্ন।

ও ফের বলে উঠল— ওর বাড়ি গিয়েছিস কখনও?

—না, কেন তুই গিয়েছিস?

—না, আমি ভেবেছিলাম তোকে অন্তত কোনওদিন নিয়ে গেছে। এত বন্ধুত্ব তোদের।

—না, কিন্তু কেন বল তো?

—আমাদের সবার বাড়ি থেকে কেউ না কেউ অনেকদিন স্কুলে আসে। খোঁজখবর করে। টিচারদের সঙ্গে দেখা করে। স্পোর্টসের দিন আসে। ওর কাউকে কোনওদিন আসতে দেখেছিস?

—না। কিন্তু তাতে ও কী করবে? অবাক হওয়ার কি আছে?

সুদীপ্ত একটু বেশি সন্দেহবাতিক। ফের বলে উঠল। এবার একটু কাছে এসে।

—আমি সেদিন ওকে পার্কস্ট্রিটের কবরখানায় দেখেছি। আমি পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা ঠিক কবরখানার পাশেই একটা ফ্ল্যাটে থাকে। তখন রাত ন'টা হবে। ওটা বন্ধ হয়ে যায় ছ'টা নাগাদ কিন্তু কি দেখলাম জানিস?— বলে ও চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে রহস্যজনকভাবে তাকাল।

—কী?

—রায় ওর মধ্যে ঘুরছিল। তারপরে একটা ভাঙা মার্বেলের সমাধির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে আবার আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল।

—তুই অন্ধকারে ঠিক দেখেছিলি?

—হ্যাঁ, একদম। দূর থেকে হলেও স্পষ্ট দেখেছি। ওখানে আলো ছিল। আমার চিনতে ভুল হয়নি। তোর তো খুব বন্ধু। ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখিস গিয়েছিল কিনা!

—কিন্তু সে তো যেতেই পারে! হয়তো ওর কোনও আত্মীয়ের সমাধি আছে।

—তা বলে অত রাতে? ওরকম জায়গায় তুই পারবি একা যেতে? ঢুকলই বা কোথা থেকে কে জানে?

—নির্ঘাৎ ঢোকার অন্য কোনও পথ আছে।

সুদীপ্ত মাথা নেড়ে বলেছিল— তাই হবে হয়তো।

আমি পরে রায়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর না দিয়ে কীরকম যেন উদাসী চোখে তাকিয়েছিল। যেন ওই জায়গাটাই ও চেনে না।

তবে আমার ওর উপরে খানিকটা অভিমান হয়েছিল। আমার বাড়িতে ও অনেক দিন এসেছে। কিন্তু আমাকে কোনওদিন ও ওর বাড়িতে যেতে বলেনি। হতে পারে ওরা অনেক বড়লোক। কিন্তু কোনওদিন কি আমাকে ওর বাড়িতে ডাকতে পারত না! ও কোনওদিন বাসে যায় না। স্কুল থেকে হেঁটে যায়। নিশ্চয়ই বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। আমার মামাবাড়ি সেখানে অনেকটা দূর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও কত দিন এসেছে। আমি বলি বলেই না এসেছে!

ও না বললেও কয়েক মাস বাদে সে সুযোগ এসে গেল একদিন।

আমার ছোট পিসির ফ্ল্যাট ছিল ময়দানের কাছে। রাসেল স্ট্রিটে। অনেকদিন যাইনি।। পিসেমশাই ব্যাংকের খুব বড় অফিসার। সেদিন ছিল রোববার। পিসির বাড়িতে সারাদিন দারুণ খাওয়াদাওয়া হল। দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। সন্ধের দিকে বেরোলাম বাড়ি ফিরব বলে। তখনও কলকাতায় মেট্রো চালু হয়নি। খানিকটা হেঁটে গিয়ে বাসস্টপ।

ভেবেছিলাম নিজে নিজে পথ চিনে বাসস্টপ খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু ভুল করলাম। বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অলিগলি দিয়ে যেতে গিয়ে খানিক বাদেই পথ হারালাম। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পথে একটা পার্ক পড়ল। শহরের এই দিকটার সঙ্গে আমার একদম পরিচয় না থাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি, কী করব ভাবছি, হঠাৎ মনে হল কিছু দূরে একটা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে।

খুব পরিচিত হাঁটা। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম এটা রায়ান। চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম। প্রথমে সাড়া দিল না। তারপর দ্বিতীয়বার ডাকার পর ঘুরে তাকাল। আমাকে দেখে চমকে উঠল। তারপর আনন্দে ছুটে এগিয়ে এল।

—তুই এখানে?

—আমার পিসির বাড়ি এখানে। কিন্তু তুই এখানে কী করছিস?

ওর হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। সেটা ডান হাত তুলে দেখিয়ে বলে উঠল— কিছু জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম। আমি তো এখানেই থাকি। একদম কাছে। হান্ড্রেড ইয়ারডস ফ্রম হিয়ার।

—দারুণ। চল, তোর বাড়ি দেখে আসি। ওখানে গিয়ে গল্প করে তারপরে খনিকবাদে বেরবো।

—এত রাতে? তোর ফিরতে আসুবিধে হবে না?

—না, ঠিক কিছু একটা পাওয়া যাবে।

ও যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপরে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বলে উঠল— তবে চল। বাট ইট মাইট গেট টু লেট ফর ইউ।

ওর সঙ্গে সঙ্গে এগোলাম। এটা মধ্যকলকাতার বেশ উচ্চবিত্তদের এলাকা। উত্তর কলকাতার মতো গায়ে গায়ে বাড়ি নেই। বেশিরভাগই ফ্ল্যাট এ এলাকায়। মাঝে মধ্যে বিশাল জায়গা জুড়ে দেওয়াল ঘেরা সামান্য কিছু বাড়ি।

সেরকমই একটা বাড়ির সামনে এসে আমরা এসে দাঁড়ালাম। বেশ বড় বাড়ি। বাইরের বড় গেট ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকতেই অবাক হলাম।

মধ্য কলকাতায় প্রায় শহরে কেন্দ্রে এরকম বাড়িও হয় ওই একটা সময় বেশ বড় বাড়ি ছিল। এখন সামনে খানিকটা খোলা চাতাল। অযত্নে বেড়ে ওঠা অজস্র আগাছায় ভরা একটা বাগান। বাগানের এক কোণে একটা নিম গাছ। তারপরে একটা দোতলা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

মনে হচ্ছে বাড়ির শুধু ইটের শিরদাঁড়াটুকুই টিঁকে রয়েছে। দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অশ্বত্থ গাছের শিরা উপশিরা গজিয়েছে। চারধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে বারান্দা পরে তার বাঁদিকের

অংশ ভেঙে গেছে। ভাঙা ইটের দাঁত বেরিয়ে আছে সর্বত্র।

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু বাড়ির ভিতরে কোনও আলো জ্বলছিল না। মনে হচ্ছিল এ পোড়ো বাড়িতে সাপ না থাকলেই অবাক হব।

ও আমাকে সামনের একটা ঘরে এনে বসাল। বেশ বড় ঘর। এ ঘরে সামান্য কিছু ভাঙা আসবাব ছড়িয়ে আছে। একদিকে একসময় বড় ফায়ার প্লেস ছিল। এখন সেখানে কিছু ইট পরপর সাজিয়ে রাখা রয়েছে। ঘরের দেওয়াল জুড়ে দামি কাঠের কাজ। কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় তা ভেঙে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। মাটির উপরে এককোণে কালো টিনের তোরঙ্গ পরে আছে। ঘরে বেশকয়েকটা বড় বড় খড়খড়ির জানলা। কিন্তু সে সব জানলার বেশিরভাগ কাঠই ভাঙা। ঘরের মাঝবরাবর বাহারি রঙিন কাচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। সেটা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়। কিন্তু তারও একটা বড় অংশ ভেঙে গেছে।

আমি নিশ্চিত এখানে চোরে ঢুকতেও ভয় পাবে।

—তুই এখানে থাকিস?

—হ্যাঁ।

বুঝতে পারলাম। এজন্যই ও হয়তো আমাকে এখানে আসতে বলেনি। হয়তো বড় কোনও অসুবিধে হয়েছে ওদের। আগে হয়তো খুব ভালো অবস্থা ছিল। আমার মামাবাড়িরও রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা ভালো না। কিন্তু সেটাও এ তুলনায় অনেক ভালো।

—তোর বাবা— মা কোথায়?

—ওরা ভিতরে অন্য ঘরে আছে।

একটু অবাক হলাম। কারণ ভিতরে কোনও আলো জ্বললে এখান থেকে তার আভাস পাওয়ার কথা। ভিতরের দিকে তাকালে শুধুই কালিঢালা অন্ধকার।

আমাকে একটা পা নড়বড়ে বিশাল কাঠের কাজ করা চেয়ারে বসতে বলে ও আরেকটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে সামনে এসে বসল। আমরা নানান বিষয়ে গল্প শুরু করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই মনে হল কী যেন একটা অন্যরকম হচ্ছে। ওর কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না। যেন খুব কাছেই আরও অনেকে কথা বলছে। কীরকম যেন ফিসফিসিয়ে। অনেকে থাকলে যেমন হয় সেরকম আর কি! ওর কথাও মাঝেমধ্যে তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল।

তার মাঝেমধ্যে যেন কাপ-ডিশের আওয়াজ। বহু দূর থেকে ভেসে আসা কিছু কথা। তারপর আবার সব চুপচাপ। আবার যেন কেউ ছুটে বেড়াচ্ছে ঘরে। ছোটরা যেভাবে ছুটে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে যেন পোড়া মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। যেন কিছু রান্না হচ্ছে।

এদিক ওদিক দেখে বললাম, এ বাড়িতে কি আরও অনেকে আছে?

না, না আমি, বাবা আর মা-ই থাকি।

ওর মধ্যে শুরুর দিকে একটা জড়তা ছিল। আস্তেআস্তে সেটা কেটে গেল। ও অন্য একটা ঘর থেকে দাবার বোর্ড নিয়ে এল। আমরা খেলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ বাদে অন্ধকার আরেকটু বাড়তে ও একটা আজব চেহারার বড় হ্যারিকেন নিয়ে এল। তার আলো বেশ জোরালো। আমরা সে আলোয় খেলতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হল ভিতরের ঘর থেকে কেউ যেন জোরে জোরে কথা বলছে। কিন্তু আগের মতোই কোনও কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। সেটা বাংলা না ইংরাজিতে বলছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে যেন একাধিক লোক— উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। নারী পুরুষের গলা তার মধ্যে মিশে আছে।

রায়ান একটু যেন বিব্রত হয়ে আমাকে বলে উঠল,— দাঁড়া একটু ভিতর থেকে ঘুরে আসছি। আই উইল বি ব্যাক ইন মিনিটস।

ও ভিতরের ঘরে চলে গেল। আর তখনই যেন বাকি শব্দের চরিত্র আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম। কেউ যেন দূরে পিয়ানো বাজাচ্ছে। কোথাও যেন পার্টি হচ্ছে। কাচের গ্লাসে গ্লাসে ধাক্কা লাগার টুং-টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে যেদিকে রায়ান গেল, সেদিকে একবার উঁকি মারলাম। অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনও আলো জ্বলছে না। কী মনে হল, দেওয়ালে হাত রেখে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এ দেওয়াল যেন বরফ শীতল, ভিজে ভিজে। পায়ের তলার মেঝে এবড়োখেবড়ো, নানান জায়গায় ভাঙা।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজটা দিয়ে ফুট তিনেক যেতেই বুঝলাম আর এগোনো প্রায় অসম্ভব। হ্যারিকেনের আলো আর সামনে যাচ্ছে না। কিন্তু স্পষ্ট ওই আওয়াজটা ভেসে আসছে। ঠিক এমনসময় একটা ঠান্ডা হাওয়া যেন আমাকে ধাক্কা মেরে গেল। হঠাৎ করে একটা স্ট্যান্ডিং ফ্যানের সামনে গিয়ে পড়লে যেরকম হয়। চমকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনওরকমে সামলে নিলাম। তারপরে হাতড়ে হাতড়ে আরেকটু এগিয়ে গেলাম। মনে হল একটা বড় ডাইনিং রুমে এসে পড়েছি।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার থাকলেও একপাশের বড় কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো সামান্য এসে পড়েছে। সে আলোয় বুঝতে পারলাম যে ঘরটায় এসে পড়েছি, সেরকম বড় ঘর আমি আগে কখনও দেখিনি। ঘরের মাঝ বরাবর একটা বিশাল ডিম্বাকৃতির ডাইনিং টেবল। কাঠের কাজ করা। প্রায় পনেরোটা চেয়ার রাখা বিশাল টেবিলটাকে ঘিরে।

হঠাৎ হার্ট বিট যেন বন্ধ হয়ে গেল।

এর মধ্যে কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা নেই। সেখানে লোক বসে আছে। যারা বসে আছে, তাদের সবার দৃষ্টি আমার দিকে। একজন বিশালদেহী সাহেব। সুট-টাই পরা, নীল চোখে আমার দিকে কড়াভাবে তাকিয়ে আছে। পাশে নীল গাউনপরা এক বছর চল্লিশের মহিলা। ইনি ভারতীয়। কালো চুল। যেন আমার মায়ের মতো দেখতে। অন্য দুটো চেয়ারে দুটো আট-নয় বছরের বাচ্চা। উপরে বড় একটা ঝাড়লন্ঠন। কিন্তু কোনও আলো জ্বলছে না।

ঘরে অন্ধকারের মধ্যে মিশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন। না , তিনজন নয়। চারজন। তার মধ্যে তিনজন ভারতীয়। দেখে মনে হচ্ছে কাজের লোক। একজন হাতে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরেকজন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজ মহিলা। মনে হয় বাড়ির হাউসকীপার। সাদা গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ঘরে কোনও আলো নেই। চেয়ারেও সবাই যেন স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। যেন সময়ের একটা মুহূর্তে আটকে আছে।

ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আবার সাহেবের দিকে তাকালাম। এখনও আমার দিকে একইভাবে তাকিয়ে আছে। মুখ যেন রাগে লাল হয়ে গেছে।

কে যেন হঠাৎ আমার হাত এসে ধরল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি রায়ান। হাত ধরে আবার আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল আগের ঘরে।

ওর ফরসা মুখ যেন একটু লাল হয়ে গেছে। আমাকে বলে উঠল— তুই কোথায় যাচ্ছিলি! ইউ শুডন্ট হ্যাভ লেফট দিস রুম। আমার বাবা একটু রাগী মানুষ। তাছাড়া ভারতীয়দের ভালো চোখে দেখেন না।

—কিন্তু কেন?

—সে জানি না। তোর আর এখানে থাকা উচিত হবে না। রাতও হয়েছে।

সত্যি রাত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির মধ্যে কোথা থেকে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের গম্ভীর গলায় আটটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে আলো। যেন সেও আমাকে অবিলম্বে চলে যেতে বলছে। আমি উঠে পড়লাম। রায়ান আমার হাত ধরে বাগান পেরিয়ে গেট অবধি এল। বাইরে রাস্তার আলো জ্বলছিল। বেরোনোর সময় দেখলাম, তখনও বাড়ির অন্য কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে আমার চোখ যেন আরও বেশি করে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল। রাস্তায় এসে পড়লাম।

সেদিন মামাবাড়ির ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। বাড়িতে বেশ বকুনি খেয়েছিলাম। আসলে সে সময় মোবাইল ফোন ছিল না যে ইচ্ছে করলেই জানিয়ে দেওয়া যাবে। না জানিয়ে অত

রাতে ফেরায় বাড়ির সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল।

এর দুদিন বাদের কথা। অঙ্কের ক্লাস ছিল শেষে। ও আমাকে আগেই বলে রেখেছিল স্কুল শেষ হওয়ার পরে একটু থাকতে। স্কুল শেষ হতে আমাকে ওর ব্যাগ থেকে একটা ছোট ফ্রেমে বাঁধানো ছবি বার করে দিল।

বলে উঠল— এটা তোকে দিলাম। ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। তোকে দেওয়ার জন্য এটা আমি এঁকেছি।

ছবিটা দেখে অবাক হলাম। হেসে উঠে বলে উঠলাম— খুব সুন্দর। এ আবার কোনও জায়গার? কী ফুল এটা?

আসলে সে ছবিতে ছিল একটা পাথরের স্মৃতিফলক। তার পিছনে একটা অচেনা বড় গাছ। সে গাছে কোনও পাতা নেই। তাকে ঘিরে ঘাসের মধ্যে ফুটে আছে অনেক হলুদ ফুল। ড্যাফোডিল। তখন অবশ্য ওই ফুলের নাম জানতাম না। আমি সেরকম আগে দেখিওনি। জিজ্ঞেস করায় ও বলেছিল ড্যাফোডিল। ওর ফেভারিট ফুল। ইংল্যান্ডে নাকি অনেক ওই ফুল ফোটে।

ওর আঁকার হাত চিরকালই খুব ভালো ছিল। ওই স্মৃতিফলকের অংশটা বাদ দিলে ছবিটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু এখন তো আমার জন্মদিন নয়। হঠাৎ করে এরকম গিফট?

ও হেসেছিল। তার পরে বলেছিল— সো দ্যাট ইউ ক্যান রেকগনাইজ মি। চিনতে পারিস।

—ধুর, তোকে আমি কোনওদিন ভুলে যাব নাকি! সম্ভবই নয়। তাছাড়া তুই তো আর স্কুল ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিস না।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও বলেছিল— হয়তো, আমাকে যুদ্ধে যেতে হল। হঠাৎ করে স্কুল ছেড়ে। আর ফিরে এলাম না। তখন?

—এখন, যুদ্ধ?

তখন হাসলেও, এর পরের দিন ও স্কুলে আসেনি। তার পরের দিনও না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওর বোধহয় জ্বর হয়েছে।

কয়েকদিন আসছে না দেখে আমি ওই পাড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক খুঁজে খুঁজে বাড়িটা পেলাম। তখন বিকেল চারটে। বাইরে দিনের আলো তখনও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেদিনকার মতো গেটটা ভেজানো নেই। ভিতর থেকে তালা বন্ধ। একটা নয়, বেশ কয়েকটা বড়সড়

তালা। গেটের ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হল না কেউ এখানে থাকে। এমনকী কেউ কোনওদিন এখানে ছিল বলেও মনে হল না।

প্রথমদিন আধো অন্ধকারে যেটুকু পরিচয় পাইনি, সেটা সেদিন ভালো করে পেলাম। একটা আগাছায় ভরা বাগান, তারপরে একটা সম্পূর্ণ পোড়ো বাড়ি, যেখানে গত দশ বছরে কেউ থেকে থাকলেই অবাক হব।

দিনের বেলাতেই কীরকম যেন গা ছমছম করছে। রাস্তার উলটোদিকে একটা বেশ বড় গাড়িবারান্দাওয়ালা আধুনিক বাড়ি। তার গেটে বেশ একজন জাঁদরেল উর্দিপরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। সাহস করে তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রায়ানকে এখান থেকে বেরোতে দেখেছে কিনা।

সে বেশ অবাক হয়ে বলে উঠল— না, ঊখানে তো কেউ কুনোদিন থাকে না। আমি কাউকে ঢুকতে বেরোতে কোনওদিন দিখি নাই।

আমি ফের বলে উঠলাম— আমার বন্ধু ওখানে থাকে। তিনদিন আগেও এসেছি।

আমাদের কথাবার্তা শুনে ইতিমধ্যে ভিতর থেকে দেখি এক চশমা পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন। মনে হল উনি এ বাড়ির মালিক। আমাদের কথোপকথন শুনেছেন।

আমাকে একটু অবাঙালি টানে বাংলায় বলে উঠলেন— এ তো এ পাড়ার একমাত্র পোড়ো বাড়ি। আমি কুড়ি বছর এখানে আছি। কাউকে কোনওদিন দেখিনি। শুনেছি এক সময় বেনেট ফ্যামিলি থাকত এখানে। সাহেব নাকি বেজায় ভারতীয় বিদ্বেষী ছিল। একবার এ বাড়িতে স্বাধীনতার আগে হামলাও হয়েছিল। ম্যাথু বেনেট হাইকোর্টে জাজ ছিলেন। একমাত্র ছেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যায়। পরে সাহেব আর মেমসাহেব দুজনেই এখানেই মারা যায়। বহুবছর কেউ থাকে না এ বাড়িতে। কিছু লিগাল গণ্ডগোলের জন্য বাড়িও বিক্রি হয়নি।

—সে কী করে হয়? আমার বন্ধু এখনও ওখানেই থাকে।

লোকটা এবার হেসে উঠল। বলে উঠল— তোমার বন্ধু তাহলে মানুষ নয়, ভূত হবে।

শুনেই গা কীরকম ছমছম করে উঠল। আমি আর কথা না বলে সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। এরপরে অনেক দিন অপেক্ষায় ছিলাম রায়ানের। ভেবেছিলাম আবার হয়তো ফিরে আসবে। মনে হয় সেদিন ইচ্ছে করে আমাকে ভুল বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো কোনও কারণে ও ওর বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে চায়নি। ওই বাড়ির গেট খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছিল। এ ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে!

কিন্তু না আর কোনওদিন ওর দেখা পাইনি। ও আর কোনওদিন স্কুলে আসে নি।

আসল অবাক হলাম এর কিছুদিন পরে। ওর কথা অন্য কেউ জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে। ক্লাসে যতজন ছিল, তারা কেউ নাকিওকে কোনওদিন দেখেনি। বারবার করে ওর চেহারা, কথা বলার ধরন বলার পরেও কেউ ওর কথা খেয়াল করতে পারল না। উলটে বলে কিনা আমার মাথা খারাপ।

কী আশ্চর্য। সবাই কীভাবে ওকে ভুলে যেতে পারে! সবাই আমার সঙ্গে মজা করার জন্য মিথ্যে বলছিল কিনা কে জানে!

বাধ্য হয়ে কয়েকজন টিচারকেও জিজ্ঞেস করলাম। না কেউ ওকে কোনওদিন দেখেনি। নামও শোনেনি। ওই নামের কোনও ছেলে নাকি কোনওদিন স্কুলে পড়েনি। বললাম যে ও অনেক সময় ক্লাসে বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে থাকত। বাইরে নীল ডাউন হয়ে বসার শাস্তি পেত। কিন্তু শুনলাম সেরকম শাস্তি নাকি আমি নিজেই বেশি পেয়েছি।

বেশ বুঝতে পারছিলাম প্রশ্ন শুনে আমি স্বাভাবিক আছি কিনা, সেটাই সবাই সন্দেহ করছে।

সুদীপ্তকে জিজ্ঞেস করলাম সেদিনের কথাটা। ও তো আমাকে রায়ান সম্বন্ধে বলেছিল।

ও শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল— এজন্যই তুই এত অন্যমনস্ক থাকতিস। নিজের মনে যেন মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করতিস। আমি আবার কবে বললাম যে আমি কাউকে পার্ক স্ট্রিটের কবরখানায় দেখেছি। সে তো তুই বললি যে তুই নাকি একটা ছেলেকে ওখানে দেখেছিস। সে নাকি আবার তোর খুব বন্ধু হয়।

আর কথা বাড়ালাম না ওর সঙ্গে।

শেষ ভরসা দিদিমা। দিদিমা ওকে কত ভালোবাসতেন। আমরা দিদিমার সামনেই খেলতাম। সেটা উনি মন দিয়ে দেখতেন। কিন্তু এবারেও জিজ্ঞেস করে অবাক হলাম। দিদিমা বললেন আমি নাকি একা দাবা খেলতে খেলতে বিড় বিড় করে কথা বলি। দুজনের চাল দিই।

আর কুলের আচার আর নারকেল নাড়ু? সে নাকি আমিই খেয়েছি।

এর পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। এ যেন একটা স্বপ্ন। শুধু স্বপ্নটা আমার কাছে আমার জীবনের থেকেও জীবন্ত। আমার ছেলেবেলার একটা খুব বড় অংশ। ওর উপস্থিতি আর কারুর কাছে ধরা না পড়লেও আমার কাছে যে সেটা সত্যি ছিল, সেটা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ হয়নি। ওর মতো আর কোনও বন্ধুও হয়নি। এত বছর বাদে অনেক কিছু ভুলে গেলেও ওর সব কথা তাই স্পষ্ট মনে আছে।

কত বছর কেটে গেছে। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম রায়ানের কথা। আমি এখন ইংল্যান্ডে থাকি। মাঝে প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে। সেই ছবিটাও হারিয়ে গেছে। তবে মন থেকে যেসে ছবিটা হারায়নি, সেটা টের পেলাম এত বছর বাদে।

সামনে ঠিক সেই ছবি। সেই রকম ড্যাফোডিল ঘেরা বার্চ গাছ। তার নীচে সেই স্মৃতিফলক।

তাতে লেখা,

ইন মেমারি অফ,

রায়ান বেনেট

রয়্যাল ওয়ার উইকশায়ার রেজিমেন্ট

কিলড ইন অ্যাকশন, থার্ড মার্চ ১৯৪৫

আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমার ছোটবেলার বন্ধুর সামনে। এ রায়ান আমার বন্ধু রায়ান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

আমি অস্ফুটে বলে উঠলাম— আই রেকগনাইজ ইউ রায়ান। আমি সবসময়ই জানতাম যে তুমি ছিলে। আমি তোমাকে আজও ভুলিনি। ভালো থেকো বন্ধু।

পারফেক্ট

মিথিল খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চল চাউনি। সে উজ্জ্বল চোখের চাউনিতে যেন ঝাড়লণ্ঠনও ম্লান হয়ে যায়, মুহূর্তে প্রেমে পড়ে যায় যেকোনও মানুষ। দেখতে ঠিক ইউরোপিয়ান সুন্দরী মহিলাদের মতো। সেরকম ফিগার। ছিপছিপে লম্বা সতেজ চেহারা। একবার তাকালে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েই থাকতে হয়। এত কাছ থেকে দেখেও বোঝার উপায় নেই যে মেয়েটা রোবট। কী আশ্চর্য! এরকমও হয়!

পাশ থেকে সেলসম্যান লোকটা বলে উঠল— ছুঁয়ে দেখতে পারেন।

—মানে?

—বাহ, জীবনসঙ্গী খুঁজছেন, এত আর শাকসবজি কিনতে বাজারে আসেননি! ছুঁয়ে দেখবেন না! জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্পর্শ খুব ইম্পরট্যান্ট। বুঝতে পারবেন ওর কেমিস্ট্রি আপনার সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা!— সেলসম্যান লোকটা দাঁত বার করে হেসে বলে উঠল।

তবু একটু দ্বিধা করছিল মিথিলের। কিন্তু তার আগেই মেয়েটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মিথিলের দিকে। মেয়েটার সে হাত ধরতেই মিথিলের সারা শরীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এত ঠিক মানুষেরই হাত। সেই নারীসুলভ কোমলতা যেন মিশে আছে মেয়েটার নরম হাতের স্পর্শে।

মুহূর্তে মেয়েটার গালে যেন লজ্জার লাল আভা দেখা দিল।

দেখে অবাক হয়ে পিছিয়ে এল মিথিল। এত রোবট হতে পারে না!

—আপনি বোধহয় এসব দেখেননি বহুদিন! অনেক অনেক এগিয়ে গেছে এখন রোবটিক্স, আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এখন এদের সঙ্গে মানুষের তেমন তফাত-ই বোঝা যায় না!

মিথিল-এর চোখে তবু দ্বিধা দেখে লোকটা সেলস ম্যান সুলভ চাপ বাড়াল। বলে উঠল— রেডি করে দেব?

—না, না, আজ থাক। আরেকদিন এসে দেখে যাব।

—দেখুন আমি বলি কী, নিয়ে যান। সব সময় যে আপনার পছন্দের মতো পাবেন, এটা বলা যায় না! এটা যে আপনার পছন্দ হয়ে গেছে, তা আপনার চোখ দেখেই বুঝেছি। আসলে এই কেমিস্ট্রিটাই আসল। পরে হয়তো আর কখনও পেলেন না। তখন সারাজীবন আপশোস হবে।

মিথিল চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল। কথাটা সত্যি। এর আগে গত দেড় ঘণ্টায় আরও প্রায় দশটা দেখেছে। কিন্তু এটাই একমাত্র পছন্দ হয়েছে। বেশ ভালোরকম যে পছন্দ হয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে।

—দশ বছর ধরে মান্থলি ইনস্টলমেন্ট-এ নেবেন। একবারে টাকা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। তাছাড়া আপনি আপনার পছন্দ মতো পাঁচ-পাঁচবার পরিবর্তন করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

—সেটা আবার কীরকম?

—ওহো, ওটাই তো বলা হয়নি! দেখুন এটা একটা দারুণ ব্যাপার। মানুষ মহিলা জীবনসঙ্গিনীর ক্ষেত্রে একবার ঠিক করলেন তো ব্যাস, তারপরে আর কোনও কিছু পরিবর্তন করার উপায় নেই। দেখবেন কিছু দিন পরেই মনে হবে এটা হলে ভালো হত, ওটা হলে ভালো হত। কিন্তু সে তো আর ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যাবে না! সেটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে খাটে না। আমরা এখানে এরকম রোবট পাঁচবার আপগ্রেড করার সুযোগ দিই।

—কীরকম ভাবে?— ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল মিথিলের।

—ধরুন মনে হল বেশিজোরে কথা বলছে। নিয়ে আসবেন, আপনার পছন্দমতো যাতে কথা বলে, সেরকমভাবে সেটিং করে দেব।

—সেরকম করা যায়!

—অবশ্যই। এসবের জন্যই তো আজকাল আর কেউ বিয়ে করছে না। আপনি তো অবিবাহিত, তাই তো?

মিথিল চুপ করে আছে দেখে সেলসম্যান লোকটা একটু অবাক হয়ে বলে উঠল— সে কী। বিয়ে করে ফেলেছেন এর মধ্যে? এখন নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছেন!

—না, ডিভোর্স হয়ে গেছে।

—ওহো, তাই বলছি। ওই সব ঝুটঝামেলায় আজ আর কেউ যায়। আমার যত কাস্টমার কেউ আজকাল আর বিয়ে করে না। তাও হয়তো কারও কারও গার্লফ্রেন্ড ছিল। কিন্তু এই সব মডেলের রোবট মহিলাদের দেখার পরে আর কেউ তাদের গার্লফ্রেন্ড-এর দিকে ফিরেও তাকায়নি। কোনওরকম ঝামেলা নেই, শুধু মান্থলি ইনস্টলমেন্ট। একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। যেন শিল্পীর হাতে নিখুঁতভাবে তৈরি শরীরের প্রত্যেকটা অংশ।

একটু দোনামনা করে শেষে কিনেই ফেলল মিথিল। তবে এধরনের রোবট এখনও বেশ দুর্মূল্য। সাধারণের ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে হলেও মিথিলের ক্ষেত্রে সেটা ঠিক খাটে না।

মিথিল কম উপার্জন করে না।

বাড়িতে আনার কিছু দিনের মধ্যেই মিথিল বুঝতে পারল ভাগ্য করে পেয়েছে ইন্দ্রাণীকে। হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী বলেই ডাকে মেয়েটাকে।

এত উন্নত শ্রেণির রোবট মহিলা গার্লফ্রেন্ড থাকতে এখনও যারা মানুষ গার্লফ্রেন্ড বা বউ খোঁজে তাদের নেহাতই বোকা বলা চলে। মিথিলও যেমন ছিল। কোনওদিন ভাবেইনি এসব কথা। সিনথেটিক গার্লফ্রেন্ড ব্যাপারটাই কেমন যেন ব্রাত্য ছিল মিথিলের কাছে।

এখনকার দিনে আজকাল কেউ তেমন বিয়ে করে না। কী দরকার এত ঝুটঝামেলা দায়িত্ব নেওয়ার। তবে বিয়ে উঠে গেলেও জীবনসঙ্গিনীর জন্য এখনও রোবটরমণীর প্রচলন হয়নি। তবে আগামীদিনে যে সেই দ্বিধা আর থাকবে না, সে বিষয়ে এক দিনেই বুঝতে পেরেছে মিথিল।

দু বছর আগে মিথিলের বিয়ে হয়েছিল গার্গীর সঙ্গে। কিন্তু এক বছর থাকার পরেই সে বিয়ে ভেঙে গেছে। আসলে মিথিল সব ব্যাপারে পারফেকশনিস্ট। সেখানে গার্গী ছিল সবদিক থেকে তার উলটো।

প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যতদিন গেছে, তত যেন এই খামতিগুলো বেশি করে চোখে পড়েছে।

গার্গী কখনও কোনও জিনিস ঠিক জায়গায় রাখত না। কখনও ভোরে ঠিক সময়মতো উঠত না। কোনও কাজ দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা ঠিক সময়মতো শেষ করত না।

অন্যদিকে মিথিল ছিল সব ব্যাপারে পারফেক্ট। যেখানে যা রাখার, ঠিক সেখানে রাখবে। সময়মতো সবকিছু করবে। কোনও কাজ শুরু করলে মাঝপথে ফেলে রাখবে না। শেষ করে তবেই থামবে।

গার্গী ওকে খুব ভালোবাসত। হয়তো মিথিলও গার্গীকে ভালোবাসত। কিন্তু সেটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল।

সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। সেই ফাটলের সুযোগ নিয়ে সেখানে বেড়ে উঠেছিল অশ্বত্থের চারার মতো পারস্পরিক ক্ষোভ-বিতৃষ্ণা। বুকের মধ্যে নিরুচ্চার ক্ষোভের স্বর বাড়ছিল।

একদিন ও লক্ষ্য করল গার্গীর দাঁতও পারফেক্ট নয়। ডানদিকের দুটো দাঁত যেন সামান্য উঁচু। পরে আরেকদিন লক্ষ্য করে দেখল কপালও যেন একটু বেশি চওড়া।

বিরক্তিটা বাড়ছিলই। মিথিলের ধৈর্য এমনিতেই কম। শেষে সবকিছু নিয়ে রীতিমতো কথা কাটাকাটি শুরু হল। কিছুদিনের মধ্যেই মিথিল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল ডিভোর্সের, যদিও গার্গী সেটা এখনও মেনে নেয়নি। তবে একসঙ্গে থাকত না। কোনও যোগাযোগও আর ছিল না।

ভাগ্যিস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এখন ভাবে, কোথায় গার্গী আর কোথায় ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীকে ঘিরে মিথিলের মুগ্ধতা বেড়েই চলল দিনের পর দিন।

কী অপরূপ সুন্দরী! সেদিন একটা জায়গায় গিয়েছিল ওরা দুজনে। চারদিকে সবাই বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল ইন্দ্রাণীকে। একজন তো এস্ক্যালেটর থেকে দেখতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। এটা ঠিক যে এরকম সুন্দরী শুধু কলকাতায় কেন কোনও দেশের রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না।

দেখে রোবট তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এমনকী সামনে থেকে খুঁটিয়ে দেখলেও বোঝা যায় না। ভাগ্য ভালো যে এখনও এসব জিনিসের দাম সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের তাই সচরাচর এরকম রোবটরমণী দেখার সুযোগ হয় না।

ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কোণে সবসময় একটা লাজুক হাসি লেগে থাকে। দীঘল চোখদুটোতে যেন এক মায়াবী আকর্ষণ। যখন জলপ্রপাতের মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, তখন চোখ সরানো যায় না।

ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে গেলেই যেন হৃৎস্পন্দন বেড়ে যেত মিথিলের। মাঝেমধ্যে স্পর্শের গভীর মুহূর্তে মিথিল ভুলে যেত যে ইন্দ্রাণী মানুষ নয়। ইন্দ্রাণীর পুরো শরীরটাই যেন কোনও জাদুকরের জাদুতে মোড়া, কাছে এলেই সে জাদুর জগৎ থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড সব কিছুর বোধ হারিয়ে যায়।

তাছাড়া কত রকমের ফীচার। ইন্দ্রাণীর চুলের গন্ধ ইচ্ছেমতো পালটে নেওয়া যায়। চোখের মনির রঙ ইচ্ছেমতো বদলে নেওয়া যায়। চামড়ার রঙে পরিবর্তন আনা যায়। আরও কত কিছু।

প্রায় দু-তিন মাস একটা ঘোরের মধ্যেদিয়ে কাটল মিথিলের। অফিসের যথেষ্ট সিনিয়র পজিশনে আছে। তবু এর মধ্যেমাঝে মধ্যেই ইন্দ্রাণীর জন্য কারণে-অকারণে ছুটি নিয়েছে। কেন নেবে না?

ইন্দ্রাণী সামনে থাকলেই চারদিকের বিবর্ণতা কেটে গিয়ে দিনটা যেন ঝলমলিয়ে ওঠে। সামনে বসলেই যেন মন ভালোলাগায় ভরে ওঠে।

তাছাড়া গার্গীর মতো কথায় কথায় মান অভিমান নেই। সবকাজ হাসিমুখে সময়মতো করে। কোনও ভুলচুক নেই।

কিন্তু একদিন খেতে বসে ওর মনে হল কথাটা যেন খুব কম বলে। দু-একটা কথা বলার পরেই থেমে যায়। তখন ওই শরীরী আকর্ষণ ছাড়া বাকি সবকিছু ফিকে হয়ে আসে।

প্রয়োজনের বাইরে বিশেষ কথা বলে না। যা বলে তা নেহাত ধরাবাঁধা।

খাওয়ার পরে উঠে 'ইন্দ্রাণী'র ওয়ারান্টি চেক করল মিথিল। ভাগ্য ভালো এক বছর ওয়ারান্টি আছে। পাঁচবার পরিবর্তনের সুযোগ আছে তার মধ্যে।

পরের দিনই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সেই 'মনের মানুষ' সংস্থায় গেল মিথিল। এত টাকার জিনিস।

কিছু সেটিং পরিবর্তন করে ওরা আবার এনে দেখাল মিথিলকে। প্রগলভতাও নীরবতার মাঝে এরকম নানান সেটিং আছে। সেটাকে গ্রাহকের ব্যাকগ্রাউন্ড পছন্দ অনুযায়ী ফাইনটিউন করা যায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা এদিক ওদিক সেটিং পরিবর্তন করার পরে মিথিলের ঠিক মনঃপূত হল।

ভাগ্যিস গিয়েছিল। তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই মিথিলের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে শুরু করত ইন্দ্রাণী। মিথিলের বিভিন্ন আগ্রহের বিষয় ওর জানা ছিল। সেভাবেই কথোপকথন শুরু করত। সে কথা যেন শেষই হতে চাইত না। ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলতে বলতে কখন যে দেরি হয়ে যেত তা মিথিলের মতো ঘড়ি মিলিয়ে চলা ছেলেও বুঝতে পারত না।

এরকমভাবে কয়েক মাস চলল। এরপর একদিন ওরা এলকের ধারে ঘুরতে গিয়েছিল। মিথিল ইন্দ্রাণীর হাত ধরে হাঁটছে, হঠাৎ ওর মনে হল ইন্দ্রাণীর আঙুলগুলো যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেখতে খারাপ যে তা নয়, কিন্তু সে আঙুল ধরার পরেই যেন সে উষ্ণতার অনুভূতি হয় না। আঙুলগুলো আড়ষ্ট প্রাণহীন হয়ে থাকে।

পরের দিনই আবার তড়িঘড়ি 'মনের মানুষ'-এ চলে গেল মিথিল। খুব তাড়াতাড়ি একটা সলিউশনও পাওয়া গেল। দুই আঙুলের মাঝের গ্যাপে সামান্য ম্যানুফাকচারিং প্রবলেম ছিল। ইন্দ্রাণী যখন ফিরে এল তখন ইন্দ্রাণীর আঙুল ধরেই মিথিল বুঝল এবারে একেবারে পারফেক্ট।

ঠোঁটটা আপনা থেকেই ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কাছে চলে এল। দীর্ঘ চুম্বন যখন থামল তখন মিথিল-এর মাথায় অন্য একটা চিন্তা এসেছে। আরেকবার কাছ থেকে ভালো করে দেখল ইন্দ্রাণীকে। ঠোঁটটা যেন একটু বেশি আগ্রাসী, মডেলসুলভ ঠোঁট। খুব আকর্ষণীয় এটা ঠিক, কিন্তু ঘরোয়া বাঙালি মহিলাদের মতো আদৌ নয়।

এ জিনিসটা যে ওর আগে চোখে পরেনি কেন কে জানে! অনেক আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল।

এবার এটা ঠিক করাটা খুব সহজ হল না। বেশ কয়েকবার ট্র্যায়াল অ্যান্ড এরর করার পরে তবে ঠোঁট ঠিক মিথিলের পছন্দমতো হল।

আরও কয়েক মাস গেল। সে যেন এক স্বপ্নের মতো। ইন্দ্রাণীর নেশায় মিথিল যখন মেতে উঠে, তখন দিনক্ষণের কোনও হিসেব থাকে না। মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে অনেক দিন বাদে কোনও মরুদ্যানের সন্ধান পেলে যেরকম হয়।

তবে এরমধ্যে অবশ্য আরও দুবার ইন্দ্রাণীকে 'মনের মানুষ'— এ নিয়ে গিয়েছিল মিথিল। আরও পারফেক্ট জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে।

কয়েক মাস বাদে একদিন এক পার্টিতে ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে গেল মিথিল। আগে সাহস করে কখনও নিয়েনি। যদি এলাকে কিছু মনে করে। মানুষ সঙ্গিনীনা নিয়ে রোবটসঙ্গিনী! তখন মিথিলকে ভাবতেই পারে বিকৃতমস্তিষ্ক পারভারট!

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই মিথিল বেশ বুঝতে পারল কেউ আন্দাজ করতে পারেনি যে ইন্দ্রাণী মানুষ নয়। নিজে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাঝেমধ্যে তাকিয়ে দেখছিল ইন্দ্রাণীকে। কী সুন্দর সহজাতভাবে সবার সঙ্গে মিশে গেছে। গার্গী স্মার্ট ছিল না। এক কোণে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ইন্দ্রাণী ঠিক তাঁর উলটো। নিজের থেকে এগিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলছে। সবার মুগ্ধ দৃষ্টি ওকে ঘিরে। যেন এক স্টেজের সব স্পটলাইট ওর উপরে নিবদ্ধ। মনে হচ্ছে যেন এক পরী এসে কোথা থেকে উদয় হয়েছে সাধারণ কিছু মানুষের মধ্যে।

এমনকী মিথিলের টপ বস ম্যানেজিং ডিরেক্টার রাজা শিকদার মজা করে বলে উঠলেন— নাহ, এরকম সুন্দরী স্ত্রী আমার থাকলে আমি তাকে এসব পার্টিতে ভরসা করে নিয়ে আসতাম না। ইউ আর রিয়ালি ফরচুনেট মাই বয়। শুধু রূপ নয়, গুনেও। সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। এমনকী গলফ নিয়েও দেখলাম সবরকম খবর রাখে। আমার গলফে আগ্রহ আছে জানো নিশ্চয়ই! কিন্তু সে ব্যাপারে কথা বলার লোকই পাই না। দেখলাম গলফ নিয়ে আমার থেকেও বেশি জানে। তারপর এই মিডল ইস্ট-এর বর্তমানের যাচ্ছেতাই পলিটিকাল সিচুয়েশন নিয়ে কথা হচ্ছিল। তারও সব খবর রাখে। অ্যামেজিং, জাস্ট অ্যামেজিং।

টপবসের কাছে কথাটা লুকনো ঠিক নয়। কোনওদিন ঠিক জেনে যাবেন এ ব্যাপারে। এমন অভিজ্ঞ লোকের চোখেও ইন্দ্রাণী যে রোবট হিসেবে ধরা পড়েনি, এটাই সবথেকে ইন্টারেস্টিং।

তবু মিথিল ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে আসল রহস্যটা আর বলল না। না জানাই ভালো। যতদিন গোপন রাখা যায়।

মিসেস শিকদার অবশ্য ইন্দ্রাণীর উপরে অতটা খুশি নন। সেটা এজন্য শুধু নয় যে পুরো পার্টিতে মিস্টার শিকদার শুধু ইন্দ্রাণীর পিছুপিছুই ঘুরেছেন।

তার বাইরেও একটা কারণ আছে।

সেটা হল ইন্দ্রাণীকে কথায় কথায় মিসেস শিকদার জিজ্ঞেস করেছিলেন ওনার পোশাক সম্বন্ধে। —কীরকম লাগছে আমার এই স্কার্টটা?

তাতে ইন্দ্রাণী মুচকি হেসে 'ভালো লাগছে না, মানায়নি। এখনও ওজন অনেক কমাতে হবে।'— বলেছে।

উত্তরে মিসেস শিকদাব-এর মুখ মুহূর্তে কালো হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তি না লুকিয়ে উনি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

মিথিল কাছেই ছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিথিলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

'মনের মানুষ'-এ আবার নিয়ে যেতে হবে। এ কী ব্যাপার। সামান্য কমনসেন্স নেই! কাকে কখন কী বলতে হয়, সেটুকু জানা নেই!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল ওকে তো পাঁচবার অলরেডী নিয়ে যাওয়া হয়েছে 'মনের মানুষ'-এ। ওরা তো এখন আর কিছুই করবে না। তাহলে?

ঠিক এখান থেকেই আবার বিরক্তি শুরু হল মিথিলের। সে বিরক্তি যেন উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকল।

একদিন মনে হল— আশ্চর্য মেয়ে ইন্দ্রাণী, এতটুকু সেনস অফ হিউমার নেই। সেজন্য ওর সঙ্গে ঠিক মজাও করা যায় না। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ঠিকই কিন্তু মিথিলের মনে হয় সে হাসি পুরোপুরি মেকী হাসি। না বুঝেই হাসে।

শুধু তাই নয়, খুব খারাপ খবর শুনে চোখ থেকে জল বার করে ঠিকই, কিন্তু সেই কান্নার আবেগ যেন তাতে থাকে না। সুখ-দুঃখের, অভিমানের অন্তরঙ্গ অনুভূতিগুলোও যেন ওর ঠিকভাবে জানা নেই।

এত দামি জিনিস। এখনও দশ বছর ইন্সস্টলমেন্ট দিয়ে যেতে হবে। অথচ এরকম 'ইম-পারফেক্ট' জীবনসঙ্গীকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে!

'মনের মানুষ'-এ বেশ কয়েকবার গেল। ওরা কোনও আপগ্রেড করবে না আর! পাঁচবার ম্যাক্সিমাম লিমিট। ফেরত দেওয়ারও কোনও উপায় নেই।

এখন ইন্দ্রাণী, এই ডিফেকটিভ ইন্দ্রাণীকে নিয়েই কাটাতে হবে বাকিটা জীবন। আরও নয় বছর এই মহার্ঘ্য পুতুলের জন্য টাকা দিয়ে যেতে হবে।

সেদিন বিকেলে ফ্ল্যাটের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিথিল। বাইরের চত্বর থেকে নানান শব্দ আসছে। বাচ্চারা খেলছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলকাকলিতে চারদিক মুখর হয়ে উঠেছে। দূরে রাধাচুঁড়া গাছটা হলুদ ফুলে ঢেকে গেছে। তার নীচে যেন কেউ ফুলের পাপড়ি সাজিয়ে রেখেছে। কিছু দূরে সুইমিং পুলের জলে সদ্য জ্বলে ওঠা ল্যাম্পের আলোর বিন্দুগুলো তিরতির

করে কাঁপছে। শেষ বিকেলের সোনাগলা রোদের মুকুট পরে সেজে উঠেছে সার দিয়ে লাগানো ঝাউগাছগুলো। একটা টিয়া 'ট্যা ট্যা' শব্দ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল।

কী অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু মিথিলের মনে শান্তি নেই। বারান্দায় ইতিমধ্যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণী। মিথিলের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়েছে বুকের মধ্যে। সে হাত ছাড়িয়ে নিল মিথিল।

সেই আকর্ষণ যেন হারিয়ে গেছি। সব 'ইম-পারফেক্ট' জিনিস কী শেষে মিথিলের ভাগ্যেই এসে জোটে! দূরে বারান্দার অন্য প্রান্তে সরে এসে দাঁড়াল মিথিল।

এর দু দিন বাদে ইন্দ্রাণীকে গ্যারেজে রেখে দিয়ে এল মিথিল। ওর মুখটাই সহ্য করতে পারছিল না। বারবার মনে পড়ছিল নকল হাসি, হাজারো খুঁতের কথা।

পারফেক্ট না হলে কী আর তাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ভাবা যায়!

সমাপ্ত